রবীন্দ্র-বিচিত্রা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
॥ কলিকাতা-১২ ॥

প্রথম প্রকাশ :
২২শে শ্রাবণ, ১৩৬১

দ্বিতীয় প্রকাশ :
২রা আষাঢ়, ১৩৬৪

তৃতীয় প্রকাশ :
রথযাত্রা, ১৩৬৮

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
মোহন প্রেস
২, করিস চার্চ লেন

প্রচ্ছদপট :
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধিয়েছেন :
মডার্ন বাইণ্ডার্স

দাম :
সাড়ে পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

কবি শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

করকমলে

নিবেদন

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বিচিত্র প্রবন্ধের সমষ্টি, তাই গ্রন্থের নাম রবীন্দ্র-বিচিত্রা।

প্রবন্ধগুলি গত ১৫।১৬ বছরের মধ্যে নানা সময়ে নানা উপলক্ষে লিখিত।

'শেষের কবিতা' প্রবন্ধটির রচনাকাল খুব সম্ভব ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সাল।

'রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র' প্রবন্ধটি যখন লিখিত হয়, তখনো রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পর্যায়ের পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। চিঠিপত্র পাঁচ খণ্ড পড়িয়াছি কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করিতেছি না।

'জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা' প্রবন্ধটি অন্য নামে গ্রন্থান্তরে ছিল। এক্ষণে উহা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়া রবীন্দ্র-বিচিত্রায় গ্রথিত হইল।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণে সাতটি নূতন প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইল।

২রা আষাঢ়,
১৩৬৪

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কয়েকটি প্রবন্ধ অন্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়ায় বাদ দেওয়া হইল। তেমনি আবার নূতন দুটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইল। বইয়ের কলেবর পূর্ববৎ রহিল।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর

কীট্‌সের 'এণ্ডাইমিওন' কাব্যের প্রথম ছত্রটি—A thing of beauty is a joy for ever, কিন্তু খসড়ায় ছত্রটি ছিল—A thing of beauty is a constant joy ; ছু'য়ের মধ্যে অর্থগত প্রভেদ নাই, শব্দগত প্রভেদও যৎসামান্য, a joy for ever-এর স্থানে a constant joy, কিন্তু ঐ সামান্য প্রভেদেই রসের দুস্তর তারতম্য ঘটিয়াছে, একটি বাণীর অমর মুদ্রাঙ্কমণ্ডিত, অপরটি কবির একটি ধারণার বিবৃতি মাত্র। আসল কথা এই যে, কাব্য ও অ-কাব্যের মধ্যে একটি পদক্ষেপের মাত্র ব্যবধান। বিবাহ-সভায় বর-বধূ একত্র সমপদক্ষেপে সপ্তপদ গমন করিয়া থাকে, ঐ সপ্তপদ গমনের পরে তাহারা ছু'য়ে এক হইয়া দম্পতিতে পরিণত হয়। কিন্তু আবার ঐ সভাতেই উদ্যোক্তাগণ কত যাতায়াত করিতেছে—তাহারা যে একক সেই এককই থাকিয়া যায়। কাব্যে বাক্য ও অর্থ নিরন্তর সপ্তপদী গমনচেষ্টা করিতেছে, যেখানে যথাতাল গতিসম্পন্ন হইতেছে, সেখানে বাক্য ও অর্থ দম্পতিতে পরিণত হইয়া 'জগতঃ পিতরৌ' হইয়া উঠিতেছে। প্রভেদ সামান্যই—কিন্তু সামান্য প্রভেদের মধ্যেই কাব্যের মর্মগত রহস্য নিহিত। A constant joy যে কাব্য নয়, কাব্যের খসড়া মাত্র, তার কারণ ওখানে বাক্য ও অর্থের সমতাল সপ্তপদী গমন সম্পন্ন হয় নাই—a joy for ever-এ তাহা ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রসের গাঁটছড়া বাঁধা হইয়াছে, অন্যটিতে সেরূপ কোন রহস্যময় অনিবার্য বন্ধন নাই।

এবারে রবীন্দ্রনাথের একটি ছত্র লইয়া বিচার করা যাক। 'বর্ষা-মঙ্গল' কবিতার একটি ছত্র—'গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে। কোন কোন সংস্করণে কবিকৃত পরিবর্তন এইরূপ—'গুরু গর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে।' ছু'য়ে প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট। শেষেরটিকে

অকাব্য বলিব না বটে, কিন্তু প্রথমটির তুলনায় অনেক নীচে তাহার আসন। একটিতে মুগ্ধ সৌন্দর্য—অপরটিতে মহৎ সৌন্দর্য চোখে পড়ে। বর্ষার ঘনঘটার মধ্যে গুরুগর্জনসম্বলিত বিদ্যুদ্‌বিকাশে চোখে পড়িল একটি নীপমঞ্জরী, আর একটিতে সমস্ত দিগন্তের হৃৎকম্পন ধ্বনিত হইয়া উঠিল; একটির নায়ক মানুষ, তাহার চোখে পড়িতেছে ক্ষুদ্র মুগ্ধ একটি 'নীপমঞ্জরী'—আর একটি নায়কনিরপেক্ষ, কে দেখিল না দেখিল কবি সন্ধান করেন নাই। গুরু-গর্জনের আনন্দময় সঙ্কেতে নীল অরণ্যরেখা পুলকিত হইয়া উঠিল, মানব-নিরপেক্ষ আদিম প্রকৃতি ওখানে আপন ভাবাবেগে আপনি আন্দোলিত হইতেছে; একটিতে মানুষের দৃষ্টির বিষয়ীভূত Close-up shot' আর একটিতে বিশ্বব্যাপী প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন; দুই-ই সুন্দর, কিন্তু একটি মুগ্ধ সুন্দর-আর একটি মহৎ সুন্দর, একটি মুগ্ধ বা Pretty আর একটি মহৎ বা Grand; একটি মুগ্ধ কাব্য আর একটি মহৎ কাব্য। অথচ কত সামান্য প্রভেদে এই তারতম্য ঘটিয়াছে—দুটিমাত্র শব্দের অদলবদল, নীপমঞ্জরী আর নীল অরণ্য। এত সামান্য প্রভেদে কাব্যে অকাব্যে বা মুগ্ধ কাব্যে ও মহৎ কাব্যে প্রভেদ ঘটিয়া থাকে।

রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্করণ প্রকাশ হইবার ফলে কবির অনেক কবিতার খসড়া রূপটি দেখিতে পাওয়া গেল। প্রত্যেক খণ্ড রচনাবলীর পরিশিষ্টরূপে গ্রন্থপরিচয় অংশ সংযোজিত হইয়াছে এবং সম্পাদকগণ অশেষ অধ্যবসায় সহকারে নানা স্থান হইতে অনেক কবিতার সম্পূর্ণ বা আংশিক পূর্বরূপ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহার ফলে পাঠক ও সমালোচক সকলেরই কবিতাগুলি তুলনায় পড়িবার সুযোগ হইয়াছে। রসিক কেবল তুলনায় রসভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন, কিন্তু সমালোচক ইচ্ছা করিলে দুটি রূপে মিলাইয়া কবিচিত্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিতে পারেন, দেখাইতে পারেন। খসড়া কবিতা কিভাবে পূর্ণরূপ

গ্রহণ করিয়াছে, কেন তাহার রূপান্তর ঘটিল, একটি হইতে অন্যটিতে সংক্রমণে কবিচিত্তের কি রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে —এতদিনে তাহা বুঝিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ণাঙ্গ কবিতায় কবিচিত্তের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ, খসড়ায় তাঁহার প্রতিভা ভাঙা-গড়ার মধ্যে প্রকাশিত; পূর্ণাঙ্গ শিল্পের ইন্দ্রধনু বিশ্লেষণ সহজ নয়, খসড়ায় সে অসুবিধা নাই, তাহাতে কবিকে যেন নেপথ্যে পাওয়া যাইতেছে যখন তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবার অবকাশ পান নাই। নেপথ্যের পরিচয় শিল্পের চূড়ান্ত রূপ না হইতে পারে, কিন্তু সেটা দৃষ্টির মধ্যে থাকিলে চূড়ান্ত পরিচয়টিও পূর্ণতর হইয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস। এখানে 'কল্পনা' কাব্যের তিনটি অতিপ্রসিদ্ধ কবিতার খসড়া-রূপ লইয়া আলোচনা করিব ইচ্ছা করিয়াছি।[১]

প্রথমে 'প্রকাশ' কবিতাটিকে লওয়া যাইতে পারে। খসড়ায় ইহার নাম 'ধরা-পড়া'—অবশ্য বন্ধনীমধ্যে প্রকাশ শব্দটিও লিখিত আছে। খসড়ায় চারিটি মাত্র শ্লোক—আকারে অনতিদীর্ঘ। পূর্ণাঙ্গ কবিতাটি দীর্ঘ, নয়টি শ্লোক-সমন্বিত। কিন্তু আসল প্রভেদ আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। খসড়াটি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, পূর্ণাঙ্গ রূপ কেবল দীর্ঘতর নয়, মহত্তর। খসড়ায় কবির যে কলম বাম হাতে চলিয়াছে, পূর্ণাঙ্গ রূপে তাহার দক্ষিণ হাতের চাল, কবির দাক্ষিণ্য প্রকাশের আর বিরাম নাই।

খসড়া হইতে খানিকটা উদ্ধার করা যাইতে পারে—

চাঁদের সাথে চকোরীর
নলিনী সাথে তপনের
মেঘের সাথে বিজুরির
প্রণয় শুধু স্বপনের;

১ চৌরপঞ্চাশিকা, পিয়াসী ও প্রকাশ কবিতার খসড়া-রূপ—গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭ম খণ্ড।

সে-সব চোখে চোখে কথা,
সে-সব মহা গোপনতা,
লুকানো কত ছল ভরা,
কাহার কাছে করে কোথা,
প্রথম পড়েছিল ধরা !

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, কবিতাটির প্রেরণার মূলে শেলির 'Love's Philosophy'-র আইডিয়া বর্ত্তমান। কথাটা সত্য বলিয়াই মনে হয়। খসড়ার শেষ ক'টি ছত্র শেলির কবিতার শেষ ক'টি ছত্রের প্রায় ভাবানুবাদ—

কহিল সুখে মুখ চুমি—
পড়িল ধরা ত্রিভুবন
পড়িনু ধরা আমি তুমি।

শেলির কবিতায় আছে—

What are all these kissings worth
If thou kiss not me ?

অবশ্য শেলির কবিতার সঙ্গে কাব্যশিল্প হিসাবে কবিতাটির তুলনা হয় না, আবার পূর্ণাঙ্গ কবিতাটির সঙ্গেও খসড়ার তুলনা হয় না—দু'য়ের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ ঘটিয়া গিয়াছে—একটি অতি উচ্চাঙ্গের কাব্য আরও একটি নিতান্তই অকাব্য। পূর্ণাঙ্গ কবিতাটির দুটি ছত্র উদ্ধার করা যাইতে পারে, অধিক অনাবশ্যক, কবিতাটি সুপরিচিত।

হাজার হাজার বছর কেটেছে
কেহ তো কহেনি কথা,
ভ্রমর ফিরিছে মাধবীকুঞ্জে,
তরুরে ঘিরেছে লতা ;

এ দু'য়ের মধ্যে তরতমের প্রভেদ মাত্র নয়, কাব্য অকাব্যের প্রভেদ —একথা আগেই বলিয়াছি। কেন এমন হইল ?

খসড়ায় রবীন্দ্রনাথের মন শেলির কল্পনার অক্ষরেখা অনুসরণ করিতেছিল, তাই অক্ষম ভাবানুবাদের বেশি হয় নাই ; পূর্ণাঙ্গ রূপে

তাঁহার মন নিজের কল্পনাকে অনুসরণ করিয়াছে। এটি প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ—পূর্ণাঙ্গ কবিতায় ছন্দের অবাধ প্রসার। যে অনন্তকালের প্রণয়-ইতিহাস কবি লিখিতে বসিয়াছেন,

চাঁদের সাথে চকোরীর
নলিনী সাথে তপনের

হ্রস্বায়ত ছন্দ তাহার যোগ্য বাহন নহে,

হাজার হাজার বছর কেটেছে,
কেহ তো কহেনি কথা-র

উদার অবাধ বিস্তারই তাহার প্রকাশের যথার্থ ক্ষেত্র। খসড়ার ক্ষুদ্র পিঞ্জরে উদাত্ত কল্পনার যে গরুড় মুদিতপক্ষ ছিল, পূর্ণাঙ্গ রূপের আকাশজোড়া খাঁচায় সে মুক্তপক্ষ হইবার স্থান পাইয়াছে—আর সেই স্থান পাইয়াছে বলিয়াই খসড়ার শেলি-অনুসারী কল্পনা পূর্ণাঙ্গ রূপটিতে স্বাবলম্বী হইয়া মহত্তর সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

তৃতীয় কারণ—রবীন্দ্রনাথ হাজার হাজার বছরের রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবার দায়িত্ব 'কবি'র উপর অর্পণ করিয়াছেন, খসড়ায় এই মানবিক সূত্রটি নাই বলিলেই চলে—একবার মাত্র 'কবি'র উল্লেখ আছে, তাহাও আবার নিতান্ত গৌণ রূপে—

পরের দিন কবি-গীতে
রটিয়া যেতো সে বারতা!

খসড়ায় প্রকৃতিই প্রধানপদবাচ্য, কবির স্থান নিতান্তই যেন পাদ-টীকায়; পূর্ণাঙ্গ রূপে সমস্ত বিশ্বরহস্যের ঘনীভূত বাসরকেন্দ্রে কবিকে স্থাপন করা হইয়াছে, তার ফলে প্রাকৃতিক রহস্য মানবিক রহস্যের ভাষায় প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে—যাহা ছিল প্রাকৃতিক সত্য, তাহা শিল্পের সত্য হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ঘটকরূপে দেখা দিয়া কবি মানব ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে শিল্পের বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে।

এই সব তথ্য হইতে প্রভেদের কারণ কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে, কিন্তু চরম কারণটি অর্থাৎ আসল রহস্যটি বুঝাইবার উপায় নাই, যদি থাকিত তবে তো রহস্যই হইত না, আর যথার্থ কবিতার প্রাণ সর্বদাই রহস্যনির্ভর।

মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে
রয়েছে কি ভাব ভরা,
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর
কিছুই পড়ে না ধরা।

কবির পক্ষেও যেমন, সমালোচকের পক্ষেও তেমনি। সৃষ্টির আদিম রহস্য ফাঁস করিয়া দিবার অভিশাপ কবির সৃষ্টি নিজ শিরে বহন করিতেছে। কবির বাচালতার ফলে সৃষ্টি সতর্ক হইয়া গিয়াছে—সেই দৃষ্টান্তে 'কবি'র সৃষ্টিও গুণ্ঠন আরও আঁটিয়া লইয়াছে—সমালোচকের কাছে তাহার শেষ রহস্য কিছুতেই উদ্‌ঘাটন করিবে না,

শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে
সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন
বন হ'তে উপবনে।

সেই হাওয়ার ইশারা ধরিয়া যতটুকু বলা সম্ভব—তাহাই বলিলাম।

এবারে চৌর-পঞ্চাশিকা কবিতাটির খসড়ায় ও পূর্ণাঙ্গ রূপে তুলনা করা যাইতে পারে। খসড়াটি দীর্ঘতর, কাজেই পূর্ণাঙ্গ রূপে অনেক কথা বাদ পড়িয়াছে—

যবনীরা নবনীনির্মল শুভ্র রূপে
অলিন্দে বসিয়া
না কহে স্বদেশকথা অতি চুপে চুপে
দীর্ঘ নিঃশ্বসিয়া।
দূরে হতে কঞ্চুকীর পদশব্দ শুনি
আচম্বিতে উঠি

বসন সংবরি যত সলজ্জা তরুণী
নাহি যায় ছুটি।

সুন্দর চিত্র—এ চিত্র পূর্ণাঙ্গ রূপে নাই, এমন আরও মনোরম চিত্র বাদ পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপটিই যে শ্রেষ্ঠতর রূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ কি?

প্রথমত, মূলের অক্ষরবৃত্তও ছন্দ পূর্ণাঙ্গ রূপে মাত্রাবৃত্তে পরিবর্তিত হইবার ফলে এমন একটি ললিত ঝঙ্কার ধ্বনিত হইয়াছে যাহাতে বিস্থার অলঙ্কারশিঞ্জিত মনে পড়িয়া যায়—সমস্ত কবিতাটির মধ্যে প্রণয়ের যে ললিতকোমল ভাবটি প্রকাশিত, তাহার উপযুক্ত ছন্দো-বাহন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নয়, মাত্রাবৃত্ত।

দ্বিতীয় কারণ, পূর্ণাঙ্গ রূপে 'ওগো সুন্দর চোর'—এই ধ্বনিকে ধুয়ারূপে গ্রহণ করিয়া বারংবার আবৃত্তি করা হইয়াছে। সম শব্দের বা প্রায়-সম শব্দের সুনিপুণ পুনরাবর্তনে কাব্যে একপ্রকার মোহ উৎপন্ন হয়—'ওগো সুন্দর চোর' এর পৌনঃপুনিক আবর্তনে তাহাই ঘটিয়াছে, একটি সূক্ষ্ম উজ্জ্বল মোহময় ইন্দ্রধনুময় কুয়াশা জমিয়া উঠিয়াছে—নির্বাপিতদীপানলশিখা বাসরভবনের বহুদিনগত রহস্য প্রকাশের পক্ষে ঐ কুয়াশাটির বড় প্রয়োজন ছিল। জাদুকর যেমন মায়াযষ্টি বুলাইয়া ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে, 'ওগো সুন্দর চোর'-এর মায়াযষ্টি সেইরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

আরও একটি কথা, 'সুন্দর' শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ, অর্থাৎ শব্দটিকে একাধারে বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে নিয়োগেও কবিতাটির মাধুর্য অল্প বাড়ে নাই; বিশেষভাবে ঐ শব্দটি বারংবার আবর্তনশীল ধুয়ার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া অর্থগৌরবের দ্বিত্ব মনকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া আপন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে।

এবারে তৃতীয় কবিতা—'পিয়াসী'। এই কবিতাটির খসড়া ও পূর্ণাঙ্গ রূপের মধ্যে শিল্পগত তারতম্য সামান্যই, এমন কি, খসড়াটিকেও অনেকে শিল্পের সুষ্ঠুতর প্রকাশ মনে করিলে বিস্মিত

হইবার কিছুই নাই। তবু সূক্ষ্ম বিচারে মনে হয় যে, চূড়ান্ত রূপটিই শ্রেষ্ঠতর, তাহার তিনটি শ্লোকে অগ্রগতির তিনটি পদক্ষেপ। প্রত্যেক শ্লোকের প্রথম ছত্র এবং শেষ ছত্র বিশ্লেষণ করিলে ক্রমবিকাশের গতি লক্ষ্য করা যাইবে।

প্রথম শ্লোকের 'আমি তো চাহিনি কিছু' দ্বিতীয় শ্লোকের 'আমি তো কহিনি কথা' এবং তৃতীয় শ্লোকের 'আমি তো যাইনি কাছে'-র মধ্যে 'পিয়াসী'র মনোভাবের যে ক্রমপরিণতি কবিতাটির অর্থগৌরববৃদ্ধিতে সাহায্য করে—খসড়ায় তাহা একেবারেই নাই। প্রত্যেক শ্লোকের শেষ ছত্রেও নৈরাশ্যের একটা ক্রমপরিণতি আছে—অবশ্য ইহা খসড়া ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দুটিতেই আছে, প্রায় সমগুরুত্বেই আছে, তবু পূর্ণাঙ্গ রূপের ছত্রগুলিই যেন অধিকতর সৌষ্ঠবসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। মোটের উপরে বলা যায়—চৌর-পঞ্চাশিকা ও প্রকাশ কবিতার দুটি রূপের মধ্যে যে দুস্তর বাধা—পিয়াসীর ক্ষেত্রে তেমন নয়; এমন কি, একটা ছাড়িয়া অপরটিকে পছন্দ করিলে দোষ দেওয়া যায় না।

এখন রবীন্দ্রকাব্য-আলোচনায় গভীরভাবে ও বিস্তারিতভাবে প্রবেশের সময় আসিয়াছে, রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তরের আলোচনা এবারে আরম্ভ হওয়া উচিত। এতদিন সে আলোচনার উপাদানের অভাব ছিল, রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্করণ প্রকাশিত হইবার ফলে সে অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। আরও দূর হওয়া আবশ্যক। এইজাতীয় আলোচনার উপাদান আরও অধিক পরিমাণে পাঠক-সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

২

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কবিতাগুলিতেই পাঠান্তর বেশি আগের দিকেও আছে, তবে তুলনায় কম। পাঠান্তরবাহুল্য পূরবী হইতে যেন বেশি করিয়া দেখা দিয়াছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করা

আবশ্যক। এমন হওয়া অসম্ভব নহে যে, প্রথম দিকের পাঠান্তর-গুলি রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এ যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রাহ্য নয়। প্রথমজীবনের কাব্যের যে-সব পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পাঠান্তরগুলি লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলির সঙ্গে শেষজীবনের পাণ্ডুলিপির তুলনা করিলে সহজেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। আরও একটি কথা, সেটি আমাদেরই অনুকূলে। রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্করণের গ্রন্থপরিচয় অংশে যে-সব পাঠান্তর মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার ভিত্তি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, পাণ্ডুলিপিতে লিখিত সবগুলি পাঠান্তর গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত করা সম্ভব হয় নাই; সংখ্যায় তাহারা আরও বেশি। কাজেই শেষজীবনের কাব্যে পাঠান্তর যে জীবনের পূর্বার্ধের চেয়ে অনেক বেশি—একথা স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

এবারে প্রশ্ন—কেন এমন হইল? অনেকে বলিতে পারেন যে, কবিতা তো একেবারে স্বয়ম্পূর্ণ মূর্তিতে প্রথমেই দেখা দেয় না—মনের মধ্যে অনেক ওলটপালট, অনেক রদবদল চলিতে থাকে, সেগুলিকে কেহ ধরিয়া রাখে না, ধরিয়া রাখিলে সেগুলিও পাঠান্তর বলিয়া গৃহীত হইতে পারিত। ওসব যেন শ্লেটের লেখা, লিখিবার পরেই মুছিয়া ফেলা হয়। ওয়ার্ডস্বার্থের অভ্যাস ছিল যে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিবার সময়ে মনে মনে কবিতা রচনা করিতেন, তখন নিশ্চয়ই অনেক রদবদল হইত, বাড়িতে ফিরিয়া চূড়ান্ত রূপটি লিপিবদ্ধ করিতেন, সে-সব পাঠান্তর হাওয়ায় মিশিয়া গিয়াছে, কেহ ধরিয়া রাখে নাই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় এ নিয়ম প্রযোজ্য। কাজেই কোন কবিতার পাঠান্তর পাওয়া না গেলেই ধরিয়া লওয়া উচিত নয় যে, কবিতাটি একেবারে স্বয়ম্ভূমূর্তিতে দেখা দিয়াছে। এ সমস্তই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু হাওয়ার উপরে নির্ভর করিয়া তো আলোচনা চলে না। লিপিবদ্ধ প্রমাণকে স্বীকার

করিয়া লইয়াই আলোচনা চালাইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ প্রমাণ আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে। সেটি কি, প্রথমেই বলিয়াছি —কবির শেষজীবনের কাব্যে পাঠান্তরের সংখ্যা জীবনপূর্বার্ধের চেয়ে অনেক বেশি।

এখন, পাঠান্তর সাধারণত দুই শ্রেণীর হইতে পারে। একটি ক্রমবিকাশমূলক, অপরটি সমান্তরালমূলক। কবির বিবেচনায় কবিতার যে রূপটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত তাহাই রক্ষিত হয়— অনেক সময়ে কবিতার বিবর্তনের রূপসমূহ যদি মনে মনে না হইয়া লিখিত আকারে হইয়া থাকে সেগুলি খাতার মধ্যে থাকিয়া যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে, ঐগুলি কবিতার বিবর্তনের ধাপ— ঐ ধাপগুলি উত্তীর্ণ হইয়া কবিতাটি তাহার চূড়ান্ত রূপে পৌঁছিয়াছে। এই শ্রেণীর পাঠান্তরকে ক্রমবিকাশমূলক বা বিবর্তনমূলক পাঠান্তর বলা চলে।

আর একশ্রেণীর পাঠান্তর আছে—তাহাকে সমান্তরাল পাঠান্তর বলিয়াছি। কোন কবিতার হয়তো তিনটি পাঠ আছে, তাহাদের সৃষ্টির মূলে বিবর্তনের নিয়ম সক্রিয় নয়;—একটির চেয়ে আর একটি শিল্পসৃষ্টি হিসাবে যে উন্নততর এমন নয়, তিনটিই সমান ভালো বা তিনটিই সমান মন্দ; অর্থাৎ কবিতাটি যেন সমুখের দিকে না বাড়িয়া গঙ্গার ইলিশের মতো পাশের দিকে বাড়িয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর পাঠান্তরকে সমান্তরাল বলা অন্যায় হইবে না। এই দুই শ্রেণীর পাঠান্তরের আলোচনাই শিক্ষাপ্রদ। ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তরের আলোচনা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য—কারণ ক্রমবিকাশের একটা লক্ষ্য আছে—এবং চূড়ান্ত রূপে সে লক্ষ্যটিকে আমরা পাইতেছি। কিন্তু সমান্তরাল শ্রেণীর আলোচনা তেমন অনায়াসসাধ্য নয়—এখানে কবির লক্ষ্য কি আমরা স্পষ্ট জানিতে পাই না, অনেক সময়ে একেবারেই জানিতে পাই না। কেন তিনি পাঁচটি অল্পবিস্তর সমান রূপ সৃষ্টি করিতে গেলেন, কেনই বা

সেগুলিকে চূড়ান্ত মর্যাদা না দিয়া পাঠান্তরের গাদায় নিক্ষেপ করিলেন, সমুখের দিকে হস্ত প্রসারিত না করিয়া, কেন তিনি পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া মরিতেছিলেন—এসব রহস্য সত্যই দুর্জ্ঞেয়।

পাঠান্তরের এই দুটি মূলশ্রেণী ছাড়াও অন্যরূপ পাঠান্তর হইতে পারে—কিন্তু সে কথা প্রসঙ্গত আসিবে।

৩

এখন, রবীন্দ্রনাথেব একটি প্রসিদ্ধ কবিতার প্রসঙ্গে এই দুই শ্রেণীর পাঠান্তবের আলোচনা করিব। কবিতাটি মহুয়া কাব্যগ্রন্থের —উজ্জীবন। সৌভাগ্যবশত এই একটি কবিতারই দুই শ্রেণীর পাঠান্তব বর্তমান, তাহাতে আলোচনা অনেক পরিমাণে সুসাধ্য হইয়া আসিবে।

মহুয়া কাব্যে মুদ্রিত পাঠ-কেই চূড়ান্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। খুব সম্ভবত ইহার প্রথমতম রূপ—

উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি ধূর্জটির ক্রোধবহ্নিশিখা
হে মন্মথ, মনসিজ, হে মনের মায়া মরীচিকা—
তৃষ্ণামরু বিহারে বিলাস—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

ইত্যাদি।[১]

এবারে কাবিতাটির পূর্ণাঙ্গ রূপ এবং এই প্রাথমিক রূপের মধ্যে তুলনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়—একটি হইতে আর একটির বিকাশ হইয়াছে—অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমবিকাশের। পাঠান্তরটি অসম্পূর্ণ বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। এ অনুমান সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, পাঠান্তরেব শেষ পর্যন্ত যাইবার প্রয়োজন কবি বোধ করেন নাই, তার আগেই পূর্ণতর রূপটি

---

১ গ্রন্থপরিচয় পৃঃ ৫১৭, র-র, ১৫শ খণ্ড। "তপতীর পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পাঠ। অসম্পূর্ণ?"

তাঁহার কল্পনায় উদ্ভাসিত হওয়াতে অপূর্ণ রূপটিকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এ যেমন গেল কবিতাটির ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তর, তেমনি আছে সমান্তরালমূলক পাঠান্তব, তাহাদের তিনটি রূপ।[১] মহুয়ার চূড়ান্ত পাঠ ধরিলে চারটি—আর পূর্বে উল্লিখিত ক্রমবিকাশমূলক পাঠ ধরিলে সবশুদ্ধ পাঁচটি।

এখানে সমান্তরাল পাঠান্তব তিনটিই আলোচ্য। পাঠ তিনটি দেখিলেই বুঝিতে পাবা যাইবে যে ইহাদেব মধ্যে সম্বন্ধ আব যাই হোক ক্রমবিকাশের নয়,—একটিব চেয়ে আব একটি সমৃদ্ধতর নয়; আবার একটির সঙ্গে আব একটির প্রভেদ মূলগত নয, নিতান্তই শাখাগত, এ যেন অনেকটা অন্ধভাবে হস্তক্ষেপ—কোন্ রত্নের অন্বেষণে? যাহারই অন্বেষণ হোক, ফলকথা তিনটি পাঠান্তর সমান্তরালভাবে বিরাজ করিতেছে, শুধু তাই নয, পাঠান্তরের কোন কোন অংশ চূড়ান্তরূপে গৃহীত পাঠটির চেযেও সুন্দর ও সমৃদ্ধ।[২]

এবারে মহুযা কাব্যগ্রন্থের আব কতকগুলি পাঠান্তবের আলোচনা করা যাইতে পারে।

১ (১) গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৫০৬, র র, ১৫শ খণ্ড

(২) তপতী ১ম সং পৃ ৫২ ৫৫

(৩) তপতী ৩য় সং, পৃঃ ৪৫

২ পূর্ণাঙ্গ রূপে আছে—'দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ', সমান্তরাল পাঠে আছে—'সঙ্কট-বন্ধুর তব দীর্ঘ রাজপথ'। ব্যঞ্জনার গুণে 'সঙ্কট বন্ধুর' পূর্ণাঙ্গরূপের চে য় শ্রেষ্ঠতর, কেননা, 'সঙ্কট বন্ধুর' বলি তে দুঃখসুখের বন্ধুরতাকেই বোঝায়—আরও কিছু বেশির সঙ্কেত করে, সেই সঙ্কেতটুকু 'দুঃখে সুখে বেদনা'র স্পষ্টোক্তির মধ্যে নাই।

তারপরে 'দীর্ঘ রাজপথ'—শুধু 'পথ, এর চেয়ে সমৃদ্ধতর। মহুয়া প্রেমের কাব্য, তপতী প্রেম-ব্যতিক্রমের নাটক, যাহারই পটভূমিতে কবিতাটিকে দেখা যাক—প্রেমের 'রাজপথ' বর্ণনাই সার্থকতর বলিয়া মনে হয়। এমন কি, সাধারণভাবে গ্রহণ করিলেও সংসারে প্রেমের অভিযান রাজপথরূপেই বর্ণনযোগ্য, শুধু 'পথ' তাহার পক্ষে নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। চূড়ান্ত পাঠটিতে প্রেমের অভিযানের বন্ধুরতাই শুধু আছে, পাঠান্তরে তাহার বন্ধুরতা ও প্রসার দুটি গুণকেই পাইতেছি।

মহুয়ার বরণ কবিতাটির একটি পাঠান্তর গ্রন্থপরিচয়ে আছে।[১] চূড়ান্ত রূপ ও পাঠান্তর, দুটিই দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান, তবে প্রথমোক্তটির শ্লোকব্যূহের ছত্রসজ্জা অনিয়মিত, শেষোক্তটির নিয়মিত। ভাবের ঐশ্বর্যে পূর্ণাঙ্গ রূপটিই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর।

তুমি যেন মহাকাল সমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যান মাঝে উমার ভৈরবী।

এই অংশের অনুরূপ পাঠান্তরে নাই।

তবে এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণীয়। বলাকার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা—এবং অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা তো বটেই—অনিয়মিত শ্লোকব্যূহে রচিত। এমন হইবার কারণ কি? এই উপলক্ষে মনে রাখা আবশ্যক যে, গদ্য-ছন্দ অনিয়মিত শ্লোকব্যূহ হইতেই উদ্ভূত, আর তাহা অনিয়মিত শ্লোকব্যূহেরই একটা চূড়ান্ত রূপ।

মহুয়া কবিতার পাঠান্তর অষ্টাদশমাত্রার একটি সনেটে[২]; চূড়ান্ত রূপটি অনেক দীর্ঘ, কাজেই অনেক অতিরিক্ত বস্তুতেও পূর্ণ। কিন্তু এখানেও পূর্বোক্ত সমস্যার সাক্ষাৎ পাই। নিয়মিত শ্লোকব্যূহের স্থলে কবি অনিয়মিত শ্লোকব্যূহকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্তর্ধান ও বিরহ দুটি কবিতা, কিন্তু গ্রন্থপরিচয়ে এ দুটি একটিমাত্র দেহে শৃঙ্খলিত।[৩] শৃঙ্খল মোচন করিয়া, যাহারা স্বভাবত স্বতন্ত্র তাহাদের ভিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

এইজাতীয় পাঠান্তরের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাইব, কখনো দুইকে এক করা হইয়াছে, কখনো এক দুই হইয়া গিয়াছে। এই শিল্পগত অস্থিরতা একপ্রকার আত্মাগত অশান্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া

১ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৫১৯, র-র, ১৫শ খণ্ড
২ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৫২১, র-র, ১৫শ খণ্ড
৩ তদেব পৃঃ ৫২১-৫২২, র-র, ১৫শ খণ্ড

মনে হয়। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক যাহাতে কবির অন্তর্লোক সম্বন্ধে অনেক রহস্য জানিতে পারা যাইবে।

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'বিচিত্রা' কবিতাটির পাঠান্তর আলোচনাযোগ্য। পূর্ণতর রূপটি দীর্ঘতর এবং হালকা ছন্দে রচিত; পাঠান্তরটির ছন্দ গম্ভীর, আকারও তুলনায় ছোট। কিন্তু একটি কারণে পাঠান্তরটি আমার কাছে কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠতর মনে হয়—এখানে শিল্পীর উপরে তাত্ত্বিকের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ ঘটে নাই। চূড়ান্ত রূপের শেষ শ্লোক দুটি একেবারেই অবান্তর, কবিতাটির মধ্যে না ছিল তাহাদের সম্ভাবনা, রসোদ্বোধনের জন্য না আছে তাহাদের আবশ্যক, বরঞ্চ সচেতন তত্ত্বসৃষ্টিপ্রয়াস দ্বারা রসভঙ্গ হইয়াছে বলিয়াই আমার ধারণা। এ রকম উদাহরণ রবীন্দ্রকাব্যে আরও আছে, তবে শেষের দিকের কাব্যেই তাহাদের সংখ্যা বেশি।

'শেষ সপ্তক' কাব্যের প্রায় সবগুলি কবিতারই একাধিক রূপ, কোন কোন কবিতার তিনটি করিয়া রূপ বর্তমান। মূল কাব্য-খানির সঙ্গে 'সংযোজন' ও গ্রন্থপরিচয় অংশ মিলাইয়া পড়িলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। কোন কোন কবিতার—যেমন 'ঘটভরা' কবিতাটির—তিনটি রূপই গদ্য-ছন্দে লিখিত। অনেক কবিতার একটি রূপ গদ্য-ছন্দে, একটি রূপ পদ্যে লিখিত; কোন কোন কবিতার সঙ্গে আবার পরবর্তী কাব্য 'প্রান্তিকে'র ঘনিষ্ঠ মিল।

বিভিন্ন রূপগুলি পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এগুলি ক্রমবিকাশমূলক নয়, সমান্তরাল। একটির সঙ্গে আর একটির যেটুকু প্রভেদ, তাহাতে কোনটিকে নিশ্চিতভাবে উন্নততর রূপ বলা যায় না, কোনটা বা এক অংশে উন্নত, কোনটা বা আর এক অংশে উন্নত। মোট কথা সমান্তরালতাই ইহাদের প্রধান লক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিবে। কাব্যের সমান্তরাল রূপ কি সম্ভব? ক্রমবিকাশমূলক অবশ্যই সম্ভব, কেননা ক্রমবিকাশের

ধাপে ধাপেই কাব্য চরম রূপে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু সমান্তরাল রূপ কি করিয়া সম্ভব? অপরপক্ষ বলিতে পারেন—সম্ভব যে তাহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না—সমান্তরাল রূপ আদৌ কেন?

আমার সাধ্যানুসারে প্রশ্নটার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। সূক্ষ্ম বিচারে শব্দের প্রতিশব্দ সম্ভব নয়, অথচ অভিধানে তো প্রতি-শব্দের অভাব নাই। একটা উদাহরণ লওয়া যাক। শিখী ও কলাপী দুই-ই ময়ূর, ওদুটি ময়ূরের প্রতিশব্দ। ইহাই স্থূল বিচার। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার বা শিল্পীর বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

'উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহবে।'

এখানে 'কলাপী'র বদলে 'ময়ূর' বা অন্য প্রতিশব্দে চলিত কি? মেঘসন্দর্শনে হৃষ্ট ময়ূরের বিস্ফারিত পুচ্ছের প্রতিই এখানে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ, কাজেই অভিধান যাহাই বলুক, এখানে কবির ভাব-প্রকাশের একটি মাত্র শব্দ বর্তমান, সেটি 'কলাপী'।

আবার আর একটি ছত্র লওয়া যাক—

'ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া,'

এখানে 'কলাপী' একেবারেই অচল, এখানে কবির দৃষ্টি ময়ূরের শিখাটির প্রতি নিবদ্ধ। কেন এমন হইল? প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে মেঘোদয়ে ময়ূরের কলাপ মেলিবার প্রশস্ত স্থান আছে, ভবন-বলভিতে সে সঙ্কুচিতসত্তা, তাই কবি কল্পনার রশ্মি ঐ ক্ষুদ্র শিখাটির উপরে মাত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

আরও একটি উদাহরণ লওয়া যাক্—

'ময়ূর, করোনি মোরে ভয়।'

এখানে শিখীও নয়, কলাপীও নয়; কারণ এখানে পাখীটির কোন অঙ্গের প্রতি বা বিশেষ কোন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় নাই—তাহার মূল সত্তাটিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। মূল

শব্দটি ময়ুর, অন্যগুলি প্রতিশব্দ। কিন্তু শিল্পীর বিচারে প্রতিটিই স্বতন্ত্র শব্দ—একটির বদলে আর-একটি অচল।

এখন সূক্ষ্ম বিচারে শব্দের যদি প্রতিশব্দ সম্ভব না হয়, কাব্যেরও প্রতিরূপ সম্ভব নয়। কিন্তু আবাব সেই পুরাতন আপত্তি জাগিবে, সম্ভব সে তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। পুবাতন আপত্তির পুবাতন উত্তর। হয এগুলি প্রতিরূপ নয়, সম্পূর্ণ নূতন রূপ, কিংবা কাব্যের প্রেরণার মূলে কোন ত্রুটি আছে, যাহাতে সবটা অখণ্ড মূর্তি না পাইয়া ভাঙিয়া গিয়া গ্রহাণুপুঞ্জেব অজস্রতা লাভ করিয়াছে।

এই বিচিত্র রূপগুলি যে নূতন রূপ নয়, তাহা নিতান্ত অন্ধেও বলিতে পারিবে। তবে প্রতিরূপ! কেন? এবাবে গোড়ায় উল্লিখিত একটা কথা স্মবণ কবাইয়া দিই। ববীন্দ্র-জীবনের প্রথম দিকের তুলনায় শেষের দিকেই কবিতার রূপেব দ্বিত্ব-সংখ্যা বেশি। আমার বিশ্বাস, এ দুটি কার্যকাবণে শৃঙ্খলিত। রবীন্দ্রনাথেব কবিতাতে গোড়া হইতেই হৃদ্‌বৃত্তি (Emotion) ও চিদ্‌বৃত্তির (Intellect) ভারসাম্য দেখা যায়, একথা সত্য। কিন্তু তবুও বিশেষভাবে বলিতে গেলে প্রথম দিকেব কবিতা হৃদ্‌বৃত্তিপ্রধান, শেষজীবনের কবিতা চিদ্‌বৃত্তিপ্রধান। এই প্রসঙ্গে তুলনীয় বসুন্ধরা ও পৃথিবী কবিতা দুটি। প্রথমটির উৎস বিশ্ববোধে, দ্বিতীয়টির উৎস বিশ্ববুদ্ধিতে, একটিব উৎস হৃদয়, একটির উৎস মস্তিষ্ক। হৃদয়ের যাতায়াতপথ বহু লক্ষ বৎসর হইল চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে, সহজাত সংস্কারের বলে সে অন্ধকারেও চলিতে পারে যেমন অন্ধকারে আমরা পরিচিত গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া থাকি। হৃদয়ের তুলনায় বুদ্ধি নিতান্তই নাবালক; নূতন বাড়িতে সবেমাত্র সে প্রবেশ করিয়াছে, আলো ছাড়া তার চলে না এবং আলোতেও ভুল করিতে বাধে না; আলো পথ দেখায়, কিন্তু কোন্ পথটা ঠিক তাহা দেখাইবে কি উপায়ে?

বুদ্ধি বারংবার ভুল পথ অবলম্বন করে এবং ফিরিয়া আসে, সেই ভুল চলার পদচিহ্ন কবিতার এই প্রতিরূপগুলি; বুদ্ধি এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া মরে, সেই হাতের ছাপ এই বিচিত্র রূপগুলিতে। হৃদয় বাঘের মতো সহজাত সংস্কারের বলে যেখানে এক লাফে শিকারের ঘাড়ে গিয়া পড়ে, বুদ্ধিকে সেখানে শিকারীর মতো অনেক তাক্ করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে হয়—একটা যদি লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়, চারটা ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়ে। কবিতার প্রতিরূপগুলি সেই ইতস্তত ছড়াইয়া-পড়া তীর। প্রতিরূপের প্রাচুর্য, আর যাই হোক, প্রতিভার প্রাচুর্য নয়, হয়তো ঠিক তাহার বিপরীত।

৪

পত্রপুট কাব্যের ষোল-সংখ্যক কবিতাটি আফ্রিকা-বিষয়ক। ইহার তিনটি রূপ বর্তমান। একটি রূপ বা চূড়ান্তভাবে গৃহীত রূপ ষোল-সংখ্যক কবিতাটি, অন্য দুটি রূপ গ্রন্থপরিচয়ে প্রদত্ত।[১] চূড়ান্ত রূপটি গদ্য-ছন্দে লিখিত, অন্য দুটি রূপে অমিত্র পদ্য-ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তিনটি রূপ বা পাঠের মধ্যে ঐশ্বর্যের বিশেষ তারতম্য নাই, পাঠক ইচ্ছা করিলে যে কোন একটিকে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কবির পছন্দ গদ্য-ছন্দে লিখিত পাঠটির প্রতি। এমন হইবার কারণ মনে হয় যে, শেষ জীবনে গদ্য-ছন্দটার প্রতিই তাঁহার টান বেশি হইয়াছিল। আর একটা কারণ, বিষয়ের অভূতপূর্বতা ছন্দের অভূতপূর্বতার অপেক্ষা রাখে। পদ্য-ছন্দের তুলনায় গদ্য-ছন্দ নিঃসন্দেহ অভূতপূর্ব।

পত্রপুটের আঠারো-সংখ্যক কবিতাটি আঠারো মাত্রার ছন্দে লিখিত, গ্রন্থপরিচয়ে প্রদত্ত ইহার পাঠান্তরও নিয়মিত ছন্দব্যূহে

১ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৪৩৪-৪৩৭, র-র, ২০শ খণ্ড

সজ্জিত। পাঠান্তরের নাম 'নির্বাক'। আঠারো-সংখ্যক কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ :

'কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি,
এইবার থামো তুমি।'

বিষয়টি অবচেতন মনের তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের আলোচনার যোগ্য।

শ্যামলী কাব্যে দ্বৈত কবিতাটির পাঠান্তর বর্তমান। মূলটির নীচে রচনার তারিখ ২৩শে মে, ১৯৩৬; পাঠান্তরের নীচে তারিখ ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ সাল। ২৩শে মে ৮ই বা ৯ই জ্যৈষ্ঠ হইয়া থাকে, খুব সম্ভব সে বৎসব একই দিন ছিল। বৃদ্ধ বয়সে একই দিনে একই কবিতার দুটি পাঠান্তর রচনা শিল্পাধ্যবসায়ের একটি দৃষ্টান্ত। দুটির মধ্যে পূর্ণতর রূপটি কেন চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, প্রথম কয়েক ছত্রের তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে।

প্রথম দেখেছি তোমাকে,
বিশ্বরূপকারের ইঙ্গিতে,
তখন ছিলে তুমি আভাসে।
যেন দাঁড়িয়ে ছিলে বিধাতার মানসলোকের
সেই সীমানায়
সৃষ্টিব যেখানে আরম্ভ।
যেমন অন্ধকারে ভোরের ব্যঞ্জনা
অরণ্যের অশ্রুতপ্রায় মর্মরে
আকাশের অস্পষ্টপ্রায় রোমাঞ্চে,
ঊষা যখন পায়নি আপন নাম,
যখন জানেনি আপনাকে। (পাঠান্তর)
সেদিন ছিলে তুমি আলো আঁধারের মাঝখানটিতে,
বিধাতার মানসলোকের
মর্ত্যসীমায় পা বাড়িয়ে
বিশ্বের রূপ-আঙিনার পাছ-দুয়ারে।
যেমন ভোরবেলাকার একটুখানি ইশারা,

শালবনের পাতার মধ্যে উস্খুস্,
শেষরাত্রের গায়ে-কাঁটা দেওয়া
আলোর আড়-চাহনি ;
উষা যখন আপন-ভোলা
যখন সে পায়নি আপন ডাকনামটি পাখীর ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখনপত্রে। (মূলপাঠ)

দুটি অংশ পড়িলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে,—একটিতে কবির কল্পনায় "উষা পায়নি আপন নাম, জানেনি আপনাকে"—আর একটিতে সে সম্পূর্ণ না জাগিয়া উঠিলেও তাহার "গায়ে কাঁটা দেওয়া আলোর আড়চাহনি"—প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

আর একটু দেখা যাক্—

পৃথিবী তাকে সাজিয়ে তোলে
আপন সবুজ সোনার কাঁচলি দিয়ে,
পরায় তাকে আপন হাওয়ার চুনরি। (মূলপাঠ)

পৃথিবী তাকে আপন রঙে রাঙিয়ে তোলে,
পরায় তাকে আপন হাওয়ার উত্তরীয়। (পাঠান্তর)

ভোরের অন্ধকারের মধ্যে রঙের আভা, বস্তুর রেখা যেমন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে, পাঠান্তর হইতে মূলপাঠে তেমনিতরো একটা বিবর্তন ঘটিয়াছে। পাঠান্তরে পৃথিবীর 'আপন রঙ'—মূলপাঠে হইয়াছে আপন 'সবুজ সোনার কাঁচলি'—রঙ ও বস্তু একত্র স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে; আবার পাঠান্তরে 'হাওয়ার উত্তরীয়' মূলপাঠে হইয়াছে 'হাওয়ার চুনরি'; উত্তরীয়ের চেয়ে 'চুনরি' বিশিষ্টতর; রাত্রির অন্ধকারের নির্বিশেষে জগৎ ভোরের আলোয় ক্রমে ক্রমে বিশিষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। নির্বিশেষের বিশেষীকরণ; ইহাই তো শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্য।

পূর্বোক্ত কাব্যের 'অকাল ঘুম' কবিতাটিও পাঠান্তরসমন্বিত।[১] দ্বৈত কবিতায় যে বিবর্তনের উল্লেখ করিয়াছি এখানেও তাহার ধারা বেশ সুস্পষ্ট। দুটি অংশের তুলনা করা যাক্—

ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী
যেন সারারাত জাগা পূর্ণিমার
সকালের চাঁদ। (পাঠান্তর)

ওর ক্লান্তদেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
যেন পূর্ণিমা-রাতের ঘুমহারানো অলস চাঁদ
সকাল বেলায় শূন্য মাঠের শেষ সীমানায়। (মূলপাঠ)

দুই অংশেই মূল উপমা এক ও অভিন্ন কিন্তু তবু পাঠ দুটির মধ্যে প্রভেদ ঘটিয়াছে। পাঠান্তরে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে যোগটা অস্পষ্ট; বাঞ্ছিত সঙ্কেত, ইঙ্গিত ও সূত্রগুলি লাভ করিয়া মূলপাঠ কেমন পূর্ণতর, কাজেই কত সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে।

'কবি' কবিতায় মূল পাঠ ও পাঠান্তরের[২] মধ্যে মূল পাঠটিই শ্রেষ্ঠতর; কাহিনীর পূর্ণতরতাই তাহার একমাত্র কারণ। উভয় পাঠই গদ্য-ছন্দে লিখিত। এখানে গদ্য-ছন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার মধ্যে যেগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ বা জনপ্রিয় তাহাদের অধিকাংশই হয় কাহিনীমূলক নয় কাহিনী-আভাসিত। কাজেই অনুমান করা অমূলক নয় যে, এই জনপ্রিয়তা কাহিনীর জন্য যেমন, গদ্য-ছন্দের জন্য তেমন নয়। ইহাতে কাহিনীর প্রতি পাঠকের চিরন্তন আকর্ষণেরই যেমন প্রমাণ হয়— গদ্য-ছন্দের উৎকর্ষের তেমন প্রমাণ হয় কি? আবার কোন কোন গদ্য-কবিতার প্রসিদ্ধির বা জনপ্রিয়তার কারণ রবীন্দ্রনাথের

১ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৪৪৪—৪৪৬, র-র ২০শ খণ্ড

২ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৪৪৭—৪৪৮, র-র ২০শ খণ্ড

অসাধারণ কল্পনা-কুশল বাক্‌ভঙ্গী। দৃষ্টান্তস্থল পৃথিবীর গদ্য-কবিতা। ইহাতেও গদ্য-ছন্দের উৎকর্ষের পরীক্ষা হইল না।

পয়ারের বা অমিত্রাক্ষরের যেমন নিজস্ব একটি রূপ ও শক্তি আছে, কাহিনী বা কল্পনাকুশলতার উপরে যেমন তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়, কাহিনী বা কল্পনা তাহার ঐশ্বর্য বাড়াইতে পারে এই মাত্র, তেমনি গদ্য-ছন্দেরও একটি নিজস্ব ছান্দিক রূপ ও শক্তি থাকা সম্ভব। সাহিত্যে গদ্য-ছন্দ স্থায়ী কিংবা অতিথিমাত্র তাহা ঐ নিজস্বতার উপরেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করিবে। কাহিনীর এঞ্জিন সাহায্যে বা কাহিনী ও অলঙ্কারের ডবল এঞ্জিন সাহায্যে তাহাকে চড়াইপথ অতিক্রম করানো যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে যে তাহার স্বকীয় রূপ ও প্রাণবত্তা আছে তাহা সব সময়ে প্রমাণ হয় না। গদ্য-ছন্দের এই পরীক্ষাটিই এখনো বাকি আছে।

মধুসূদনের হাতে অমিত্রাক্ষর অমিতশক্তিশালী। পরীক্ষা সেখানে নয়। সাধারণ কবির কলমের খোঁচাতেও অমিত্রাক্ষরের প্রাণ যদি টেঁকে, নিজস্ব রূপ যদি নষ্ট না হয়, তবে বুঝিতে হইবে অমিত্রাক্ষর বাংলা সাহিত্যে আর অস্থায়ী আগন্তুকমাত্র নয়, স্থায়ী বাসিন্দার অধিকার লাভ করিয়াছে। বিদেশ হইতে আগত অমিত্রাক্ষর, সনেট, ট্র্যাজেডি প্রভৃতি অনেক শিল্পরূপেরই সে মৌলিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ লেখকের হাতে পড়িয়া তাহাদের যতই দুর্দশা হোক্ না কেন, মূল রূপের বিকার ঘটিবার আর আশঙ্কা নাই।

গদ্য-ছন্দের বেলায় সে পরীক্ষা হইয়াছে কি? তাহা স্বকীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত, না রবীন্দ্রনাথের বিভূতির ছায়ায় দণ্ডায়মান। যদি শেষের অনুমানটা সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে, গদ্য-ছন্দ একটা স্বতন্ত্র শিল্পরূপ নয়, রবীন্দ্রনাথের অনেক styleএর মতো অনবদ্য এবং অননুকরণীয় একটা style মাত্র। এ প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় হয়তো এখনো আসে নাই, আরও কিছু সময় অতিবাহিত না

হইলে, বা সাধারণ লেখকগণের আরও কিছু স্থূল হস্তক্ষেপ সহ্য না করা অবধি হয়তো সে সময় আসিবে না। তাই বিষয়টার উত্তর দিতে বৃথা চেষ্টা করিলাম না—প্রশ্নরূপেই রাখিয়া দিলাম।

'শানাই' কাব্যগ্রন্থের 'কর্ণধার' কবিতাটি যে-সব ক্রমবিকাশ-মুখী বিভিন্ন পাঠের ধারা বাহিয়া চরম বলিয়া গৃহীত পাঠটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—তাহাদের সবগুলিকেই (সত্যই কি সবগুলি —না, আরও পাঠ রহিয়াছে?) পাওয়া গিয়াছে। পাঠগুলি পর পর সাজাইলে কবির মনের বিবর্তনটি আমরা অনায়াসে ধরিতে পারিব। এই চেষ্টা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি কৌতূহলজনক। সব পাঠগুলির আদ্যন্ত উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই, সে অবসর এখানে হইবে না, সামান্য সামান্য অংশ উদ্ধার করিলেই আমাদের কাজ চলিবে।[১]

সকালবেলায় পাইলাম—

হে তরুণী, তুমিই আমার
ছুটির কর্ণধার,
অলস হাওয়ায় বাইচো স্বপনতরী
নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার ॥১॥

তারপরে বিকালবেলায় পাইতেছি

কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।

নীল নয়নের মৌনখানি
সেই সে দূরের আকাশবাণী
দিনগুলি মোর ওরি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
উদ্দেশহীন অকর্মণ্যতার ॥২॥

১ কর্ণধার, পৃঃ ৬৮—৭০ ; পূর্বপাঠ, পৃঃ ৪৭৬—৪৮০, র-র, ২৪শ।

তার পরের দিন পাইতেছি—

ছুটির কর্ণধার
দখিন হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
মন্থর দিন তারি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
ভাঁটার স্রোতে উদ্দেশহীন
কর্মহীনতার,
তুমি তখন ছুটিব কর্ণধাব
শিরায় শিরায় বাজিয়ে তোল
নীরব ঝঙ্কার॥ ৩॥

এই তিনটি পাঠেরই রচনাকাল—২৩।৫।৩৯ এবং পরের দিন বলিতে ২৪।৫।৩৯ সাল।

এবারে কয়েক মাস পবের অর্থাৎ ১৪।১০।৩৯ সালের একটি পাঠে পাইতেছি—

ওগো কর্ণধার
সৃষ্টি তোমার ভাসান খেলায়
লীলার পারাবার।

* * *

ছুটির খেলায় খেলাও কর্ণধার,
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।
লীলার কর্ণধার,
জীবন নিয়ে মৃত্যু ভাঁটায়
চলেছ কোন্ পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,

গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝঙ্কার ॥৪॥

ইহার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ২৮শে জানুআরি, ১৯৪০ সালে লিখিত যে পাঠটি পাইতেছি তাহাই পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলিয়া গৃহীত ও মুদ্রিত—

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার,
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার।

* * *

ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।
ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবনতরী মৃত্যু-ভাঁটায়
কোথায় কর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝঙ্কার ॥১॥

সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি পাঠ পাইতেছি—সময়ের হিসাবে মে মাসের তেইশে হইতে জানুআরি মাসের আটাশে, অর্থাৎ কয়েকদিন বেশি ছয় মাস। এই ছয় মাসকালে এই কবিতাটি সম্বন্ধে কবির মনে যে-সব ছায়াতপপাত ঘটিয়াছে, যে-আবর্তন-

বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার অনেকগুলিরই চিহ্ন পাওয়া গেল। এ এক সৌভাগ্য—এমন সুযোগ সাধারণত ঘটে না।[১]

কবিতাটির বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেমন লীলাচ্ছলে, প্রায় পরিহাসচ্ছলে বলিলেও অন্যায় হবে না, কবিতাটির সূত্রপাত। "হে তরুণী, তুমি আমার ছুটির কর্ণধার।" ইহার ইঙ্গিত কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, এমন মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। গানটি রচনার পটভূমি পাঠ করিলে আমার অনুমান সমর্থিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

"আজ চমৎকার দিনটি হয়েছে। কেবল কুঁড়েমি করতে ইচ্ছে করছে, তাই এই চৌকিতে হেলান দিয়ে বসেই আছি! গান গেয়ে যেতে লাগলেম, 'হে তরুণী তুমি আমার ছুটির কর্ণধার।' সমস্ত দিনটা যেন ছুটিতে পাওয়া। কাজের দিন নয় এ, তাই বসে গাইছি—'হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার, অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার।"[২]

আমার বক্তব্য এই যে, অবসরবিনোদনের জন্য লীলাচ্ছলে, কতক বা পরিহাসচ্ছলে ব্যক্তিবিশেষকে মনের সম্মুখে রাখিয়া অর্ধ-মনস্কভাবে যাহার সূত্রপাত, মনের মধ্যে বেগসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৌলিক তুচ্ছতা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, কবিতাটি নূতনতর অর্থ, গভীরতর বেদনা লাভ করিয়াছে। এমন হওয়া অসম্ভব নয়, বরঞ্চ অনেক সময়ে ইহাই স্বাভাবিক পরিণাম। যেমন পাহাড়ে ঝরনা। ঝরনার সূত্রপাত যেমন তুচ্ছ যেমন আকস্মিক, যেন তাহা পাহাড়ী বালক-বালিকাদের নিতান্তই ব্যক্তিগত খেলনা বিশেষ। কিন্তু প্রবর্ধিতবেগ প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আগের চেহারা

১ এই সুযোগ দানের জন্য 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নামক উপাদেয় গ্রন্থের লেখিকার নিকটে পাঠক মাত্রেই অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ। উক্ত গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশ পড়িয়া লইলে পাঠকগণ উপকৃত হইবেন।

২ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৪৭৬, র-র, ২৪শ খণ্ড।

কি বদলিয়া যায় না? তখন তাহা গভীরতর, প্রশস্ততর, আর তাহাকে ব্যক্তিগত বা খেলনা মাত্র মনে হয় না। এবারে বিবর্তনধারা লক্ষ্য করা যাক—

হে তরুণী তুমিই আমার ছুটিব কর্ণধার ॥১॥

পরবর্তী অবস্থায় পাইতেছি—

হে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধাব

"তরুণী" আর প্রত্যক্ষত নাই, কিন্তু "অদৃশ্যভাবে" রহিয়াছে। "নীলনয়নের মৌনখানি" অদৃশ্য তরুণীর অস্তিত্ব-জ্ঞাপক।

তৃতীয় অবস্থায় শুধুমাত্র—

ছুটির বর্ণধার

এবারে তরুণী ছুটি পাইয়াছে, ঝরনা গভীবতর হইয়া উঠিয়াছে, তরুণীর সঙ্গে তার নীল নয়নও অন্তর্হিত, তাহার স্থলে "নীল আকাশেব মৌনখানি।" কবিতাটির অঙ্গ হইতে ব্যক্তি-বিশেষের চিহ্ন ঝরিয়া গিয়াছে, বিশেষ এবার নির্বিশেষ হইয়া উঠিবার মুখে।

চতুর্থ অবস্থায় কবিতাটি প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছে—

ওগো কর্ণধার
সৃষ্টি তোমার ভাসান খেলায়
লীলার পারাবার ॥১॥

এবারে শুধু 'কর্ণধার'। মৌলিক প্রেরণার যে চিহ্নটুকু তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া এতক্ষণ চলিয়া আসিতেছিল—'ছুটির বর্ণধার'—সেই 'ছুটি' আর এখন নাই। এই 'কর্ণধার' পূর্বোক্ত কর্ণধার নয়—তবু একটুখানি দ্বিধা আছে—সে যে কে কবি জানিলেও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

পঞ্চম অবস্থায় বিগতদ্বিধা স্পষ্টতা—"ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার"—

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার ॥

এ "প্রাণের কর্ণধার" স্বয়ং ভগবান। কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ! ব্যক্তিবিশেষে যাহার সূত্রপাত নির্বিশেষে তাহার উপসংহার, তুচ্ছতায় আরম্ভ মহাদ্যোতনায় শেষ, বিশেষ হইতে বিগতবিশেষে প্রগতি! ঝরনার মহানদীত্বপ্রাপ্তি এবং অবশেষে সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জন। মাত্র বর্তমান ক্ষেত্রে নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণার বিবর্তনের ইহাই সাধারণ নিয়ম। এমন কি তাঁহার অত্যন্ত সাময়িক কবিতাগুলিও দু'চার ছত্র পরেই আপন উপলক্ষকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সে নিয়ম অতিশয় সক্রিয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে এপর্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তত্ত্বসংক্রান্ত। ইহার প্রয়োজন ও মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু ঐখানে থামিয়া থাকা উচিত নয়। এবারে তত্ত্বের স্তর হইতে বস্তুর স্তরে, ভাবের হইতে রসের স্তরে, নামিয়া আসা আবশ্যক। তত্ত্ববিচারের মূল্য যতই হোক রসবিচারের চেয়ে বেশি নয়—আর শেষ পর্যন্ত তত্ত্ববিচারও রসবিচারের আনুষঙ্গিক; কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য রসোপলব্ধিতে সহায়তা। পাঠান্তর-বিচার রসবিচারেরই অঙ্গ। আমার সাধ্যানুসারে তাহার সূত্রপাত করিলাম। এবারে যোগ্যতর ব্যক্তিদের এদিকে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের খণ্ডোপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির আয়তনই সাধারণভাবে উপন্যাসের আদর্শ আয়তন। তাঁহার মতে উপন্যাস ওর বেশি দীর্ঘ হইলে বাধ্য হইয়া বাজে মালে ভর্তি করিতে হয়, আবার ওর চেয়ে কম হইলে কাহিনী হাত পা মেলিবার অবসর না পাইয়া অন্ধকূপে পীড়িত হইতে থাকে। পরবর্তী-কালের ঔপন্যাসিকগণ রবীন্দ্রনাথের এ পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শরৎচন্দ্রেব একাধিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তুলনায় গুরুতর। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সর্বত্র নিজের নির্দেশ মানা সম্ভব হয় নাই। চোখের বালি ও নৌকাডুবি বঙ্কিমী উপন্যাসের ওজনেই প্রস্তুত, কিছু ইতরবিশেষ হইতে পারে, কিন্তু গোরা সত্যই গুরুভাব; বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস গোরার আয়তনে পৌঁছায় নাই। কিন্তু ঐ একখানি ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি অতিকায়িক নয়, সুস্থ ব্যক্তির দোহারা দেহের মতো ওদের গড়ন, ওজন আর একটু বেশি হইলে স্থূল বলা যাইত, ওজন আর একটু কম হইলে লোকে কৃশ বলিত। এইটিই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কবির শেষজীবনের কয়েকখানি উপন্যাসকে এ নিয়মেব মধ্যে ফেলা চলিবে না। আজ সেগুলির সম্বন্ধেই আলোচনা করিবার ইচ্ছা। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য—দুই বোন, মালঞ্চ ও চার অধ্যায়।[১]

১ কৌতূহলজনক হইতে পারে মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির পত্রাঙ্ক উদ্ধার করিয়া দিতেছি, (১) বৌঠাকুরাণীর হাট ৩০৪ + ১ উপসংহার পৃষ্ঠাঙ্ক, (২) রাজর্ষি, পৃঃ ২৪২, (৩) চোখের বালি পৃঃ ৩৩৮, (৪) নৌকাডুবি পৃঃ ৪০২, (৫) গোরা পৃঃ ৫৯৭, (৬) ঘরে বাইরে পৃঃ ২৯৪, (৭) যোগাযোগ পৃঃ ৪৭১, (৮) শেষের কবিতা পৃঃ ২৩২, (৯) দুই বোন পৃঃ ৯২, (১০) মালঞ্চ পৃঃ ১১৩, (১১) চার অধ্যায় পৃঃ আভাস ৶০ + ১৩৮। রবীন্দ্র-গ্রন্থপরিচয়

আমাদের আলোচ্য বই তিনখানা ও স্বতন্ত্র জাতির অন্তর্গত চতুরঙ্গকে বাদ দিলে দেখা যাইবে, শেষের কবিতাই রবীন্দ্রনাথের হ্রস্বতম উপন্যাস, পৃষ্ঠাঙ্ক মাত্র ২৩২; কাজেই ৫৯৭-পৃষ্ঠাসংবলিত গোরাকে ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথীয় উপন্যাসের আয়তন মোটের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রীয় উপন্যাসের আয়তনের কাছাকাছিই আছে।

এখন এটাই যদি রবীন্দ্র-উপন্যাসের আয়তন সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম হয়, তবে শেষের তিনখানায় ইহার ব্যতিক্রম হইতে গেল কেন? আকৃতিতে এগুলি ছোটগল্পের মাপের, কিন্তু ছোটগল্প নিশ্চয়ই নয়; ঢালাই এগুলি উপন্যাসের ছাঁচে, কিন্তু আয়তনে ইহারা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের গৌরব দাবি করিতে পারে না। তবে এগুলি হস্তিক্ষয় না মূষিকবৃদ্ধি? মূষিকবৃদ্ধি নয়, কারণ ছোট-গল্পকে টানিয়া লম্বা করিলে উপন্যাসে পরিণত হয় না। তবে হস্তিক্ষয় হইলে হইতে পারে। অন্য নামের অভাবে এগুলিকে খণ্ডোপন্যাস বলা যাইতে পারে। অনতিদীর্ঘ কবিতাকে যেমন খণ্ডকাব্য বা খণ্ডকবিতা বলা হয়, অনতিদীর্ঘ উপন্যাস তেমনি খণ্ডোপন্যাস। সকলে হয়তো নামটিকে স্বীকার করিবেন না, কিন্তু প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্যের জন্য নামটির প্রয়োজন হইল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, হঠাৎ প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে গেল কেন? যিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট আয়তনকে একরূপ মানিয়া চলিয়াছেন, তিনি হঠাৎ শেষ বয়সে ওজনে লঘু উপন্যাস লিখিতে গেলেন কেন? অর্থাৎ পূর্ণাবয়ব

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ॥ চতুরঙ্গের পৃঃ সংখ্যা ১২৩; কিন্তু এই তালিকায় তাহার উল্লেখ না করিবার কারণ ও-বইখানা পুরা উপন্যাসও নয়, আবার রীতিমতো ছোটগল্পও নয়; উপন্যাস ও ছোটগল্পের গাঁটছড়া বাঁধিয়া ওখানা রচিত, উহাকে বর্তমান হিসাবের মধ্যে ধরিলে চলিবে না।

উপন্যাসসমূহের রচয়িতা হঠাৎ খণ্ডোপন্যাস লিখিয়া বসিলেন কেন? কেবলি কি খেয়াল না আর কিছু কারণ আছে? আর কিছু কারণ আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

দুই বোন, মালঞ্চ ও চার অধ্যায় পড়িলে এই ধারণাই হয় যে, গল্প বিবৃতির প্রতি, চরিত্র সৃষ্টির প্রতি লেখকের মনোযোগ একেবারেই শিথিল, ন্যূনতম যে প্রয়োজনটুকু পূরণ না করিলেই নয়, মাত্র তাহাই পূরণ করিয়া লেখক দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছেন; সে প্রয়োজনও আবার গল্পের প্রয়োজন নয়, লেখকের নিজের প্রয়োজন। মোটের উপর এই ধারণা হয় যে, লেখক গল্প বলিতে বসেন নাই, গল্পকে শিখণ্ডী-রূপে দাঁড় করাইয়া অন্য উদ্দেশ্য সাধনে তিনি উদ্যত।

পাঠকের এ ধারণা মিথ্যা নয়, কারণ উপন্যাসগুলিতে গল্প বলা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য নয়, এখানে তিনি শিল্পী নন, মনীষী; তিনি সৃষ্টি করিতে বসেন নাই, প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, কল্পনার বদলে যুক্তি এখানে তাঁহার অধিকতর সহায়। অবশ্য একটা গল্প লইয়াই তাঁহাকে শুরু করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা আত্মজ পুত্রের বাৎসল্য কখনোই পায় নাই, বড়জোর দত্তক পুত্রের শিষ্টাচার মাত্র পাইয়াছে, কাহিনীর সঙ্গতিসাধন করিয়া দিবার জন্যই তাহার প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রে গল্পটা অযত্নলালিত, তাহার শোভাসৌষ্ঠব ও আয়তন বাড়িবে কিরূপে? বরঞ্চ তত্ত্ব ও মনীষার চাপে, আগাছার চাপে ফুলগাছের মতো, গল্পটা অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। গল্পকে আপন নিয়মে চলিতে দিতে হয়, নরনারীকে আপন স্বভাবে বাড়িতে দিতে হয়, কিন্তু যেখানে তাহারা গোড়াতেই অপর প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে

সৃষ্ট সেখানে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি অবশ্যই ব্যাহত হইবে। এই উপন্যাসগুলিতে গল্প ও নরনারী তত্ত্বের বাহন, বাহনের মর্যাদা কখনোই বাহিতের মতো হয় না, তা ছাড়া বাহিতের প্রয়োজনেই তাহাব চলিতে হয়—গল্পের প্রতি, গল্পের নরনারীর প্রতি ইহার চেয়ে উপেক্ষা ও অসম্মান আর কি হইতে পারে? আগে যে হস্তিক্ষয়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই জন্যই; লেখকের মনোযোগের অভাবেই, কল্পনার ঐশ্বর্যের অভাবে নয়, ধনীর হস্তীর এই বালখিল্য দশা।

দুই বোন, মালঞ্চ ও চার অধ্যায় তিনখানিই প্রমাণমূলক উপন্যাস, বিশেষ তত্ত্বকে প্রমাণ করা ইহাদের কাজ। দুই বোন ও মালঞ্চের প্রতিপাদ্য একটি তত্ত্ব চার অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য স্বতন্ত্র আর একটি তত্ত্ব।

দুই বোন ও মালঞ্চের প্রতিপাদ্য দুই বোন গ্রন্থের প্রারম্ভে সূত্রাকাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"মেয়েরা দুই জাতের, কোন কোন পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান কবেন, ফলদান কবেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভবিয়ে দেন অভাব। আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীরতার রহস্য, মধুরতার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, যে-ঝঙ্কারে বেজে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।" [১]

এই হইল সূত্র, বাকি বইখানা ইহারই টীকা ও ভাষ্য।

১ দুই বোন, পৃঃ ৪১৩, র-র ১১শ খণ্ড

শর্মিলা মা জাতের মেয়ে, উর্মিমালা প্রিয়া জাতের মেয়ে, আর মা ও প্রিয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পুরুষ শশাঙ্কের চিত্তে।

মালঞ্চও ইহারই অনুবৃত্তি। নীরজা মা জাতের মেয়ে, সরলা প্রিয়া জাতের মেয়ে—আর দুজনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পুরুষ আদিত্যনাথের চিত্তে। দুই গ্রন্থে কিছু কিছু স্থানিক স্বাতন্ত্র্য আছে—কিন্তু দু'য়ের চেহারাটা এক।

চার অধ্যায়ের সূত্র বা প্রতিপাদ্য 'আভাস' অংশে লিপিবদ্ধ। সমস্ত 'আভাস'টাকেই সূত্র বলিতে পারি। কিন্তু বীজাকারে তাহা নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে রহিয়াছে।

"সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে একলা বসে ছিলাম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজালে জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না। এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা। উপন্যাসের আরম্ভে এই কথাটি উল্লেখযোগ্য।" [১]

উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, সন্ন্যাসীর সেই দৃষ্টি ও মর্মান্তিক বাক্য বহু বৎসর কবির হৃদয়ে গুপ্ত থাকিয়া চার অধ্যায় আকারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্মবান্ধবের শেষ সাক্ষাৎকার না ঘটিলে চার অধ্যায় লিখিত হইত কিনা সন্দেহ। 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে' এই সত্যটি চার অধ্যায়ে নানা আকারে মূর্তি-লাভ করিয়াছে, অতীন্দ্র আকারে, ইন্দ্রনাথ আকারে, গুপ্তষড়যন্ত্র-বাদের আকারে। এ বিষয়ে চার অধ্যায় প্রকাশকালে মতভেদ

১ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৫৪২—৫৪৩, র-র, ১৩শ খণ্ড

ঘটিয়াছিল, এখনো যে মতের মিল হইবে এমন সম্ভাবনা নাই, সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা—ঐ সূত্রটার ব্যাখ্যা চার অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলিয়াছেন যে, চার অধ্যায় মতামতের সমষ্টি নয়, গল্প। কিন্তু একথা আংশিক স্বীকার্য। চার অধ্যায় একটি বিশিষ্ট মতের অভিব্যক্তি, গল্পটি তাহার বাহন, কিংবা গল্পটি উপন্যাসে বিবৃত মতামতের উদাহরণ মাত্র।

এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনার আংশিক প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ আগেও করিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্থল নৌকাডুবি। রচনাবলী সংস্করণে নৌকাডুবির ভূমিকা পড়িলেই আমার উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু নৌকাডুবি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, খণ্ডোপন্যাস নয়, প্রমাণমূলক উপন্যাস তো নয়ই, তাহার কারণ, তত্ত্বের একটা তাগিদ কবির মনে থাকিলেও গল্পের ধারাটাই প্রবলতর, আর সেই প্রবলতার বেগে উপন্যাস আপন স্বাভাবিক আয়তন লাভ করিয়াছে, তত্ত্বের খাতিরে তাহাকে আত্মসঙ্কোচন করিতে হয় নাই।[১]

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থ খণ্ডোপন্যাস-পর্যায়ভুক্ত। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ—রচনার আংশিকতাধর্ম, গল্প-গ্রন্থনে প্রত্যাশিতঘটনালঙ্ঘনপ্রয়াস, চরিত্র-চিত্রণে ন্যূনতম রেখাপ্রয়োগ, অপরিহার্যতম ভারকেও পরিত্যাগের চেষ্টা, এবং ভাষার নির্গুণরূপ। আবার এইসব লক্ষণের মূলে হইতেছে তত্ত্বকে প্রাধান্যদান এবং গল্পের গৌণীকরণ। গল্প এখানে তত্ত্বের বাহন বলিয়া স্বেচ্ছায় চলিতে পারে নাই, তত্ত্বের প্রয়োজন মতো চলিতে বাধ্য হওয়ায় আপন ধর্ম ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য গল্পকথন নয়, তত্ত্বপ্রতিপাদন। এগুলি যেন পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়, উপন্যাসের খসড়া মাত্র—সংক্ষেপে খণ্ডোপন্যাস।

---

১ তত্ত্বোপন্যাস বা প্রমাণমূলক উপন্যাস হইয়াও যে গল্পের আকর্ষণ, আপন আয়তন ও নর-নারীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য বজায় রাখা যায়, তাহার উদাহরণ আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম।

৩

রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে সমস্ত রসসাহিত্যকে, বিশেষভাবে এ তিনখানি গ্রন্থকে, রসের দিক হইতেই বিচার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু রস-সাহিত্যে যেখানে তত্ত্বের মূর্তি সুপ্রকট সেখানে তত্ত্বের বিচার অনিবার্য হইয়া পড়ে, আর এ তিনখানি উপন্যাসে তত্ত্বরূপ মুখ্য বলিয়া স্বভাবতই তাহার বিচারও মুখ্য স্থান অধিকার করিবে। সমালোচকের কর্তব্য রচনার ধর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট।

দুই বোন ও মালঞ্চকে একত্র বিচার করা যাইতে পারে, কেননা, আগেই বলিয়াছি, ইহাদের একটি যেন আর একটির অনুবৃত্তি। চার অধ্যায়ের বিচার স্বতন্ত্র করিতে হইবে।

শর্মিলা মা জাতের মেয়ে, উর্মিমালা প্রিয়া জাতের মেয়ে; শশাঙ্কের পুরুষচিত্তের উপর ইহাদের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসই দুই বোন উপন্যাস। এ গ্রন্থখানির নাম যদি হয় দুই বোন, মালঞ্চের নাম ভাইবোন দেওয়া যাইতে পারে, কারণ আদিত্যনাথ ও সরলা দূরসম্পর্কিত ভাইবোন। শর্মিলা ও উর্মিমালা সহোদরা হওয়ায় যে ট্র্যাজেডি তীব্রতার চরমে পৌঁছাইতে পারে নাই, নীরজা ও সরলা সম্পূর্ণ অসম্পর্কিত হওয়াতেই তাহা যেন দুঃখের শিখরে উপনীত হইয়াছে। শর্মিলা ও উর্মিমালার সোদরত্ব দুঃখের চরম অভিব্যক্তির পক্ষে বাধা মনে করিয়াই কি রবীন্দ্রনাথ নীরজা ও সরলাকে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন, যাহাতে দুঃখের অভিব্যক্তি সেখানে কোন বাধা না পায়? যে কারণেই হোক্, 'দুই বোনে'র অসমাপ্ত ট্র্যাজেডি 'মালঞ্চে' চরমে পৌঁছিয়াছে।

শর্মিলার মন গোড়া হইতেই মা জাতের মেয়ের মতো, শশাঙ্কের প্রতি তাহার ব্যবহারও প্রধানত মাতৃধর্মী। ইহাতে শশাঙ্কের সাংসারিক মন বেশ স্বস্তিতে ছিল, কিন্তু কোথায় কোন্ গভীরে

সুখকর অশান্তির জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা তাহার রহিয়া গিয়াছিল। এই সুখকর অশান্তি প্রিয়া-জাতীয় মেয়েতেই দিতে পারে। শর্মিলা অসুস্থ হইয়া পড়াতে ঊর্মিমালা যখন তাহাদের সংসারের মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন সে শশাঙ্কের চিত্তের সুপ্ত সুখকর অশান্তির কামনাকে যেন উস্কাইয়া দিল। এতদিন পরে শশাঙ্কের স্বস্তি গেল, তাহার স্থলে দেখা দিল প্রেমের সুখজ্বালাময় অশান্তির দোলা। এ অবস্থায় শর্মিলার কর্তব্য কি? মা জাতের মেয়ে রুগ্‌ণা শর্মিলা শশাঙ্ককে যে পরামর্শ দিল রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী' নামে ছোটগল্পের নায়িকা হরসুন্দরী স্বামী নিবারণকেও সেই পরামর্শ দিয়াছিল। নিবারণ শৈলবালাকে বিবাহ করিয়াছিল, পত্নীর পরামর্শে শশাঙ্কও ঊর্মিমালাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইল। এমন সময়ে ঊর্মিমালার আধুনিকী বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া শর্মিলা, শশাঙ্ক ও পাঠককে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা হইতে বাঁচাইয়া দিল। আসন্ন বিবাহের সঙ্কল্প ছিন্ন করিয়া ঊর্মিমালা বিলাত যাত্রা করিল।

দুই বোন গল্পের যেখানে শেষ, মালঞ্চ গল্পের প্রায় সেখানে সূত্রপাত। গুরুতর রোগগ্রস্তা নীরজার অনুপস্থিতির স্বাভাবিক সুযোগে, মালঞ্চের মধুময় নিবিড় আকর্ষণে আদিত্য ও সরলা ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল। শয্যাসীনা নীরজা সবই বুঝিত, কিন্তু করিবার কিছুই নাই, কেবল দুঃখে পুড়িয়া মরা ছাড়া। সকলেই জানিত নীরজার রোগ চিকিৎসার অসাধ্য, আদিত্য ও সরলা ততদিন সবুর করিবে স্থির করিল। তবু একত্র আর থাকা চলে না; কিন্তু সরলার পক্ষে বিলাত যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই সে জেলে গেল। জেলে গিয়াও সমস্যা-সমাধান হইল না, কারণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার আগেই সরলা ছুটি পাইল। ইংরেজের জেলও যাহার প্রতি অকরুণ, তাহার একমাত্র সান্ত্বনা মৃত্যু। সরলার জেল হইয়াছে জানিতে পারিয়া, কিছুদিনের জন্যও যে সে দূরে থাকিবে ভাবিয়া নীরজা সুখী হইয়াছিল। সরলার অপ্রত্যাশিত

আগমনে তাহার সেই শেষ ঐহিক সান্ত্বনা দূর হইল, সরলা ও মৃত্যু এক মুহূর্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীর অধিকার কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না—এই শেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে করিতে নীরজা অব্যক্তে প্রস্থান করিল। দুই বোন গল্পের সুখ-সমাপ্তি এখানে নাই, দুই বোনে লেখক সন্তর্পণে 'নটে গাছটি মুড়াইয়া' গল্প ও তত্ত্বকে যুগপৎ রক্ষা করিয়াছেন; এখানে 'নটে গাছ' ঝড়ে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, লেখকের সযত্ন করবিন্যাসের অপেক্ষা রাখে নাই; গল্পটি শেষ মুহূর্তে কবির পরিকল্পিত তত্ত্বের প্যাটার্ন ছিন্ন করিয়া প্রত্যাশিত মানবিক ট্র্যাজেডিতে পরিণত হইয়াছে; তাত্ত্বিক যেন আপন অনভিপ্রায়ে শিল্পীর নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছে; যাহা একটি সুষ্ঠুতত্ত্ব প্যাটার্ন হইতে পারিত তাহা দুঃসহহৃদয়তাপোৎসারিত শিল্পমূর্তি লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে মালঞ্চই অবিসংবাদী-রূপে শ্রেষ্ঠ।

দুই বোন ও মালঞ্চ একই তত্ত্বের প্যাটার্নভুক্ত হইলেও, চরিত্র-পরিকল্পনায় একই তত্ত্বের ইঙ্গিত অনুসরণ করিলেও, দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। শশাঙ্ক ও আদিত্য একই ধাতুতে, একই ছাঁচে গড়া, দু'জনেই উদাস পুরুষ, দু'জনেই মা-জাতীয় রমণীর স্বামী, আর দু'জনের মনেই প্রিয়া-জাতীয় রমণীর স্পর্শের কাতরতা, প্রথম সুযোগেই তাহারা সেই অভাব পূরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বস্তুত তাহাদের চরিত্র সমান ছাঁচে ঢালাই করা। ব্যবসায়ে একজন ইঞ্জিনীয়ার, আর একজন ফুলওয়ারী, দু'য়ে যেটুকু তফাত সে ঐ ভিন্ন ব্যবসায়ের সূত্রে আসিয়াছে; সে প্রভেদ নিতান্তই গৌণ, মৌলিক নয়।

শর্মিলা আর নীরজা মা জাতের মেয়ে, যেমন উর্মিমালা ও সরলা প্রিয়া জাতের; তবু ওদের মধ্যে প্রভেদ আছে। শর্মিলার আগাগোড়াই মা জাতের, প্রকট বা প্রচ্ছন্ন প্রিয়া-জাতের কোন

লক্ষণই তাহার চরিত্রে লেখক দেখান নাই। নীরজার কিন্তু এমন অবস্থা নয়। শয্যাগ্রহণের পূর্বে সে প্রিয়া-জাতীয় ছিল, প্রিয়ার স্পর্শে আদিত্যের মালঞ্চ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু নীরজার সে সৌভাগ্য দীর্ঘকাল থাকিল না; দীর্ঘ দুরারোগ্য রোগে তাহার প্রিয়া-সত্তায় ভাঁটা পড়িল, গুপ্ত মাতৃসত্তা জাগিয়া উঠিল; রুগ্‌ণা পত্নী স্বামীর প্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা আর মিটাইতে পারিল না। শয্যাশ্রয়ী সতর্কতার দ্বারা কোনক্রমে স্বামীর মাতৃরসের অতৃপ্তি পূরণ করিতে চেষ্টা করিল; পুরুষের চিত্তে প্রিয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে মাতৃরসের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই দুর্বল।

উর্মিমালা প্রিয়া-জাতীয় রমণীর আদর্শ, পুরুষের চিত্তকে সে যেমন নাড়া দিতে সক্ষম, স্বামীর চিত্তকে তেমন স্বস্তি দিতে পারিবে কি না সন্দেহ। তাহার তুলনায় সরলার রঙ ও রস অনেক কোমল, অনেক মধুর। তবু সে প্রিয়া-জাতীয় ছাড়া আর কিছু নয়। তবে উর্মিমালার মতো সাংসারিক সুখ সৌভাগ্য স্বাচ্ছন্দ্যের শিখরে শিখরে সে লালিত নয় বলিয়া তাহার গতিতে দ্বিধা আছে, মনে উৎকণ্ঠা আছে, হাবেভাবে ভীরুতা আছে; আর এই সব দ্বিধা, উৎকণ্ঠা, ভীরুতাই আদিত্যের চোখে তাহাকে মধুরতর, অধিকতর রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। উভয় কাহিনীতেই পুরুষচিত্তের অধিকার লইয়া প্রিয়া-জাতীয় মাতৃ-জাতীয় রমণীর দ্বন্দ্ব; জয়পরাজয় নানা অবান্তর ঘটনার উপরে নির্ভর করে, সেটা মুখ্য নহে, মুখ্য ঐ বিচিত্র দ্বন্দ্বটা।

এই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রসাহিত্যে নূতন নয়, এবং রূপান্তরে ইহা তাঁহার মূল ভাবধারার অন্তর্গত। এবারে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

একই রমণীতে প্রিয়া ও জায়াকে পাওয়া যায় কি না, জায়া ও পুত্রের-জননীকে লাভ করা সম্ভব কি না, প্রেম ও বিবাহের স্বরূপ ও স্বাদ রক্ষা করিয়া, সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সংসারে চলা সম্ভব কি না—এ বিষয়ে মানুষ চিরকাল চিন্তা করিয়া আসিতেছে।

শেক্সপীয়র এক রকম উত্তর দিয়াছেন, দান্তে ও আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিগণ আর এক রকম উত্তর দিয়াছেন, আবার কালিদাস শকুন্তলা কাব্যে তাঁহার উত্তর লিখিয়াছেন। কালিদাসের অভিজ্ঞতা এই যে, প্রিয়াই জায়াতে পরিণত হয়, জায়াই কালক্রমে পুত্রের জননীতে চরিতার্থতা লাভ করে। এ বিষয়ে অধিক ব্যাখ্যার স্থান নাই, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে কালিদাসীয় প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বকে "জায়া-জননী-বাদ" বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জায়া-জননী-বাদেব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রেমতত্ত্বের মূলে আছে জায়া-জননীবাদ। তাঁহার প্রেমতত্ত্বের নাম "প্রণয়িনী-গৃহিণীবাদ" বলা চলিতে পারে। চিত্রাঙ্গদা কাব্য প্রণয়িনী-গৃহিণী-বাদেব উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রণয়িনী চিত্রাঙ্গদাই কালক্রমে গৃহিণী চিত্রাঙ্গদায় পরিণত হইল, জাযার জননীত্বে উপস্থিতিতে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সমাপ্তি। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা কাব্যের পৌরাণিক পরিবেশে যে সিদ্ধান্তকে কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাস্তব সংসারের পরিবেশে তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমার 'শেষের কবিতা' প্রবন্ধে তাহার বিশদ আলোচনা আছে—এখানে উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট। সংসারে প্রিয়া ও গৃহিণীকে সাধারণ নিয়ম হিসাবে একত্র পাওয়া যায় না ইহাই অমিতের ধারণা—ইহাকে কবির ধারণা বলিয়াও গ্রহণ করিতে হইবে। শেষের কবিতায় যাহা তত্ত্বত স্বীকৃত, দুই বোন ও মালঞ্চে তাহা কার্যত গৃহীত হইয়া সূত্রাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রিয়া বসন্ত ঋতু, মাতা বর্ষা ঋতু; দুই-ই মানবজীবনের এক ও অখণ্ড অভিজ্ঞতাচক্রের অঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন, দুই এক নহে। কাজেই প্রণয়িনী ও গৃহিণী এক রমণীতে পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা, বিধাতা দুটিকে স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়াছেন, দুয়ের স্বাদ ও সত্তা ভিন্ন, ইহাই যেন কবি বলিতে চান। প্রেম ও বিবাহ, দু'য়ের স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংসারে পাওয়া

সম্ভব নয়, ইহাই যেন কবির অভিপ্রায়। তাই যদি হয়, তবে রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। "সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা"—ইহাই রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলতত্ত্ব। প্রেম অসীম, কারণ প্রেম একটা মানসিক ভাব মাত্র, বিবাহ সীমাবদ্ধ, কারণ বিবাহ একটা সামাজিক সংস্কার মাত্র—দু'য়ে সম্পূর্ণ মিলন সম্ভব নয়। তবে কি কবি, দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার অন্তে ইহাই স্বীকার করিতে উদ্যত যে, সীমা ও অসীমের মিলন জীবনের সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়? সীমা ও অসীমের মিলন জীবনের যত ক্ষেত্র সম্বন্ধে সত্য হইবে তত তাহার গুরুত্ব; আংশিক মাত্র সত্য হইলে পূর্ণ জীবনতত্ত্ব হিসাবে তাহার গুরুত্ব হ্রাস পায়; প্রেম ও বিবাহ লইয়াই মানবজীবনের প্রধান অংশ গঠিত, সেখানে সীমা ও অসীম তত্ত্ব যদি প্রযোজ্য না হয়, তবে সেই পরিমাণে তাহার মূল্য কমিয়া আসে। কমিয়া আসুক আর না-ই আসুক, উহাই রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলতত্ত্ব। সীমা ও অসীম বারংবার পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে,—কিন্তু তাহারা পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলোপ করিয়া সম্পূর্ণ মিলিত হইতে পরিতেছে না—রবীন্দ্র-সাহিত্যে ইহাই লক্ষিত হইবে। এই অসম্পূর্ণ মিলন-প্রয়াসেই এই তত্ত্বের যথার্থ মূল্য, সম্পূর্ণ মিলনসাধনে নয়। কি জীবনে, কি সাহিত্যে ইহা তত্ত্বত স্বীকৃত হইয়াও কার্যত সার্থক হইয়া ওঠে নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বরঞ্চ শেষের দিকে দেখি আজন্ম-লালিত এই তত্ত্বের মধ্যেও যেন দ্বিধার সঞ্চার হইয়াছে।[১]

১ শেষের কবিতা, বাঁশরী, দুই বোন, মালঞ্চ প্রভৃতি রচনায় এই দ্বিধার ভাবটি খুব স্পষ্ট, যতই শেষের দিকে আসিয়াছে দ্বিধা ততই প্রবল। বাঁশরীতে প্রেম ও বিরহের পার্থক্যের উপরে খুব বেশি ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে; দুই যে মিলিত হইতে পারে না, মিলিত হইলে জীবনব্রত নষ্ট হইয়া যায় ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে একথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। দুই বোনের প্রকাশ ১৯৩৩ সাল আর বাঁশরী ও মালঞ্চ প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৩৪ সালে, একই বাংলা বৎসরের অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন সম্বন্ধে যাঁহারা নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, নিজের জীবনদর্শন সম্বন্ধে সমালোচকদের মতো কবি এত বেশি নিশ্চিত ছিলেন না। এই রচনাগুলি তাহার প্রমাণ।

দুই বোন, মালঞ্চ প্রভৃতি রচনা রবীন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রতত্ত্ব-বিচারপ্রসঙ্গে ইহারা একান্ত অপরিহার্য।

৪

চার অধ্যায় প্রকাশিত হইবামাত্র পাঠকসমাজে হুলস্থুল পড়িয়া যায়, অপাঠক-সমাজও তাহাতে যোগ দিয়াছিল। সকলেরই মত এই যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের 'অগ্নিযুগ, সম্বন্ধে অবিচার করিয়াছেন, আর 'আভাসে' ব্রহ্মবান্ধবের উক্তি প্রকাশ করিয়া সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। এই প্রতিবাদ এমনই প্রবল হইয়াছিল যে, পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থের 'আভাস' অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পাঠকসমাজ 'আভাস' অংশ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কাহিনী-অংশের প্রতি মনোযোগ দিবার সময় তাহাদের ছিল না, রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ত' প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও যে কাহারো দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে তাহা মনে হয় না।[১]

চার অধ্যায়ে প্রকাশিত কবির মন্তব্যটা কী আগে দেখা যাক্, পরে গল্পাংশের বিচার করিলেই চলিবে। চার অধ্যায়ের তত্ত্ব সূত্রাকারে 'আভাসে' লিপিবদ্ধ, আগেই একথা বলিয়াছি। ব্রহ্ম-বান্ধবের উক্তিতে তাহা সংক্ষেপে সূত্রাকারে বর্তমান—"রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।"

অতীন্দ্র নিজের কার্যকলাপ এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া বারংবার উহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছে। "কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমায়।......ইতিমধ্যে ভয় করো আমাকে, আমি নিজে ভয় করি আমার মৃত আত্মার কালো ভূতটাকে।"

১ অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চার অধ্যায় সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অবিবেচনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না।

ইহা এলাকে হত্যা করিবার ভূমিকা। এলাকে সে কেন খুন কবিল? বটুব হাত হইতে বাঁচাইবাব জন্য, না দলেব অস্তিত্বকে বক্ষার জন্য? যে কাবণেই হোক অতীন্দ্রেব চক্ষে ইহা পতনের লক্ষণ এবং খুব সম্ভব তাহার মত ভ্রান্ত নয়।

ইন্দ্রনাথকে অসাধারণ কবিয়া আঁকিবার চেষ্টা হইযাছে, কিন্তু তাহার চরিত্রও পতনের ঊর্ধ্বে নয়, বরঞ্চ অতীন্দ্রের চেয়ে পতনের কলঙ্ক তাহাব বেশি বই কম নয। অতীন্দ্রেব মনে অনুশোচনা আছে, ইন্দ্রনাথে তাহা দেখি না। কানাই গুপ্ত তাহার স্বাভাবিক সরসতা সত্ত্বেও পতিত, নিজেই সে প্রকাবান্তরে অনেকবাব স্বীকাব করিয়াছে —আব বটু কোথায নামিয়া পডিয়াছে সকলেই জানে। ফল কথা, পথটাই নিম্নমুখী এবং পিচ্ছিল। সেই পথে কেহ দ্রুত, কেহ ধীরে, কেহ অগোচরে, কেহ সগোচরে নীচেব দিকে নামিয়া চলিয়াছে; ইহা ব্যক্তিবিশেষেব স্বভাব তেমন নয়, যেমন পথের ধর্ম, মানুষের মানসিক জগতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিরন্তব সক্রিয়।

বাংলা দেশেব তথাকথিত 'অগ্নিযুগ' সম্বন্ধে নিবপেক্ষ মত প্রকাশেব সময এখনও আসে নাই, কিন্তু একদিন সে মত প্রকাশ করিতেই হইবে। হত্যায় মানুষকে হীন করিয়া ফেলে, গুপ্ত হত্যায় হীনতব করে; ধর্মেব নামে, কর্তব্যের নামে যখন সেই গুপ্তহত্যা চলে তখন পরিত্রাণেব পথটাই বন্ধ হইযা যায়। যে সমাজে এইরূপ গুপ্তহত্যাব প্রশ্রয় থাকে, ব্যাপকভাবে সে সমাজের উপর তাহাব প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী, আশু ফললাভের আশাতে এইরূপ কাণ্ড চলিলে আশু ফল ক্রমেই অধিকতর প্রাংশুলভ্য হইয়া পড়ে। মানুষের স্বভাব মূলত এরূপ গুপ্তহত্যাব অনুকূল নয়, কিন্তু সে যখন ঐরূপ কাজে নামে, জোর করিয়া নিজেব স্বভাবকে বিকৃত কবিতে হয়, এইরূপ বিকাব সমাজের বহুলোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে তাহাব প্রতিক্রিয়া সমাজের উপরে কখনোই শুভ হয় না। এমন কি, হত্যা যেখানে গুপ্ত নয়, সেখানেও মানুষের মন প্রতিকূল

হইয়া দাঁড়ায়। একথা মহাভারতকার জানিতেন, সেইজন্য ভারত-যুদ্ধের প্রারম্ভে, শিল্পত অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁহাকে একখানা আস্ত গীতা প্রক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতযুদ্ধজয়ী পাণ্ডবদের মন অনুশোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না, প্রমাণ অশ্বমেধযজ্ঞ ও বহু দুঃখে বিজিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থানের পথে অনন্ত প্রয়াণ।[১]

কাজেই রবীন্দ্রনাথ চার অধ্যায়ের যে শোচনীয়তা দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি ভারতীয় চিন্তাধারার মূল পথটার উপরেই দণ্ডায়মান; তাঁহার পূর্বস্থরি স্বয়ং মহাভারতকাব আর লৌকিক ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র। অথচ এ পর্যন্ত মহাভারতকার ও বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ দোষী বা দায়ী করে নাই। আর বাংলা দেশের তথাকথিত 'অগ্নিযুগ' গীতা, আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'অগ্নিযুগে'র হোতাগণ গীতা ও বঙ্কিমী উপন্যাসদ্বয়ের Ideal ও Romanticism-এ এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষাকে এবং ফলশ্রুতিকে গ্রহণ করেন নাই, কিংবা সেদিকে তেমন করিয়া মনোযোগও দেন নাই। তবে যে তাঁহারা বা 'অগ্নিযুগে'র সমর্থকগণ চার অধ্যায়ের প্রতি এমন বিরূপ হইলেন তাহার কারণ, শেষ পর্যন্ত নিজেদের মনের মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যর্থতা তাঁহারা বহন করিতেছিলেন, সেই faustration বা ব্যর্থতা এখন তাঁহারা চার অধ্যায়ের লেখকের উপরে চাপাইয়া দিয়া নিজেরা নিষ্কৃতি লাভের শেষ চেষ্টা যেন করিয়াছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে প্রতিকূল মত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে

---

১ বঙ্কিমচন্দ্র গীতার নিষ্কামকর্মের শিক্ষাকে আরোপ করিয়া উপন্যাসত্রয় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও শেষ পযন্ত অনুশোচনাটাই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। আনন্দমঠ ভাঙিয়া পড়িয়াছে—বাহিরের আঘাতে নয়, অন্তরের অনুশোচনায়। নিষ্কাম ধর্মের দীক্ষাদাতা ভবানী পাঠক ধরা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিযাছে। সীতারামের পরিণাম ভয়াবহ। এইসব উদাহরণের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র যেন ইহাই বলিতে চান যে, লৌকিক ক্ষেত্রে নিষ্কাম হত্যার ফলাফল শুভসূচী হয় না।

সঙ্কিত প্রতিকূল মতেরই প্রক্ষেপমাত্র—বিশেষ, যখন দেখি যে, চার অধ্যায়ের পূর্বসূত্র ঘরে বাইরে, তাহারও পূর্ব সূত্র আবার গোরা। এই তিনখানিতে মিলিয়াই দেশহিতব্রত-সাধন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতের পূর্ণ অভিব্যক্তি। চার অধ্যায়ের তত্ত্ব বীজাকারে গোরাতে, অঙ্কুরাকারে ঘরে বাইরেতে বর্তমান, গুপ্ত পন্থার সমর্থন কোথাও পাওয়া যাইবে না। আর মহাভারতের, আনন্দমঠের, দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থের পরিণাম যদি শোচনীয় হয়, 'অগ্নিযুগে'র অবসানে বাংলা দেশের অবস্থা যে অন্যরূপ হইবে এরূপ আশা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

৫

চার অধ্যায়ের কাহিনী-অংশের প্রতি সাধারণের তেমন মনোযোগ পড়ে নাই—ইহা আগে একবার বলিয়াছি। কাহিনীটি পড়িলে এই ধারণাই হয় যে, রবীন্দ্রনাথ এখানে অপরিচিতক্ষেত্রে, নিজ অভিজ্ঞতার বাহিরে পা ফেলিয়াছেন।[১]

কাহিনীর মূল পরিবেশ, গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপের পদ্ধতি ও সেই জীবনের আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জনশ্রুতিমাত্র। জনশ্রুতির উপরে ভরসা রাখিয়া চলিতে গেলে যাহা হয় তাহাই হইয়াছে। পরিচয়ের অভাবকে পূরণ করিবার আশায় তাঁহাকে 'মেলোড্রামা' এবং অতিশয়োক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছে। অতীন্দ্র-কর্তৃক এলাকে হত্যার ঘটনা নিতান্ত অবাস্তব বলিয়া বোধ হয়, এই অবাস্তবতার বাহ্যরূপ মেলোড্রামা। আর শুধু ঐখানে মাত্র নয়, কানাই গুপ্তর চায়ের দোকানের দৃশ্যটিও মেলোড্রামার রকমফের। এসব স্থান ও ঘটনা রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত নয়, কাজেই পরিচয়ের অভাবকে ঢাকিবার উদ্দেশ্যে গলা চড়াইয়া

১ তুলনীয় শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর কাহিনী। শরৎচন্দ্রও এখানে পরিচয় ও অভিজ্ঞতার বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন।

অতিশয়োক্তি করিতে হইয়াছে। উদাহরণ, চায়ের দোকানের বর্ণনা এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে বর্ণিত অতীন্দ্রের গুপ্ত বাসভবনের বিবরণ। দুটি চিত্রই সত্য, কিন্তু রঙের বাড়াবাড়িতে সত্যের যাথার্থ্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়। বাস্তব নিজেকে প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে এত বেশি সাজগোজ করিয়া হাজির হয় না। বাস্তবের মাত্রা সম্বন্ধে যাহার মনে অনিশ্চয়তা আছে তাহাকে চারিদিক ঘাঁটিয়া প্রমাণপত্র আনিয়া উপস্থিত করিতে হয়। যুক্তি যেখানে দুর্বল, গলার স্বর সেখানে স্বভাবতই প্রবল হইয়া ওঠে।[১] এত বেশি সাজাইয়া বর্ণনা না করিলে এসব দৃশ্যে পাঠকের বিশ্বাস আরও বেশি জমিয়া উঠিত। দুটি দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা সত্য সমস্ত কাহিনীটি সম্বন্ধেও তাহা অল্পবিস্তর সত্য।

অতীন্দ্রের অবস্থায় অতীন্দ্রের মতো ব্যক্তি পড়িলে খুব সম্ভব ঐভাবেই কাজ করিত, কিন্তু তাহার বাস্তব প্রকাশ ঐরূপ হইত কিনা সন্দেহ। এলা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের আধেয়ে ভেজাল নাই, যত গোল করিয়াছে আধারটাতে। রবীন্দ্রনাথের মতে—

নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপরে নির্ভর করে তা নয়, চারদিকের ঘাত-প্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝর-প্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ, আর একদিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেই সঙ্গেই দেখাতে

১ রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' নামে প্রসিদ্ধ কবিতাটির প্রারম্ভেও এইরূপ বাস্তবের অতিশয় রূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

হয়েছে যে অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হ'ল তারও বিবরণ। [১]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ মূলত ঠিক। আধার ও আধেয়ের যথার্থ সমাবেশেই সত্য রূপগ্রহণ করে। কিন্তু যেখানে এ দুয়ের সুষ্ঠু সমাবেশ না হয় সেখানে সত্যের রূপ কি বিকৃত হয় না? নারিকেলের মালার যোগ্য আধেয় নারিকেলের জল, উত্তম পানীয়, কিন্তু তাহাতে অমৃত রক্ষা করিলে সত্যোপলব্ধি ঘটিবে কি? সত্যের নির্গুণ মূর্তি বলিয়া কিছু নাই, আধারের প্রসঙ্গেই তাহা সত্য। এখানে যে আধার রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করিয়াছেন তাহা জনশ্রুতির হাত হইতে সংগৃহীত, তাহার আব্ছায়া প্রসঙ্গে সত্যের মূর্তি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পাঠকের বিশ্বাসযোগ্য হইবার জন্য যেমন উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক তেমন হইয়া ওঠে নাই।

চার অধ্যায় কাহিনীর নায়ক-নায়িকা অতীন্দ্র ও এলা, আর ইহার অতিনায়ক ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়; কিংবা জনশ্রুতি যতটা সত্য, যতটা মিথ্যা, সে ততখানি সত্য ও মিথ্যা, ইন্দ্রনাথ কল্পনার আতস কাচের মাধ্যমে সংহত জনশ্রুতির রশ্মি। সমস্ত কাহিনীটির উপরে সে গ্রীক নাটকের 'দেবযন্ত্রে'র মতো প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এমন একটা নির্গুণপ্রায় যন্ত্রের সহিত হৃদয়ের যোগাযোগের পথ থাকিতে পারে না। ইন্দ্রনাথ পাঠকের বিস্ময় আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু পাঠকের হৃদয়ের উপরে তাহার কোন দাবি নাই।

৬

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কয়েকটি রচনায় যে তিক্ততা, যে তীব্রতা, যে নিদাঘদাহ পাই আগের দিনের রচনায় তাহা বিরল। বাঁশরী, মালঞ্চ, চার

১ গ্রন্থপরিচয় ৫৪৩-৫৪৪, র-র, ১৩শ খণ্ড

অধ্যায়, তিন সঙ্গী প্রভৃতি রচনার কথাই ভাবিতেছি। প্রত্যেকটি রচনা যেন লেখকের কোন্ অবচেতন মনের তৃষ্ণার ও অতৃপ্তির উপাদানে গঠিত। এই সমস্ত রচনার শেষে পাঠক যেন একটা নিদাঘদাহময় তেপান্তরের মাঠের মধ্যে আসিয়া হাজির হয়। রবীন্দ্র-শিল্পে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্ম এরূপ পরিণামসূচী নয়, সাধারণত তাহার রচনার এরূপ পরিণাম ঘটে না। চোখের বালিতে জ্বালাময় উপসংহারের যথেষ্ট অবকাশ ছিল, বরঞ্চ সেই রূপই প্রত্যাশিত, কিন্তু লেখক সে রূপ হইতে দেন নাই; সমস্ত ক্ষোভ ও বেদনার উপরে ক্ষমার ক্ষৌমবস্ত্র টানিয়া দিয়াছেন। নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ প্রত্যেক উপন্যাসেই যে জ্বালা ও বেদনা প্রত্যাশিত লেখক শান্তিবারি আহরণ করিয়া তাহার উপরে ঢালিয়া দিয়াছেন, আর গল্পের মধ্যে সম্ভাবনা না থাকায় সে শান্তিবারি তাঁহার আপন হৃদয় হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এই ধারা দুই বোন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। শর্মিলার মনের অবস্থা নীরজার মতো হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু না, সে মেয়ে-ঘটক সাজিয়া স্বামী ও বোনের বিবাহ দিতে উদ্যত হইল! এ না স্বভাবসঙ্গত, না শিল্পসঙ্গত। তবে যে এমন হইল, তাহার কারণ রচনার পরিণামে দাবদাহ রবীন্দ্রনাথের কাব্য নয়। ইহাই রবীন্দ্র-শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম। কিন্তু দুই বোনের পর ব্যতিক্রম শুরু হইয়াছে, আর সে ব্যতিক্রম একাধিক! হঠাৎ এমন হইতে গেল কেন? এইসব রচনায় দেখা যাইবে যে, সীমা ও অসীমের গাঁঠছড়া খুলিয়া গিয়াছে—যুক্তবেণী আবার মুক্তবেণী। চিরজীবনের সযত্নলালিত আদর্শের ভিত্তি শিথিল হইবার ফলেই কি এই জ্বালা ও তিক্ততা? না অপর কোন কারণে জ্বালা ও তিক্ততা—যাহার একটা লক্ষণ জীবনতত্ত্বে কবিমুষ্টির শিথিলতা? বিষয়টা অনুধাবনযোগ্য। কারণ যাহাই হোক, কার্যত দেখিতে পাইতেছি যে, বহু নদনদীর যুক্তবেণী গঙ্গা যেমন সমুদ্র সমীপে সমাগত হইয়া পুনরায় বহু নদী-

মালায় আত্মমুক্তি ঘটাইয়া মহামুক্তির সন্ধানে ধাবিত, কবির জীবনেও তেমনি যেন একটা লীলা ঘটিয়া গিয়াছে; সুসংহত সীমা ও অসীমের যুক্তবেণী শান্তিপাবাবারের সম্মুখে আসিয়া মুক্তবেণীতে পরিণত। শেষ জীবনের রচনা কয়েকটিতে তাহারই চিহ্ন—আর এই কারণেই রচনাগুলির সমধিক গুরুত্ব।

৭

আগেই বলিয়াছি যে, এই উপন্যাসগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিকেব দায়িত্বের প্রতি তেমন সচেতন নন, তত্ত্ববিশ্লেষণেই তাঁহার প্রকৃত আগ্রহ। কিন্তু যেখানে তিনি ঔপন্যাসিকেব দায়িত্ব স্বীকাব কবিয়াছেন—কাহিনীর বিবৃতিতে নয়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে —সেখানে তাঁহার তুলনা নাই, ওসব কথা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই লিখিতে পাবিতেন। সবলাব গ্রেফতাব-সংবাদে তাহার প্রতি নীরজার উদ্বেলিত দরদ, সে যেন একপ্রকার কৃতজ্ঞতা; সরলার সম্বন্ধে নিজের মন পবিষ্কার হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া একপ্রকার আত্মপ্রসাদ অনুভব, সে তো নিজেব মনের সঙ্গে ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপরে হঠাৎ সরলাব আবির্ভাব। তবঙ্গ যেমন চূড়ান্তে উঠিয়া কলধ্বনিত অশ্রুশীকবে ভাঙিয়া পড়ে, তেমনি করিয়া নীরজার বিলপিত বেদনাশ্রুপাতের সঙ্গে অভিশাপবর্ষণ ও মহাপ্রয়াণ—এ চিত্র এমনভাবে আর কে আঁকিতে পারিত? নীরজার সমস্ত আস্তিত্ব মালঞ্চটার সঙ্গে একীভূত হইয়া গিযাছিল, সেই মালঞ্চের মাধ্যমে অপস্রিয়মান সংসারকে ব্যাকুলভাবে আকড়াইয়া ধরিবার প্রয়াস। এই দুর্বিষহ বেদনা কী করুণ রেখাপাতেই না চিত্রিত হইয়াছে। আর এলা শেষ মুহূর্তে—"অতীনেব পা জড়িয়ে ধরে বললে—মারো আমাকে অন্ত নিজের হাতে। তাব চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না। মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বারবার চুমো খেয়ে বললে, মারো এইবার মারো। ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।"

অতীন্দ্রের হাতে মরিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে খুব সূক্ষ্ম একটা বাঁচিবার ইচ্ছা, অতীন্দ্রকে লইয়া প্রেমধন্য জীবনযাপনের ইচ্ছা এলার মনে যে নাই তাহা কে বলিল? তাহার নিজের অগোচরে সে ইচ্ছা বর্তমান, একথা এলা স্বীকার করিবে না, কিন্তু তাহার ব্যবহার যে তাহা স্বীকার করিতেছে, নতুবা কেন সে "ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা?" ওটা আর কিছুই নয়, রহস্যময়ী নারীপ্রকৃতির সূক্ষ্ম রহস্যের ইঙ্গিত। শেষ মুহূর্তে, শেষ উপায় স্বরূপে আপন অনবদ্য রূপের জাদুমন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অতীন্দ্রকে মারাত্মক সঙ্কল্প হইতে ভ্রষ্ট করিবার ইচ্ছা ছাড়া আর কি? পুরুষ উদাসীন, আইডিয়ালিস্ট। নারী কেন্দ্রাভিগী শক্তি। পুরুষকে সে টানিয়া রাখিতেছে জীবনকেন্দ্রের দিকে। এলার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল তখন সে নারীপ্রকৃতির শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল—যদি নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া পুরুষ আপন কঠোর উদাসীন ভাব পরিত্যাগ করে। এ যুক্তি শুনিলে এলা কখনোই স্বীকার করিত না, কারণ এ যুক্তি সম্বন্ধে এলা নিজেও যে সচেতন এমন নয়, এ যুক্তি তাহার অন্তর্নিহিত অগোচর নারীপ্রকৃতির। কিন্তু যে কথা স্বয়ং এলারও অগোচর তাহা লেখক জানিলেন কি প্রকারে? উহা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই জানা সম্ভব। অপর কেহ হইলে ঐ ছত্রটি লিখিতে পারিত না।

শেষের কবিতা

'শেষের কবিতা' প্রকাশের পরে অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে; ইতিমধ্যে বইখানা বারংবার পড়িয়াছি, কিন্তু কোন মতামত প্রকাশ করিতে সাহস হয় নাই। এমনই ইহার দীপ্তি যে, আসল বস্তুটি চোখে পড়িতে চায় নাই; এখনও যে দীপ্তি কিছু কমিয়াছে এমন নয়, কিন্তু চোখ অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে; ফলে Privacy of glorious light-এর তলে বস্তুটি ধীরে ধীরে চোখে পড়িতেছে —এইবার ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সব গ্রন্থেরই দুইটি করিয়া মণ্ডল; একটি জ্যোতির্মণ্ডল, একটি বস্তুমণ্ডল; কিন্তু শেষের কবিতার জ্যোতির্মণ্ডলের মতো দীপ্তি বোধ হয় আর কোন বইয়ে নাই; সত্য কথা বলিতে কি, এতদিন ইহার জ্যোতির্মণ্ডলকেই প্রধান মনে হইয়াছে। কিন্তু আজ দেখিতেছি, ইহার বস্তুমণ্ডলও অসামান্য— ফলত ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু এ কি ভাষা! সরস্বতীর সম্মুখে এ কি বিদ্যুৎস্ফুরী অসিক্রীড়া! এ যে একেবারে "অভাবনীয়ের ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত"। এক একটি প্যারাগ্রাফ গোড়া হইতে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে হঠাৎ কোন্ সময়ে অভাবনীয়ের আকাশে গিয়া ঠেকে—আর তার শেষতম প্রান্ত হইতে সহস্র চিত্রবর্ণ তারকা-স্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া পড়ে—আর "হেলাভরে করে অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ"; ইহা ভাষার রডোডেন্‌ড্রন-গুচ্ছ।

ইহার ভাষার কথা মনে হইলে শাণিত তরবারিকে মনে পড়ে; আর শাণিত তরবারি মনে হইলে প্রশ্ন জাগে—হঠাৎ এতদিন পরে— যখন তরবারি কোষগত হইবার সময়—কোন্ শান্‌পাথরে তরবারি এমন নূতন দীপ্তি লাভ করিল? সেই শানপাথরের বাধা কি, যাহার সহিত দ্বন্দ্বে এমন অনর্গল অভাবনীয় স্ফুলিঙ্গ ক্ষরিত

হইতেছে ? আমার মনে হয় এইখানেই 'শেষের কবিতা'র আসল রহস্য। কারণ 'শেষের কবিতা'র ফিলজফি নূতন নয়, কিন্তু যাহা উপলক্ষ করিয়া এই পুরাতন ফিলজফি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসিতে মুহুর্মুহু চমকিয়া উঠিয়াছে, তাহা নূতন এবং তাহা বাংলা সাহিত্যের একটি সাময়িক বিশেষ ঘটনা।

গ্রন্থের নামটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো। গ্রন্থের শেষতম অধ্যায়টির নাম শেষের কবিতা, আর তাহাতে লাবণ্য-অমিতের প্রেমের উপসংহার বহন করিয়া দুইটি কবিতা আছে; গ্রন্থের সমাপ্তির পক্ষে এই অধ্যায়টি শুধু অনিবার্য নয়, সবচেয়ে গুরুতর। কিন্তু ইহাই কি গ্রন্থের নামকরণের পক্ষে যথেষ্ট কারণ ? আমার মনে হয়, ইহা একটা কারণ বটে—প্রধান কারণ নয়। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের মনের সূক্ষ্ম গুহাগতির সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা জানেন, কত সামান্য ইঙ্গিতকে গূঢ় ব্যঞ্জনার বাহন করিতে তিনি অভ্যস্ত, তাঁহাদের স্বভাবতই সন্দেহ থাকিয়া যায়; স্বীকার করাই ভালো, সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল এবং মোহমুক্ত দৃষ্টিতে আর একবার গ্রন্থখানা পড়িয়া সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

যে সময়ে 'শেষের কবিতা' লিখিত হয়, সেই সময়টা বাংলা সাহিত্যে তরুণ নাগা-সাহিত্যিকদের উত্থানের যুগ; রবীন্দ্রনাথ একদা যেমন প্রথম সাহিত্যিক দন্তোদ্‌গমের আমলে মাইকেলের অমর কাব্যের উপরে দন্তাঘাত করিয়া কাব্যজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন (পাঠক, ইহা আমার কল্পনা নয়, স্বয়ং কবির স্বীকৃতি আছে), তেমনই এই অভাজনের দল রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের একাধিক যুগ আছে; তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া তৎকালীন শেষের যুগের কবিতাগুলিই ছিল তাহাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য; অর্থাৎ তাহারা রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"কে বরদাস্ত করিতে পারিত না। তখনকার দিনের সাময়িক-পত্রিকার ইতিহাস লিখিত

হইলে দেখা যাইবে—মোটা পাতার অঙ্ক রবীন্দ্রনাথের এই "শেষের কবিতা" গুলির গ্লানিতে ও গালাগালিতে পূর্ণ। তারপরে অবশ্য এই তীব্রতার হ্রাস হইয়াছে, কারণ তখনকার তরুণেরা আজ পৌঢ়প্রায়; হয় বুদ্ধি বাড়াতে কবিতাগুলিকে বুঝিতে পারিয়াছে, নয় লজ্জা বাড়াতে নিজেদের নির্বুদ্ধিতাকে আর প্রচার করিতে সাহসী হয় নাই; আব ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' লিখিয়া এই বালখিল্যদের ব্যূহ ভেদ করিলেন—বৃদ্ধ রুস্তমের হাতে তরুণ সোরাবেব পরাজয় ঘটিল।

যখন তরুণদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথেব দোসরের জন্য সন্ধান চলিতেছিল, তখন স্বয়ং কবি নিজের এক দোসর খাড়া করিলেন—নিবারণ চক্রবর্তী। এই শিখণ্ডী কবি-পিতামহের বিরুদ্ধে খাড়া হইল বটে, কিন্তু তাহাব আড়ালে আত্মগোপন করিয়া যে বাণগুলি ছুঁড়িতে লাগিল, তাহা শিখণ্ডীর নয়, স্বয়ং অর্জুনের। যেন এই সত্যই প্রতিপাদিত হইল—রবীন্দ্রনাথের দোসর যে-ই হোক না কেন, তাহাকে রবীন্দ্রনাথের গড়া বাণই নিক্ষেপ করিতে হইবে; তাঁহার গড়া পুতুলই তাঁহাব কাছে গিয়া বেচিয়া আসিতে হইবে; কারণ শুধু যে এ যুগটাই রবীন্দ্রনাথের তাহা নয়—অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই ছোট ছোট রবীন্দ্রনাথ হইয়া পড়িয়াছি—সেইজন্য এমন যে দুর্দান্ত অমিত রায়, যে নিবাবণ চক্রবর্তীর বকলমে রবীন্দ্রনাথকে শাসাইয়া আসিতেছিল, সেও শেষে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকা ভাসাইয়া হালধারিণী কেটিকে রবীন্দ্রনাথের "নিরুদ্দেশ যাত্রা" পড়িয়া শুনাইতে বাধ্য হইয়াছে।

ববীন্দ্রনাথের শেষের কবিতাব সামান্য লক্ষণটি কি—জানা দরকার; কিন্তু একেবারে তাঁহার গোড়ার কবিতা হইতে আরম্ভ না করিলে চলিবে না; তাঁহার আগাগোড়া কাব্যের কি লক্ষণ—আগে জানিতে হইবে।

তাঁহার কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুইজন।

স্বজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।

একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।

অন্যজনা—লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির বিচিত্র দেবতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে দ্বৈরাজ্য স্থাপন করিয়াছে। একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করে; একজনের মুখ সুখদুঃখখণ্ডতাপূর্ণ সংসারের দিকে, আর একজনের মুখ নিরুদ্দেশ কল্পনালোকের দিকে; একজন প্রেমের দেবতা, আর একজন সৌন্দর্যের দেবী; একজন কবিকে মানুষের দিকে টানিতেছে, আর একজন তাঁহাকে নিরুদ্দেশের মুখে উধাও করিয়া দিতেছে; আর এই দুইজনের টানাটানিতে জগৎ ও জীবন গতি-পথে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে; কবির ভাষায় একজন শেলির স্কাইলার্ক, আর একজন ওয়াডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক।

একজন তপোভঙ্গ কবি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি,
দুহাতে ছড়ায়ে তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে;

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায় ;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ গানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর।

কবি এই দুই দেবীর অস্তিত্ব ও লীলা সম্বন্ধে সচেতন। তিনি জানেন, Ideal ও Real-এর আকর্ষণ-বিকর্ষণেই তাঁহার কাব্যের সৌরপরিবার টিকিয়া আছে। তবে তাঁহার বিশ্বাস, এই দুই বিপরীত শক্তির সমতায় কবির জগৎ ভারসাম্য লাভ করিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। দুই দেবীর লীলা গোড়া হইতেই তাঁহার কাব্যে আছে বটে, কিন্তু মনোযোগী পাঠকের কাছে ফাঁকি দেওয়া চলে না যে, ইহার মধ্যে দুইজন সমশক্তি নয় ; যে শক্তি কবিকে মানুষের দিকে টানিতেছে, আর যে শক্তি তাঁহাকে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের দিকে টানিতেছে, এই দুইয়ের মধ্যে শেষের জনের শক্তিই যেন কিছু বেশি· সেইজন্যই দেখি "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় কবি সুখদুঃখপূর্ণ মানব-সংসারের কাছে আসিয়া আবার কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন পরিপূর্ণ Ideal-লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন ; 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি "সোনার তরী" ; বৃহৎ মানব-সমাজের অভিমুখে তাহার যাত্রা" ; আর ঐ গ্রন্থের শেষতম কবিতাটি "নিরুদ্দেশ যাত্রা" ; সেই মনোহারিণী নাবিকা কবিকে পরিপূর্ণ Ideal-লোকে লইয়া চলিয়াছে ; আর অন্যের কথা বলিতে পারি না, নিজের কথাই বলি যে, "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতাটি বহু-প্রশংসিত "সোনার তরী" কবিতাটির চেয়ে অনেক উচ্চদরের ; তাহার কারণ কবি যে পরিমাণে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ধরা দিয়াছেন, সে পরিমাণে "সোনার তরী"তে ধরা পড়েন নাই ; আর এ বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, তবে একথা স্বীকার করিতে হয় যে,

অন্তত "সোনার তরী" কাব্যে Ideal ও Real-এর সমাবেশ হইয়াছে মাত্র, সমন্বয় হয় নাই। আমার বিশ্বাস—আর রবীন্দ্র-কাব্যজগতের গভীরতর রহস্যের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতেছে যে—যাহা "সোনার তরী" সম্বন্ধে সত্য, তাহা কবির সমগ্র কাব্য সম্বন্ধে সত্যতর।

যে শক্তিকে কবি বহু নামে অভিহিত করিয়াছেন, উপরের কবিতায় যাহা উর্বশী ও লক্ষ্মী; কবির ভাষায় যাহা শেলির স্কাইলার্ক ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক; আবার কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি; ইহাদের লীলা ও ছলনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মৌলিক রহস্য। এখন Idealও আছে Realও আছে, তাহাদের সমন্বয়ের উপায় কি? রূপও আছে, অরূপও আছে, তাহাদের মিলন কেমন করিয়া হয়? সীমাও আছে, অসীমও আছে, তাহাদের সন্ধি কিরূপে সম্ভব? এই যে দুই জগৎ, এই দুই জগতের সীমান্ত প্রদেশের কবি রবীন্দ্রনাথ; আর তাঁহার কাছে এ সীমান্তপ্রদেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের মতো অস্থির, খানিক পরিমাণে অরাজকতা-পূর্ণ; কৈশোর হইতে এই স্থানের মানসিক জরিপ ও মানচিত্র প্রস্তুতে তিনি ব্যস্ত; কিন্তু এ পর্যন্ত একটি রেখাকে তিনি সুনির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ কবির ধর্ম বলিয়া চঞ্চলতা, অস্থিরতা, অনিত্যতা, প্রবহমানতা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া থাকেন। সে এই জন্যই; দুই জগতের মধ্যেকার সীমান্ত স্থির করিতে না পারিয়া, নিজে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া মরিতে মরিতে অবশেষে এই চঞ্চলতাকেই "নিত্য" বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে, অভাবকেই সম্পদ ও অবস্থা-বিশেষকেই পরিণাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের ফিলজফির দুর্বলতা এইখানে, সে কেবল অবস্থাবিশেষের খবর দিতে পারে, সবটার খবর দিতে পারে না, কারণ পরিণামকে সে জানে না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই সামান্য (common) ধর্ম তাঁহার শেষের জীবনের কবিতায় অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার

শেষেব জীবনের কবিতা বলিতে আমি 'বলাকা'র পরের কাব্যগুলিকে বুঝি।

এই দুটি ধারা সমান্তরালভাবে তাঁহার কাব্যজগৎ অতিক্রম কবিযা চলিয়া আসিতে আসিতে 'বলাকা'য় একবারের জন্য, শেষ-বারের জন্য, সমন্বিত হইয়াছে, এবং তার পবেই আবার মুক্তবেণী হইযা ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু এবারে আর সমান্তরালভাবে নয়, ক্রমবর্ধিত তির্যক্ পথে। 'বলাকা'র অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী ও উর্বশী, তাঁহারা কেবল যে একত্র আছেন তাহা নয, একাসনে আছেন। কিন্তু 'বলাকা'ব পরবর্তী কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র শতদলের অধিকাংশ দল অধিকার করিযা উর্বশীব আসন পড়িয়াছে, লক্ষ্মীর আসন সঙ্কীর্ণ। সুখদুঃখ-বিরহমিলন-খণ্ডশ সংসারেব চেযে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যে পবিপূর্ণ জগতের প্রতি কবির আসক্তি অধিক বলিযা ধবা পডে। এই ideal ও real-এর দ্বন্দ্ব প্রেমের ব্যাপারে কী রূপ গ্রহণ কবিযাছে দেখা যাক্। প্রেমেব দুইটি দিক আছে, একদিকে সে অসীম, আর একদিকে সীমাবদ্ধ, মনের মধ্যে সে ideal আর সংসারে সে real, প্রেমের ভাবটি সীমাহীন, আর প্রেমের পাত্র স্বল্পপরিসর, সংসারে real মানুষ হিসাবে সুখদুঃখ-বিরহমিলনে সে খণ্ডিত, সে নানা তুচ্ছতা ও সঙ্কীর্ণতাগ্রস্ত। ববীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রেমের কবিতা প্রেমের উপরে, প্রেমিকের উপবে নয়, অর্থাৎ প্রেমের এই ideal রূপটি তাঁহাকে যেমন আকর্ষণ করিযাছে, প্রেমিকের real রূপটি তেমন করে নাই। সেইজন্যই তাঁহার প্রেমের কবিতায় পাঠকের মনকে অতীন্দ্রিযতার ভাবে পূর্ণ করিয়া নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের ideal-লোকের দিকে উদাস করিযা দেয়—সংসারের real-লোকের দিকে টানিযা আনে না, তিনি যেন প্রেমপাত্র অপেক্ষা প্রেমকে বেশি ভালোবাসেন।

এখন এই ভাবটি শেষের কাব্যে সুস্ফুট, 'পূরবী', 'মহুয়া'র অধিকাংশ প্রেমের কবিতার লক্ষ্য—লীলাসঙ্গিনী, কিংবা এগুলিকে

প্রেমের কবিতা বলাই যেন ভুল—এগুলি প্রেমের স্মৃতির কবিতা, আর লীলাসঙ্গীনীকেও প্রেমিকা বলা ঠিক নয়। পূর্ণবয়স্ক নরনারীর প্রেম দুই পক্ষ হইতেই সক্রিয় ও সচেতন; তাহাতে মনের সঙ্গে মনের সংঘাত, বাসনার সহিত বাসনার সঙ্কট, তাহা লাভ করা সহজ নয়, রক্ষা করা আরও কঠিন। এই সংঘাতে সংঘর্ষে যে তীব্রতার, উত্তাপের, স্ফুলিঙ্গের ও দাবানলের সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কাব্যে তাহা একান্ত বিরল। শুধু বিরল নয়, এই আগ্নেয় আতিশয্যকে রবীন্দ্রনাথ যেন সহ্য করিতে পারেন না; যে চাতক পরিপূর্ণ ideal-লোকের ঊর্ধ্বাকাশের পথিক, তাহার পাখা এই আগুনে দগ্ধ হইবার যেন আশঙ্কা। কবির মতে হৃদয়াবেগের এই আতিশয্যটা বিশেষভাবে ইউরোপের জিনিস, আমাদের দেশের সমাজের ও সাহিত্যের সঙ্গে ও-জিনিসের মিল নাই; কিন্তু দূরাগত নবাগন্তুক যেমন কখনও কখনও মনোহরণ করে, এই ভাবটাও তেমনই আমাদের চোখে নেশা ধরাইয়া সাহিত্যিক মন কাড়িয়া লইয়াছে। তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিতেছেন—

"যে সময়টার কথা বলিতেছি তখনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে ইংরেজী সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্য-দেবতা ছিলেন শেক্‌সপীয়র, মিল্টন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণে বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজী সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। · ··· আমাদের সমাজ আমাদের ছোট ছোট কর্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত

একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে, সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না—সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এই জন্যই ইংরেজী সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।"[১]

ইহার পরে অনেক কাল গিয়াছে, আমাদের সাহিত্য-দেবতার বদল হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যধর্ম সেই একই আছে, হৃদয়াবেগের প্রবল আবর্তে মনের তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়িয়াছে—প্রধানত ইহাই আমাদের তরুণ সাহিত্য। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের কাছে পঙ্কটাকেই স্বাভাবিক ও পঙ্কজকে অবান্তর বলিয়া মনে হইয়াছিল; কাজেই রবীন্দ্রনাথের পঙ্কজকাননকে তাহাদের কাছে দুর্বলতার চিহ্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতার উল্লেখ করিয়া অমিত রায় এক জায়গায় বলিতেছেন—[তার কবিতা] "তোমার ঐ রবিঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হালছাড়া বিলাপ নয়।"[২]

ইহা তরুণদের মত। এই যে মিইয়ে-পড়া ভাব, ইহা কেবল ভাষাগত নয়, প্রকাশ-ভঙ্গীগত নয়; আরও আন্তরিক ব্যাপার। যে হৃদয়াবেগের আতিশয্যের কথা বলিয়াছি, ইহা তাহারই অভাব। রবীন্দ্রনাথ ইহার সাধনা করেন নাই শুধু নয়, ইহার বিপরীতটার সাধনা করিয়াছেন; তাঁহার প্রেমের কাবতায় হৃদয়কে তোলপাড় করে না, হৃদয়কে উদাস করিয়া দেয়; তাহা real-এর নয়, ideal-এর কাব্য; ইহাই রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাব ও কবি-সাধনা। ইহা না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা অসম্পূর্ণ থাাকবে, আর এই অসম্পূর্ণ

১ জীবনস্মৃতি ১২৯ ১৩০

২ শেষের কবিতা ১৫৯

উপলব্ধির ফলেই এক সময় তরুণ সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতাগুলিকে আক্রমণ করিয়াছিল ; আর এই আক্রমণের পাল্টা জবাব বা কৈফিয়ত দিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ একজন তরুণকে নায়ক বানাইয়া এই কাহিনীটি রচনা করিয়াছিলেন ; 'শেষের কবিতা' নামকরণেব রহস্য এতদূর ব্যাপক।

২

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এই যে দুই কোটির কথা বলিলাম, একদিকে real, আর একদিকে ideal ; real-এর প্রতি আকাঙ্ক্ষা আর ıdeal-এর প্রতি আসক্তি , আর এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়েব চেষ্টাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"আমাব ত মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পাবে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।" [১]

* * * *

"কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকাব করিয়া আসিয়াছে।"[২]

'শেষের কবিতা' কাহিনীতে এই তত্ত্বটিকে প্রেমের ক্ষেত্রে আরোপ করিবার চেষ্টা আছে। প্রেমের এই দুইটি দিক আছে, হৃদয়ের মধ্যে সে অসীম, সংসাবে সে সীমাবদ্ধ , প্রণয়িনীরূপে হৃদি-মন্দিরে যাহার সীমা নাই, গৃহিণীরূপে গৃহমন্দিরে সে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ , আর এই দুই রূপের মধ্যে সমন্বয়ের কোন সেতু আছে কি না ? অর্থাৎ প্রণয়িনী ও গৃহিণীকে একত্র সমাবেশ করা সম্ভবপর কি না ?

রবীন্দ্রনাথেব সাহিত্যে প্রেমকে এই দুইভাবে যাচাই করিবার চেষ্টা গোড়া হইতে আছে ; 'চিত্রাঙ্গদা'তেও এই একই চেষ্টা।

১ জীবনস্মৃতি ১৭১

২ জীবনস্মৃতি ১৭১

"গৃহের বনিতা"র "বিশ্বের কবিতা" রূপে উদয় হইতে বাধা নাই ; রাত্রে যে প্রেয়সী ছিল, প্রভাতে তাহাব দেবীরূপে শ্রেয়সী হইতে বাধা নাই ; কারণ তাহার লীলাক্ষেত্র কবির কল্পনা। কিন্তু সংসারের মধ্যে ইহা কিরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিবে ? একই নারী এই দুই দাবি মিটাইতে পারে কিনা ? কিংবা একই নারীর দ্বারা এই দুই স্বাদ মিটাইবার চেষ্টা মোহভঙ্গে পর্যবসিত হইবে কি না ? কিংবা কতদূর পর্যন্ত একই নারীর দ্বারা এই দুই তৃষ্ণাব পরিতৃপ্তি হইতে পারে ? সংক্ষেপে ইহাই 'শেষের কবিতা' কাহিনীব প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ্রীকগণ নারীকে দেবী বলিয়া কল্পনা করে নাই। ইহা ইউরোপে মধ্যযুগ হইতে সুরু হইয়াছে ; মধ্যযুগের বীরগণ নারীকে দেবী কল্পনা করিয়াছে ; কিন্তু সেই দেবীকে প্রেয়সী করিবার দুষ্কল্পনা তাহাদেব ছিল না। দান্তে বিয়াত্রিচেকে কখনও বিবাহ করিবার কথা কল্পনাও করেন নাই ; বিয়াত্রিচে তাঁহার কাছে দেবীসত্তা ছিল—আর দেবীসত্তারূপে সে কবিকে বিশ্বের রহস্যের সন্ধান দিয়াছে। দান্তে প্রেমের রহস্য অবগত ছিলেন। যাহা হাতে পাইবাব নয়, তাহাকে তিনি হাতে পাইতে চাহেন নাই। আমাদের দেশে বৈষ্ণব কবিগণও এই রহস্য জানিতেন, তাঁহারা জানিতেন, প্রেমের একটা দিক আছে, যেখানে তাহার কোন সীমা নাই ; কিন্তু ইহাও জানিতেন যে, তাহাকে টানিয়া গৃহের মধ্যে আনিলে তাহার স্বরূপ নষ্ট হইয়া যায়। প্রেমের ideal-রূপের লীলার স্থান মানুষের কল্পনা ; আর ideal-রূপের লীলার পাত্র স্বয়ং যিনি ideal, ভগবান ও idealised মানুষ—কৃষ্ণ ও রাধা। এমন যে ideal-এর লীলা, তাহার ক্ষেত্র সমাজ নয়, সংসার নয় ; সংসারের মধ্যে আনিলেই বাস্তবের আঘাতে তাহাতে টোল পড়িয়া যাইবে ; সেইজন্য সংসারের বাহিরে, সামাজিক সম্বন্ধের বাহিরে, নগরপল্লীর বাহিরে, বৃন্দাবনের মধ্যে, যমুনার তীরে ও নীরে, রাধা-কৃষ্ণকে স্থাপন করা হইয়াছে।

এই নিটোল আদর্শ কল্পনায় উপভোগের বস্তু, সংসারে টানিয়া আনিবার বস্তু নয়; যাহা ideal, তাহার সঙ্গে real-এর খাদ মিশাইবার বৃথা প্রয়াস তাঁহারা করেন নাই; তাঁহারা জানিতেন, নানা ভ্রমত্রুটিপূর্ণ মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়—প্রেমের পরিপূর্ণতার আস্বাদ গ্রহণ কেবল পূর্ণ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহারা জানিতেন—

"মানুষে এমন রূপ কভু না দেখিএ"।

দান্তে ও বৈষ্ণব কবিরা রিয়ালিস্ট ছিলেন বলিয়াই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করেন নাই।

ইউরোপের কাব্যে এই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে রোমান্টিক কবিদের আমল হইতে। এই অসম্ভবপ্রয়াসীদলের প্রধান দৃষ্টান্ত শেলি। শেলির জীবনের ট্র্যাজেডির মূলে এই অসম্ভবের আশা। প্রত্যেক বার যখনই কোন নূতন নারীর সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, অমনই মনে হইয়াছে, এতদিনে মানসীর দেখা পাওয়া গেল; দুইদিন পরে মোহভঙ্গ হইয়াছে; আবার তিনি নূতন মানসীর সন্ধানে ছুটিয়াছেন। বুদ্ধি দ্বারা তিনি বুঝিতেন, জীবনে এমন প্রয়াস সম্ভব হইবার নয়; কিন্তু কবি-সংস্কার অসম্ভবের পথে তাঁহাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

কীট্‌সের বাস্তব-ঘেঁষা কল্পনা এ বিপদ হইতে অনেক পরিমাণে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। তিনি জানিতেন, বাস্তবে ও আদর্শে মিলন সম্ভব নয়, কারণ দুয়ের ধর্ম ভিন্ন; জগতে বাস্তবও যেমন সত্য, আদর্শও তেমনই সত্য; idealও আছে, realও আছে; আর দুইয়ের যে মিলন ঘটিবেই, এমন কথা কে বলিল? নাইটিংগেলের গান নিত্য, মানুষের জীবন অনিত্য; শিল্পসৃষ্টি শাশ্বত, শিল্পী ক্ষণপ্রাণ; কিন্তু দুইই সমান সত্য। ইহাতে আমাদের দুঃখ হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে ইহাদের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিবে কেন? এ দুটার প্রকৃতির যথার্থতা জানাতেই মানুষের সান্ত্বনা, ইহাকেই তিনি বলিয়াছেন—মানুষের জীবনের 'ট্রুথ'।

ইংরেজী রোমান্টিক সাহিত্যের মারফতে এই রোমান্টিক মনোবৃত্তি আমাদের দেশে আসিয়াছে, এবং আর কিছুতে না হউক, এই বিষয়ের প্রধান উদাহরণস্থল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য।

তিনিও জানেন যে, Ideal ও Real দুইই আছে। কিন্তু ভারতীয় মনের প্রধান একটা ধর্ম এই যে, সর্বদা তাহা জগতের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টায় নিযুক্ত। দুই আছে, বহু আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সমন্বয়েব পথ নাই—এ চিন্তা ভারতীয় মনকে পীড়া দেয়; রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় মন গোড়া হইতে এই বহুর মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টায় নিরত।

৩

অমিত লাবণ্যকে বিবাহ কবিবে স্থির করিল; লাবণ্যও প্রথমে সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে বাঁকিয়া বসিল; ভালোবাসে না বলিয়া নয়, ভালোবাসে বলিয়াই; সে অমিতকে ভালোবাসে বলিয়াই কষ্ট দিতে চাহে না। লাবণ্য বুঝিতে পারিল অমিত তাহার মধ্যে নিজের মানসীকে ভালোবাসিয়াছে, সুখদুঃখদোষত্রুটিপূর্ণ মাটির মানুষ লাবণ্যকে নয়; সে মানসীকে গৃহিণী করিবার চেষ্টা করিতেছে; ইহাতে তাহার দুই কুল নষ্ট হইবার আশঙ্কা, বিবাহের প্রাত্যহিক নৈকট্যে সে মানসীকেও হারাইবে, গৃহিণীকেও পাইবে না, ফলে উভয়েরই জীবন বার্থ হইতে চলিবে। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অধিকতর রিয়ালিস্ট, সেইজন্য এ রহস্যটা বুঝিতে লাবণ্যের বেশি বিলম্ব হয় নাই;—অমিতকে অনেক ভুগিয়া বুঝিতে হইয়াছে, সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়াছে বলিয়া মনে করি না।

সংসারে মস্ত একটা সান্ত্বনার বিষয় এই যে, সকলে অমিতের মতো নয়, অর্থাৎ সকলে মানসীর সঙ্গে গৃহিণীর সমন্বয় করিতে চায় না; এক একটা লোক চায়,—অমিত সেই রকম একজন, লাবণ্য বুঝিয়াছে। লাবণ্য যোগমায়ার কাছে অমিতকে বিবাহ না করার পক্ষে কারণ দর্শাইতেছে:—"বিয়ে ক'রে দুঃখ দিতে চাইনে। বিয়ে

সকলের জন্যে নয়। জানো, কর্তা-মা, খুঁৎখুঁতে মন যাদের, তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে প'ড়ে স্ত্রী-পুরুষে যে বড় বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে—মাঝে ফাক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয়, নিতান্ত নিকটে থেকে। কোন একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।" [১]

মেয়েদের দৃষ্টি বাস্তব-ঘেঁষা; লাবণ্য সেই বাস্তব-ঘেঁষা দৃষ্টিতে অমিতের প্রকৃতির স্বরূপ দেখিয়া ফেলিয়াছে—"কিন্তু উনি তো আমাকে চান না। যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনে করেন। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেচি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলি আমাকে গড়ে তুলেচেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে-মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গ'ড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।" [২]

লাবণ্য জানে মানসী শুধু যে মানসের সৃষ্টি তা নয়, তার আসন মানসেই; সে প্রতিষ্ঠা হইতে টানিয়া নামাইলে তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া যায়; লাবণ্য জানে, মনের মানুষ, "সে কি আছে ভুবনে? সে যে রয়েছে মনে।" তবে অমিতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটি কি রকম হইবে?—"যতোদিন পারি, না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হ'য়েই থাকবো। আর স্বপ্নই বা তাকে বলবো কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েচে। না হয় সে, গুটি থেকে বের হয়ে আসা দু-চার-দিনের একটা রঙীন প্রজাপতিই

১ শেষের কবিতা ১১১

২ শেষের কবিতা ১১১

হ'লো, তাতে দোষ কি—জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়—না হয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলো, আর সূর্যাস্তের আলোতে ম'রেই গেল, তাতেই বা কী? কেবল এইটুকুই দেখা চাই-যে, সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হ'য়ে না যায়।"[১]

লাবণ্যও কম রোমান্টিক নয়, কিন্তু সে জানে জীবন ও রোমান্স সমার্থক নয়; জীবন রোমান্সের চেয়ে ব্যাপক; রোমান্স ও প্রত্যহ স্বতন্ত্র; সে জানে বিবাহ ও প্রেম সমার্থক নয়; প্রেম বিবাহের চেয়ে ব্যাপক। আর অংশকে সমগ্রের সমমূল্য দান বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়; সেইজন্য নিজের প্রতি অমিতের এই রোমান্টিক মনোবৃত্তিকে সে বিবাহের ঘের-দেওয়া বাসরঘরে টানিয়া আনিতে চায় না; সে প্রেমেব দুই রূপকেই স্বীকার করে—দুইকে এক করিবার অসাধ্য সাধনা তার নয়।

৪

প্রেমেব এক কোটিতে বিবাহ, অপর কোটিতে রোমান্স, আর এই দুটি কোটিতে একসঙ্গে গুণ-পরানো অমিতের জীবনের ধনুর্ভঙ্গ পণ। অমিত অদ্ভুত লোক: তাহার এক পা বিদেশে, আর এক পা এদেশে; তাহাব এক চোখ রোমান্সের জগতে, আর এক চোখ বাস্তবের জগতে; সে পড়ে ইংরেজি, লেখে বাংলা; আর সকলে অন্যের লেখা চুরি করে, সে নিজের লেখা অপরের নামে চালায়; জীবনের চেয়ে সাহিত্য তাহার কাছে বড়; জীবন-পার্লামেন্টের সে চিরন্তন বামপন্থী; নিজের কথা তাহার কিছু আছে কি না তখনই জানা যায়, যখন সে পরের কথার প্রতিবাদ করতে ওঠে; প্রতিবাদের শানপাথর পাইলেই তবে তাহার বাক্‌স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। লোকের মধ্যে না থাকিলেও সে অস্বস্তি অনুভব করে; সে যে আর দশজনের মতো নয়, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই আর আর দশজনের

১ শেষের কবিতা ১১২

সঙ্গ তাহার আবশ্যক ; তাহার কৃত্রিমতাও অকৃত্রিম। অমিত বলে —"আমি রোমান্সের পরম হংস।" হংসের মতোই তাহার ত্রিধা গতি—জলে, স্থলে, আকাশে।

এমন লোককে কে বিবাহ করিতে ভরসা করে? তাহার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিলে কোন মেয়েই তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইত না ; লাবণ্যও হয় নাই। কেটি বিবাহ করিয়াছে ; কেটি যে বুঝিয়াছে, এমন অপবাদ কেহ তাহাকে কখনও যেন না দেয়।

অমিত লাবণ্যের কাছে বিবাহোত্তর জীবনের যে-সব মনোরম চিত্র আঁকিয়াছে, তাহাতে যে-কোন মেয়ে সাবধান হইয়া যাইত, লাবণ্য তো বিশেষ বুদ্ধিমতী।

"স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি, গঙ্গার ধার ; পাড়ির নিচে-তলা থেকে উঠেচে ঝুরি-নামা অতি পুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিলো তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকো বেঁধে গাছ-তলায় রান্না চড়িয়েছিলো। ওরি দক্ষিণ ধারে ছ্যাৎলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু ধ্বসে যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে সাদায় রঙ-করা আমাদের ছিপছিপে নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে শাদা অক্ষরে নাম লেখা।" [১]

তারপর—

"সন্ধ্যাতারা উঠেচে, জোয়ার এসেচে গঙ্গায়, হাওয়া উঠলো ঝিরঝির ক'রে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠলো স্রোতের ছলছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদীঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেচো, তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়। ভাবতে ভাবতে যাবো আজকে সন্ধ্যেবেলার রঙটা কী। মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরবো ; পায়ে থাকবে হাতির দাঁতের কাজ-করা খড়ম। গিয়ে দেখবো, গালচে বিছিয়ে বসেচো, সামনে রুপোর রেকাবিতে মোটা

১ শেষের কবিতা ১৪০

গোড়ের মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জলছে ধূপ। পূজোর সময় অন্তত দু-মাসের জন্যে দু-জনে বেড়াতে বেরোবো। কিন্তু দু-জনে দু-জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে আমি যাবো সমুদ্রে।" ১

এইরূপে অমিত রায় দাম্পত্য দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলী দাখিল করিয়া লাবণ্যের মতামত জিজ্ঞাসা করিল। লাবণ্য এই কয় দিনের সাহচর্যেই তাহার স্বরূপ ধরিয়া ফেলিয়াছে, সে বুঝিয়াছে রোমান্সজীবী ব্যক্তির কাছ হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল, কারণ যে মায়ার অভাব নিজের মধ্যে আছে, দূরত্ব সেই মায়া-গুণ্ঠনের দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিবে। তাই সে বলিতেছে—

"কিন্তু আমি জানি আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিতে বিনা লজ্জায় সইতে পাববে, সেই জন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল ক'রে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।" ২

নীচে অমিত রায়ের দাম্পত্য জীবনের আর একখানি চিত্র দেওয়া গেল।—

"তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম,--কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকাল-বেলাকার আলোয় উদাস কবা একটা পথের ছবি,—অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়গুলোব উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার ফলাওয়ালা লম্বা লাঠি, পিঠে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চলবে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হোক বন্যা, তুমি আমাকে বদ্ধঘর থেকে বের ক'রে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দু-জনের!"

এমন পুরুষকে কোন্ মেয়ে কবে জানিয়া শুনিয়া স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছে! এক একটা লোক আছে বাক্য যাহাদের কাছে জীবনের গুরুত্ব লাভ করে; কথা বলাতেই কথার চরিতার্থতা; জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নাই; জীবন ও কথা সমান্তরাল ভাবে

১ শেষের কবিতা ১৪৩-৪৪

২ শেষের কবিতা ১৪৫

৩ শেষের কবিতা ১৭৫

চলিয়াছে; দুটির সত্তা স্বতন্ত্র; কোনটির চেয়ে কোনটি ছোট নয়। ইহাদের শিল্পী বলিলে ভুল করা হইবে, কারণ শিল্প জীবনের অন্তর্গত; ইহাদের বরঞ্চ বাক্‌-শিল্পী বলা যাইতে পারে—অমিত রায় এই দলের একজন।

৫

অমিতের সঙ্গে লাবণ্যের বিবাহ ভাঙিয়া গেল; তার বদলে লাবণ্যের সঙ্গে শোভনলালের ও কেটির সঙ্গে অমিত রায়ের শুভ বিবাহ হইল; বস্তুস্বরূপের নিয়মানুসারে এইরূপ হইবারই প্রয়োজন ছিল—ইহাকে elective affinity বলা যাইতে পারে।

অমিতের একটা নেশা ভাঙিল—একজনের মধ্যে গৃহিণী ও প্রণয়িনীকে পাইবার নেশা; কিন্তু এই নেশাটাই আর এক রূপে রহিয়া গেল—সংসারের মধ্যে এই দুই স্বাদ পাইবার নেশা; এবারে আর একজনের মধ্যে নয়, দুইজনের মধ্যে—কেটি আর লাবণ্যের মধ্যে;—লাবণ্য তাহার মানসী, কেটি তাহার গৃহিণী। মানুষের এই দুই স্বাদেরই হয়তো আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে জুটিয়া ওঠে না; আর তাহারা সবচেয়ে বেশি কৃপার পাত্র, যাহারা এই দুইকে—প্রেম ও বিবাহকে, রোমান্স ও প্রত্যহকে—একদেহে পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা করে। জগতের সবচেয়ে বড় প্রেমিক-কবি দান্তে সবচেয়ে বড় রিয়ালিস্ট ছিলেন; তাঁহার বাস্তবনিষ্ঠ দিব্যদৃষ্টি এই বিপত্তি হইতে তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিল; বিয়াত্রিচেকে বিবাহ করিলে 'ডিভাইন কমেডি' কখনও লিখিত হইত না।

অমিত রায়ও পরোক্ষভাবে এই সত্যটাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে; মানসীকে গৃহিণীরূপে তো পাওয়া যায়ই না, সংসারেই পাওয়া যায় কি না সন্দেহের বিষয়। লাবণ্যকে গৃহিণীরূপে পাইবার আশা যে শুধু ছাড়িয়াছে এমন নয়, যে-লাবণ্য মানসী, প্রধানত সে তাহার মানসেই আছে, বাইরের ব্যক্তিটি তুচ্ছ উপলক্ষ্য

মাত্র; ইটের যে সাময়িক তোরণটাকে অবলম্বন করিয়া খিলান গাঁথা হয়, খিলানের পক্ষে সেটা একান্ত অবান্তর; গাঁথুনি শেষ হইলে সেটাকে খুলিয়া দেওয়া হয়—ব্যক্তি-লাবণ্যও অমিতের মানসী-লাবণ্যের পক্ষে এখন তেমনই অনাবশ্যক, তাহার অন্যত্র বিবাহই হোক বা মৃত্যুই হোক অমিতের জীবনে তাহাব কাজ শেষ হইয়াছে, কিংবা বলা উচিত, তাহার লীলা চিরন্তন হইয়া গিয়াছে।

অমিতেব গোড়ায় গলদ ছিল এই যে, সে ভাবিয়াছিল ভালোবাসা আর বিবাহ এক; লাবণ্য-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার পরে সে বুঝিতে পাবিল—"সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা, তাহ'লেও আর একটা কথায় গিয়ে পডবো, ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আবো বেশি জ্যান্ত।" [১]

তাহার দ্বিতীয় গলদ এই যে, যাহা একান্ত আকস্মিক, কখনও কখনও হয়তো কোন সৌভাগ্যবানের জীবনে ঘটিতে পারে, এমন বিষয়কে সে একটা নিয়মের শৃঙ্খলা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। মানসী ও গৃহিণী কখনও কাহারও ভাগ্যে অকস্মাৎ জুটিয়া যাইতে পারে—কিন্তু এমন হঠাৎ-এর উপর নির্ভর করিলে সংসারযাত্রা দুর্ভর হইয়া পড়ে।

যতিশঙ্করের প্রশ্নের উত্তবে, কেটি ও লাবণ্যের সঙ্গে তাহার কি বকম সম্বন্ধ, সে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে—

"যে-ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ, যে-ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসাবে সে দেয আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।" [২]

আবার—

১ শেষের কবিতা ২২২

২ শেষের কবিতা ২২৪

"একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ—আজ আমি পেয়েচি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেচি। কিন্তু আমার আকাশও রইলো।" [১]

যতিশঙ্কর প্রশ্ন করিল—

"কিন্তু বিবাহে তোমার ঐ সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না?" [২]

অমিত বলিতেছে—

"জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে-মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো—যে তা না পায় দৈবক্রমে তার যদি ডান দিকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সে-ও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।" [৩]

শিলঙের অভিজ্ঞতার আগে সে নিশ্চয়ই এই সত্যকে স্বীকার করিত না। কিন্তু এখনও তাহার বস্তুস্বরূপ বা Nature of Thingsকে বুঝিতে বিলম্ব আছে—

"আমার রোমান্স আমিই সৃষ্টি করবো। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোমান্স, আমার মর্ত্যেও ঘটাবো রোমান্স। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বলো রোমান্টিক। তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোমান্সের পরম হংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলেস্থলে উপলব্ধি করবো, আবার আকাশেও। [৪]

"কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো।

১ শেষের কবিতা ২২৪
২ শেষের কবিতা ২২৪
৩ শেষের কবিতা ২২৪ ২২৫
৪ শেষের কবিতা ২২৫

আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে-ভালোবাসা, সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" [১]

ইহাও কল্পনা মাত্র—জীবনে সত্য হইবার মতো বস্তু নয়—অমিত রায়ের এ ভুল ভাঙিবে। সে যে কেটিকে নিছক গৃহিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছে, এমন মনে না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে; নৈনিতালের হ্রদে যাহাকে নৌকার নাবিকা করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা পাঠ করা যায়—সে আর যাই হোক গৃহিণী নয়, অর্থাৎ তাহাকে লইয়া ঘর করা চলে না। কবিরও এই সন্দেহ আছে, কাজেই তিনি কেটি অমিতকে কলিকাতায় গৃহস্থালীর মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে সাহস করেন নাই। অমিত রায়ের মতো রোমান্সের পরমহংসদের বিপদ এই যে, তাহারা জীবন-ধনুকের দুই কোটিতে—এক কোটিতে প্রেম অপর কোটিতে বিবাহ, এক কোটিতে কল্পনা অপর কোটিতে বাস্তব—এক সঙ্গে গুণ পরাইতে চেষ্টা করে, ফলে জীবন-ধনুক ভাঙিয়া পড়ে—ইহাই অমিত রায়ের ট্রাজেডি।

তাহার সঙ্গে রিয়ালিস্ট লাবণ্যের পার্থক্য কত! লাবণ্য শোভনলালকে বিবাহ করিবার আগে অতীতটাকে নিঃশেষে চুকাইয়া দিয়াছে, বর্তমানের মধ্যে স্মৃতির রেশ টানিয়া চলে নাই; অমিতের পায়ে ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ ও শেষ প্রণামী—

—মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মূরতি
যদি সৃষ্টি করে থাকো, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে। [২]

অতীতের এই মূর্তিকে

…আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে। [৩]

---

১ শেষের কবিতা ২২৬

২ শেষের কবিতা ২৩০

৩ শেষের কবিতা ২৩০

আর

যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিশায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।"[১]

শোভনলালের কাছে তাহার আত্মদানের ইহাই স্বরূপ। জীবনকে এই রকম ভাবে সম্পূর্ণ দুই কোঠায় বিভক্ত করিয়া দান করা, বোধ করি একমাত্র মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব। পুরুষরা মিছামিছি বর্তমানের মধ্যে অতীতের জের টানিয়া টানিয়া জীবনকে জটিল করিয়া ফেলে—অমিত রায় সেই জের টানিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলিয়াছে---তাহার সহযাত্রী হওয়াতে কেটির কপালে দুঃখ আছে।

৬

কবি জানিতেন, অমিতের রোমান্সের স্থান সংসার নয়, কাজেই কলিকাতা নয়, তাহাকে টানিয়া শিলঙ পাহাড়ে লইয়া গিয়াছেন। পৃথিবীতে যেমন তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল, শিলঙ পাহাড়ে তেমনি তিন ভাগ প্রকৃতি, এক ভাগ মানুষ—মানুষ এখানে অত্যন্ত অবান্তর প্রক্ষিপ্তের মত; এ-হেন স্থানই রোমান্সের পটভূমি, কাজেই গল্পের অধিকাংশ শিলঙে ঘটিয়াছে। শিলঙের আসর যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তিনি আবার কেটি ও অমিতকে আর এক পাহাড়ে লইয়া গিয়াছেন—নৈনিতাল পাহাড়ে; বিবাহিত অমিতকেও যে কলিকাতায় আনিবেন এমন ভরসা আমাদের নাই। রোমান্টিক সাহিত্য নাগরিক কল্পনার সৃষ্টি।

৭

শোভনলাল বাক্‌কুণ্ঠ, তীক্ষ্ণধী, লাজুকস্বভাব যুবক; জীবনে এই জাতীয় লোকের এক-আধবার চরম পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তখন তাহারা সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

[১] শেষের কবিতা ২৩২

আর অমিত রায়ের স্বভাব শোভনলালের প্রায় বিপরীত; চরম পরীক্ষার মুখে আসিয়া ইহারা প্রায়ই হটিয়া যায়।

এই দুই বিরুদ্ধ-জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করিতে রবীন্দ্রনাথ যেন আনন্দ পান।

বিনয়, গোরা; নিখিলেশ, সন্দীপ; শ্রীবিলাস, শচীশ; এবং অমিত রায়, শোভনলাল—এই জাতীয় যুগ্ম চরিত্র।

বিনয়, নিখিলেশ, শ্রীবিলাস, শোভনলাল সগোত্র; আবার গোরা, সন্দীপ, শচীশ, অমিত রায় সগোত্র; ইহাদের মধ্যে পার্থক্য রক্তের নয়, পারিপার্শ্বিকের।

ঊনবিংশ শতকের শেষ চতুর্থকে বাঙালীর দুইটি সমস্যা ছিল—স্বাজাত্য ও স্বাধর্ম্যকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রতিপক্ষেব নাকের উপর প্রতিষ্ঠা করা; গোরা সেই বাংলাদেশের লোক।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়কে বাঙালী নিজের উপরে যেন অনাস্থা-প্রস্তাব পাস করিয়াছে—সম্মুখে ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কাজেই কোন কাজ নাই; কিন্তু সেই বুদ্ধি ও নিপুণতা আছে--আর এই দুইটি দিয়া একমাত্র বস্তুকে সে সাধনা কবিয়াছে—কি করিয়া কথা বলিতে হয়; কথাই এখন বাঙালীর আত্মপ্রকাশের প্রধান উপায়, অমিত বায় সেই বাংলা দেশের লোক। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস গোরা ও অমিত রায় কাল বিনিময় করিলে পরস্পরের ভূমিকা নিখুঁত ভাবে গ্রহণ করিতে পারিত।

শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ অমিত রায়ের উপর, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বোধ করি তিনি শোভনলালকেই বেশি ভালোবাসেন।

৮

বাংলা সাহিত্যে Novel of Manners বলিতে একমাত্র 'শেষের কবিতা'কেই অংশত বুঝায়, সম্পূর্ণভাবে নয় এইজন্য যে, ইহার

মধ্যে Novel of Manners-এর উপাদান আছে, সমাধান নাই, —অর্থাৎ ইহাতে নিছক সাময়িক উপন্যাসের চেয়ে কিছু বেশি আছে।

সিসি, লিসি, কেটি ও নরেন মিটারের যে বর্ণনা আছে, তাহাদের সমাজের যে চিত্র আছে, এমন বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও দেখি নাই। এই সমাজের জীবনযাত্রা রবীন্দ্রনাথের এমন করায়ত্ত যে, এক এক সময়ে দুঃখ হয়, কেন তিনি আরও বেশি করিয়া ইহাকে কাজে লাগান নাই।

কিন্তু ইহা Novel of Manners-এর চেয়েও কিছু বেশি; ইহার আরম্ভ 'স্যাটায়ারে', পরিণাম—ফিলজফিতে; আরও বেশি এইজন্য যে, ইহা কেবল সমাজের খোলসটার বর্ণনায় কর্তব্য শেষ করে নাই; ব্যক্তির অন্তরের বেদনাও টানিয়া বাহির করিয়াছে।

কেটির "এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দর দর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।"

এ দৃশ্য ভুলিবার নয়। আর এই ছবিটি দেখিয়াছিলাম বলিয়াই কেটিকে বিবাহ করায় অমিত রায়কে ক্ষমা করিতে পারি।

৯

নিবারণ চক্রবর্তীর বলিয়া যে কবিতাগুলি কবি চালাইয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা সুচতুর তীক্ষ্ণ শ্লেষ আছে।

অমিত বলে—নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতা রবীন্দ্রনাথের মতো নয় —সেইজন্যই সে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উক্ত কবিকে খাড়া করিয়াছে।

কিন্তু কবি-শিখণ্ডীর কবিতা পড়িলেই বুঝা যায়, ভাবে ভাষায় ছন্দঃস্পন্দে ফিলজফিতে এগুলি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ লিখিতে পারিত না। অর্থাৎ, রবীন্দ্র-প্রতিদ্বন্দ্বী নিবারণ চক্রবর্তী অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিধ্বনি।

এ যুগে যে-সব নিবারণ চক্রবর্তী আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই এই তীক্ষ্ণ শ্লেষের নিক্ষেপ। তাহারা এমনই কৃপার পাত্র যে, জানেও না তাহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি মাত্র। তাহারা রবীন্দ্রনাথেরই হাতের গড়া পুতুল তাঁহার কাছে নিজের বলিয়া বেচিতে আসিয়া গর্ববোধ করিতেছে। কৌতুক অনুভব করা ছাড়া কবির আর কি গত্যন্তর আছে! নিবারণ চক্রবর্তীর আবির্ভাব সেই কৌতুকের প্রকাশ। *

* এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতিগুলি 'জীবনস্মৃতি' ১ম সংস্করণ, ১৩১৯ এবং 'শেষের কবিতা' ১ম সংস্করণ, ১৩৩৬ হইতে সংগৃহীত।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র

রবীন্দ্র-বনস্পতির পত্র-প্রাচুর্য বিপুল। বাংলা ও ইংরেজীতে এ পর্যন্ত তিনি কত যে চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বাংলা চিঠিপত্র এখনও সব সংগৃহীত হয় নাই—মাত্র তিনখানি মাঝারি আকারের গ্রন্থে কিছু মুদ্রিত হইয়াছে। পত্র-লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়; তিনি একেবারে একক।

মাইকেল মধুসূদনের বহু চিঠিপত্র আছে; সেগুলিতে মাইকেলের মনোজীবনের গতিবিধি ও বিকাশ প্রতিফলিত; কবিকে বুঝিবার পক্ষে তাঁহার এই চিঠিপত্রগুলি অপরিহার্য; এই সব চিঠির মধ্যে কবি নিজেই নিজের জীবনের ও সাহিত্যের টীকা করিয়া গিয়াছেন; বাঙালী সমালোচকগণ এখনও এসব চিঠিপত্রের যথার্থ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে সমস্তই ইংরেজীতে, কাজেই বাংলা ভাষার আলোচনা হইতে স্বভাবতই সেগুলি বাদ পড়িয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক গুণবিশিষ্ট চিঠিপত্র আছে কিনা জানি না—অন্তত আমি তো দেখি নাই।

ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, বাঙালী প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নিঃসঙ্গ শ্রেষ্ঠ। এই অদ্বিতীয়ত্ব তাঁহার চিঠিপত্রগুলিকে দ্বিগুণ লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

এ পর্যন্ত তিনখানি পত্রসমষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমখানি ছিন্নপত্র, দ্বিতীয়খানি ভানুসিংহের পত্রাবলী, শেষতমখানির নাম পথে ও পথের প্রান্তে।

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলির রচনার কাল ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৫, অর্থাৎ কবির চব্বিশ হইতে চৌত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এগুলি লিখিত। ভানুসিংহের পত্রাবলী ১৯১৭ হইতে ১৯২৪ সালের মধ্যে লিখিত, তখন কবির বয়স ছাপ্পান্ন-তেষট্টির কোঠায়। আর, পথে ও পথের

প্রান্তের কতক চিঠি ১৯২৬ সালে ইউরোপ হইতে ফিরিবার পথে লিখিত; বাকিগুলি পরবর্তী দীর্ঘকালের মধ্যে ছড়ানো, শেষখানির তারিখ দেখিতেছি ১৩৪৫ সালের জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজী ১৯৩৮ সাল—এই পত্রধারার আরম্ভে কবির বয়স ছিল পঁয়ষট্টি, শেষ করিবার সময়ে তাঁহার বয়স সাতাত্তর। ভানুসিংহের পত্রাবলী এবং পথে ও পথের প্রান্তের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ নয়; একখানির শেষ ১৯২৪-এ, অপরখানির প্রারম্ভ ১৯২৬-এ; ছিন্নপত্র ও ভানুসিংহের পত্রাবলীর মধ্যে সময়ের ও কবিজীবনের ইতিহাসের অনুল্লঙ্ঘ্য একটা ছেদ আছে; বাইশ বছরের সুদীর্ঘ ব্যবধান।

পথে ও পথের প্রান্তের স্বল্পকায় ভূমিকায় কবি পত্রধারা পর্যায়ের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, আগে তাহা শোনা যাক্।

" 'ছিন্নপত্র' পর্যায়ে যে চিঠির টুক্‌রোগুলি ছাপানো হয়েছে তার অধিকাংশই আমার ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা চিঠির থেকে নেওয়া। তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, আমার পথচলা মনে সেই সকল গ্রামদৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল; তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে। কথা কওয়ার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ যায় খুলে। যে বকুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেঁকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে তার স্বাদের বদল হয়। চারিদিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই, লাউড স্পীকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাস্ট করা সয় না। ভিড়ের আড়ালে চেনা লোকের মোকাবিলাতেই তার সহজরূপ রক্ষা হতে পারে।

"পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের (ভানুসিংহের পত্রাবলী) চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে

চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ কিছু নেই, হাসি তামাসায় মিশে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস; আর তারি সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হাল্‌কা মনে আটপৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোন শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।

"পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'পথে ও পথের প্রান্তে'। তার একটু ইতিহাস আছে। সেবার যখন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম, সেখানকার নানা দেশে আমার ডাক পড়েছিল। * * * অবশেষে য়ুরোপ ভ্রমণের পালা শেষ করে যখন আমরা গ্রীসের বন্দর থেকে ঘরমুখো জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম তাঁরা (শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ ও তাঁহার পত্নী) রয়ে গেলেন বিদেশে। তখন তাঁদের সাহচর্যে-গাঁথা পথ-যাত্রার ছিন্নসূত্রকে যেসব চিঠির দ্বারা জুড়তে জুড়তে চলেছিলুম দেশের দিকে, সেইগুলি ও তার পরবর্তীকালের চিঠিগুলি পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ে সঙ্কলিত হ'ল। কিছুকাল ধরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্ক-বিতর্ক আলোচনা চলেছিল তারই বাক্যালাপের বেগ এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশি।" [১]

এগুলি ছাড়া আর দুইখানি বই পত্র নামে চলিয়া থাকে; —রাশিয়ার চিঠি ও য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র। রাশিয়ার চিঠি, চিঠির ছদ্মবেশে প্রবন্ধ মাত্র, বইখানা নামেই চিঠি; পত্র-সাহিত্যের গুণ তাহাতে নাই। আর য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে যদিও সে গুণ রাশিয়ার চিঠির চেয়ে অধিক, তবু তাহাকে পত্র না বলিয়া

১ পথে ও পথের প্রান্তে—ভূমিকা ৵০—।০

প্রবন্ধজাতীয় কোন রচনা মনে করা উচিত; বোধ হয় সেইজন্যই সম্প্রতি রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রথম খণ্ডে বইখানাকে প্রবন্ধ পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে।

এখন রবীন্দ্রনাথের পত্র লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিবার পূর্বে সে সম্বন্ধে আমার ধারণা কি প্রকাশ করিব—পরে, অর্থাৎ যথাস্থানে, তাহা তথ্যের সঙ্গে মিলাইয়া লইলেই চলিবে।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব সম্পদ—একথা আগেই বলিয়াছি; ইহাদের সাহিত্যিক গুণ এত প্রত্যক্ষ যে, যে কোন পাঠক তাহা ধরিতে পারে; ব্যক্তিনিরপেক্ষ গভীর তত্ত্ব ও ব্যক্তি-নির্ভর ভালোমন্দ-লাগা পাশাপাশি মিশ্রিত; কবির মনের অগ্রগতির চিহ্ন বলিয়া ফিলজফির টুকরা ইহাতে এমনভাবে ছড়ানো যে, মনোযোগী পাঠকের পক্ষে কবিকে অনুসন্ধান করিবার ইহা প্রধান পন্থা; আর নিছক রচনাচাতুর্যের নমুনা হিসাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যেও এগুলির প্রথম স্থান।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাতে প্রতিভার প্রকাশের একটা অদ্ভুত সমতা দেখা যায়; কোন একটা রচনা আব একটার চেয়ে অনেক বেশি ভালো—বা কোন একটা অপরটি অপেক্ষা অনেক বেশি খারাপ—এমন বলিবাব উপায় নাই। তাঁহার চিঠিপত্র সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ইহার চেয়ে অনেক কম লিখিলে তিনি অনেক বেশি পঠিত হইতেন; পাঠকে অনেক বেশি পছন্দ করিত; সাহিত্যিক প্রেরণার দুর্জয় বেগ অতিরচনের ব্যাপকতার মধ্যে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে, ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যের আকাশে যে পরিমাণে নীহারিকা আছে সে পরিমাণে নক্ষত্র নাই' শিল্পসৃষ্টির এই অতিব্যাপ্তিকে যদি নীহারিকা-দোষ বলা যায় তবে সে দোষ রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মতো চিঠিপত্রেও আছে; কিন্তু ইহাদের সব চেয়ে বড় দোষ, সবগুলির নয়, অনেকগুলির, এমন কি অধিকাংশের এই যে, পত্র-সাহিত্যের যে বিশিষ্ট গুণ তাহা এগুলিতে নাই—অতিশয় বিরল।

রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অচেতন নহেন। একখানি চিঠিতে তিনি লিখিতেছেন—"আমার চিঠিগুলো চিঠি নয় এই তর্ক উঠেছে। আমি নিজে অনেকবার স্বীকার করেছি যে, আমি চিঠি লিখতে পারিনে। এটা গর্ব করবার কথা নয়। আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে কেবল যে চিন্তা করবার কিংবা কল্পনা করবার বিষয় আছে তা নয়। সেখানকার অনেকটা অংশই ঘটনার ধারা—অন্তত যেটা আমাদের চোখে পড়ে, সেটা একটা ব্যাপার ; সে কেবল হচ্ছে, চলছে আসছে, যাচ্ছে ; অস্তিত্বের সদব রাস্তা দিয়ে চলাচল, তার ভিতরকার সব আসল খবর আমাদের নজরে পড়ে না। * * (কিন্তু) সমস্তই আমাদের চোখে হালকা হয়ে ঘটনাপ্রবাহ আকারে দেখা দিচ্ছে। অনেক মানুষ আছে যারা এই জানালার ধারে বসে যা দেখে তাতে এক রকমের আনন্দ পায়। যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে লেখে, আলাপ করে যায় ; তার কোনো ভাব নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। * * ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা ক'জন লোকের দেখা যায়। * * যদি মনে না করো আমি অহঙ্কার করছি তা হলে সত্য কথা বলি, অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখতে পারতুম, যা-তা নিয়ে। মনের সেই হালকা চাল অনেকদিন থেকে চলে গেছে, এখন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিন্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই—দাঁড় বেয়ে চলিনে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক, একে চিঠি বলে না। পৃথিবীতে যারা চিঠি লেখায় যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে দু'চার জনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে।" [১]

এই চিঠিখানি মনে রাখিতে হইবে—কারণ ইহারই সূত্র ধরিয়া

১ পথে ও পথের প্রান্তে ৮৮-৯০

অন্যান্য চিঠিপত্রের আলোচনায় অগ্রসর হইবে; কিন্তু তার আগে আলোচ্য গ্রন্থ তিনখানি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর করিয়া লওয়া যাক্।

পত্রসাহিত্যের গুণের বিচারে প্রথম ধাপে ছিন্নপত্র, দ্বিতীয় ধাপে —সে-ধাপ প্রথমটার কাছেই—ভানুসিংহের পত্রাবলী; তৃতীয় ধাপে পথে ও পথের প্রান্তে। কেবল এই তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে নয়, এই তিনখানির নির্দেশে কবির অপ্রকাশিত চিঠিপত্র সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, কবির যৌবনে লিখিত চিঠিপত্র, পৌঢ়বয়স ও বার্ধক্যের চিঠিপত্রের চেয়ে, আর কিছুতে না হোক, পত্রসাহিত্যের গুণে উচ্চতর শ্রেণীর। এই সীমানা কবির চল্লিশ বৎসর বয়সে টানা যাইতে পারে। এই চল্লিশ বৎসরের চিহ্নটা কবিব জীবনের প্রধান একটা watershed; ইহার ছ'দিকের চেহারা দুইরকমের; দু'দিকের কাব্য দুই-বকমের; দু'দিকের জীবনাদর্শ দুই রকমের, দু'দিকের উপন্যাস-গল্প দুইরকমের; দু'দিকের চিঠিপত্রেও অবশ্য প্রভেদ ঘটিয়াছে।

ছিন্নপত্র লিখিবার সময়ে কবি পরবর্তী জীবনের খ্যাতি নিশ্চয় কল্পনা করিতে পারেন নাই; তাঁহার তুচ্ছতম চিঠিখানি পর্যন্ত যে মুদ্রিত হইবে, লোকে আগ্রহে পড়িবে এমন কথা নিশ্চয় ভাবেন নাই, এই চিঠিগুলিও যে ছাপা হইবে এমন নিশ্চয়তা হয়তো ছিল না। কাজেই কেবল যাহাকে লিখিতেছেন তাহার বিনোদনের জন্য প্রধানত এগুলি লিখিত হইয়াছিল; সাধারণ পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টির আড়ালে ফুটিয়া ওঠাতে সহজবসে এগুলি পূর্ণ। "ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।"

ভানুসিংহের পত্রাবলী লিখিবার সময়ে কবি বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন; অনধিকারীর কৌতূহলী দৃষ্টিকে এড়াইয়া কিছু লিখিবার বা বলিবার সত্যযুগ তাঁহার জীবনে বহুকাল হইল চলিয়া গিয়াছে, তৎসত্ত্বেও এ চিঠিপত্রগুলিতে সহজরস আছে, লেখক ও গ্রাহকের দ্বৈত হৃদয়ের আনাগোনার চিহ্ন আছে, তার প্রধান কারণ এ চিঠিগুলি অতি অল্প বয়সের একটি বালিকাকে লিখিত; বালিকাটির বয়স হয়তো

তখন চোদ্দর বেশি ছিল না, কাজেই কবিকে সর্বদা বাধ্য হইয়া নিজেকে খাটো করিয়া চলিতে হইয়াছে; বালিকাটির পায়ের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে হইয়াছে; বালিকাটির মনের ঢেউয়ের সঙ্গে কলমের গতির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে হইয়াছে; পরবর্তী কালের অধিকাংশ চিঠিপত্রে যেমন ঘটিয়াছে, ঘটনার কাছে আসিয়া অকস্মাৎ দুরূহ তত্ত্বের আকাশে তির্যক্‌গতিতে পলায়ন করিতে পারেন নাই।

পথে ও পথের প্রান্তে লিখিবার সময় তেমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না; পত্রের গ্রাহিকা বিদুষী ও প্রাপ্তবয়স্কা, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সাধারণ পাঠকসমাজের জন্য এগুলি লিখিত। অথবা, এসব চিঠিতে কবির এক চোখ গ্রাহিকার দিকে অপর চোখ সাধারণ পাঠকের দিকে; যেন এখানে সাধারণ পাঠকই লক্ষ্য, গ্রাহিকা উপলক্ষ্য মাত্র। এই রকম দুই নৌকায় চড়িয়া পত্র লিখিতে গেলে ফাঁক দিয়া সহজরস পলায়ন করে। উচ্চশ্রেণীর চিঠিপত্র কথোপকথন ও রীতিমত প্রবন্ধের মাঝামাঝি একটা জিনিস; পথে ও পথের প্রান্তে সে-জাতীয় রচনা নয়; উহা সরব চিন্তা মাত্র; ইহা গ্রাহকের কাছে লেখকের নয়, লেখকের কাছে লেখকের স্বগত উক্তি। ইহা 'চিন্তা করতে করতে কথা বলা'—ইহা জাল ফেলিয়া নিজেকে নিজের ধরিবার চেষ্টা মাত্র।

এইমাত্র রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিখানি উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে আছে—"পৃথিবীতে যারা চিঠি লেখায় যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে দু'চার জনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে।"

কথাটি খুব সত্য। যশস্বীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, সাধারণত মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে ভালো চিঠি লেখে। তার কারণ এই যে, মেয়েদের মন তথ্যের জগতের মন; তথ্যের জগৎকে অতিক্রম করিয়া তাদের মন বেশীদূর উঠিতে পারে না; পুরুষের মনে অতি সহজে তথ্যকে অতিক্রম করিয়া যাইবার একটা প্রবণতা আছে। নারীমনকে তথ্যের দাস বলা যাইতে পারে—

ঘটনা-প্রবাহকে বেশিক্ষণ ভুলিয়া থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়; পুরুষমন তথ্যের প্রভু, ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অচেতন হইতে পারিলেই যেন সে আনন্দ পায়।

ইহা যদি সত্য হয়, আর ঘটনাপ্রবাহকে প্রতিফলিত করাই যদি পত্রসাহিত্যের প্রধান গুণ হয়, তবে মেয়েরা যে সাধারণত পুরুষের চেয়ে ভালো চিঠি লিখিবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

এই সঙ্গে প্রসঙ্গত আর একটা ব্যাপাব আসিয়া পড়ে। ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার অর্থ এই যে, পত্র-লেখককে গ্রাহকের সঙ্গে পা মিলাইয়া চলিতে হইবে। লেখক ও গ্রাহকের যুগলমন পত্রসাহিত্যের অক্ষরেখায় গ্রথিত হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। লেখকের মন যত বড় মাপের হোক না কেন, চিঠি লিখিবাব সময়ে তাহাকে গ্রাহকের মনের মাপে পরিণত করিতে হইবে। শুধু আকৃতিতে বিভিন্ন হওয়া নয়, গ্রাহকের মনের প্রকৃতি অনুসারে তাকে বদ্‌লাইতে হইবে। পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহকের মনের আকৃতি ও প্রকৃতিকে অনুসরণ করিতে হইবে পত্রলেখককে।

এইবাবে রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে সাধারণ একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় কোথায় যেন একটা দুর্বলতা আছে যাহাতে রূঢ় তথ্যেব ভাব তিনি সহ্য করিতে পারেন না; কিছুক্ষণ তথ্যের জগতে বিচরণ করিলেই তাঁহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়—তাঁহাব মন তথ্যসংস্পর্শবিমুক্ত সত্যের আকাশে ছুটিয়া চলিয়া যায়। ইহাকে আমি প্রতিভার দুর্বলতা বলিলাম —তাহা না বলিয়া ইহাই রবীন্দ্রপ্রতিভার ধর্ম বলিলে যথার্থ হইত।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একেবাবে অচেতন নহেন। একখানা চিঠিতে তিনি লিখিতেছেন—"আমি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক-জাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী।

আর ভালোবাসাটা লৌকিক-জাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে শেলির স্কাইলার্ক আর একটা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক; একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করছে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালোবাসে সে অভাবদুঃখজড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষেব মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ, যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে।"[১]

সত্য কথা, "মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ, যে যেটা অধিক ক'বে অনুভব করে।" রবীন্দ্রনাথের রচনাব সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ণতাকে অধিক করিয়া অনুভব করেন। তাঁর মন শেলিব স্কাইলার্ক, প্রথম সুযোগেই যে সংসারের ধূলিজালকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তথ্যভারমুক্ত সত্যের আকাশে ছুটিয়া গিয়া অনন্ত সুধার কাতর প্রার্থনায় দিগ্‌মণ্ডলকে ব্যাকুল কবিতে থাকে। এদিক দিয়া শেলির প্রতিভার সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রতিভার অদ্ভুত ঐক্য আছে: দুজনেরই মানুষকে জানিবাব, বুঝিবাব, 'সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ' মানবসমাজেব মধ্যে তাহাদেব একজন হইয়া বাস করিবার প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু কোথায় কোন্ অভিশাপ আছে যার ফলে খণ্ড ক্ষুদ্র দোষত্রুটিসঙ্কুল মানুষকে ভালোবাসিবার পক্ষে যে অগাধ ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক, তাহা ইঁহাদের মধ্যে নাই। তথ্যভারপীড়িত কবিগণ সংসারের কাছে আসিয়া সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ প্রবল আকাঙ্ক্ষার টানে তির্যক্ গতিতে আদর্শলোকের দিকে চলিয়া যায়।

ভালোবাসা ও সৌন্দর্য-আকাঙ্ক্ষার এই দ্বৈতলীলা সোনার তবী কাব্যে বড় সুন্দর ভাবে আছে। এই কাব্যের প্রথম কবিতা সোনার

১ সবুজপত্র. ১৩২৪, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ২৩৭-৩৯

তরী—ইহাতে ভালোবাসার টান, মানুষের সংসারের প্রতি প্রেমের আকর্ষণ, যে-আকর্ষণে কবির জীবনের সোনার ধান মানবসমাজমুখী নৌকায় তিনি তুলিয়া দিতে চান। আর এই কাব্যের শেষতম কবিতাটি নিরুদ্দেশ যাত্রা—তাহাতে সৌন্দর্যলোকের আকর্ষণ—যে-আকর্ষণ তাঁহাকে মানবের সংসার হইতে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের দিকে ভুলাইয়া লইয়া গেল। একটি কবিতাকে প্রারম্ভে ও অপরটিকে অন্তে স্থান দিয়া কবি কি দ্বৈত আকর্ষণের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে চান নাই? নিরুদ্দেশ যাত্রার এই নাবিকা রবীন্দ্রনাথের পত্রোল্লিখিত সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা-পরিপূর্ণতার সে প্রয়াসী, অনন্ত তার তৃষ্ণা। এই মনোহারিণী নাবিকা রবীন্দ্রকাব্যের Fatal woman—সংসারের বাহুপাশ হইতে যে বারংবার কবিকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে; 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ভালোবাসার আকর্ষণে মানুষের সংসারের কাছে আসিয়া এই Fatal woman-এর আকর্ষণে কবি অকস্মাৎ সঙ্গীতলোকে চলিয়া গেলেন—এবং সেখান হইতে শেলির স্কাইলার্কের মতো সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই জাতীয় প্রতিভাতে মানুষকে ভালোবাসিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল—কিন্তু নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর; "অসম্পূর্ণ Real" অপেক্ষা "পরিপূর্ণ Ideal"-এর আকর্ষণ অধিকতর; তথ্যের জগতে পাদচারণা অপেক্ষা আদর্শের আকাশে পক্ষচারণাতে আনন্দ অধিকতর; তথ্যের জগতে ও সত্যের জগতে, রবীন্দ্রনাথ যাহাকে Real ও Ideal বলিয়াছেন, সমন্বয় সাধন করিতে পারে না বলিয়া এই জাতীয় প্রতিভাতে বরাবর একটা চঞ্চলতা ও বিদ্রোহের ভাব পরিলক্ষিত হয়—ইহাই রবীন্দ্রপ্রতিভার সাধারণ ধর্ম; তাঁহার কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি প্রত্যেক রচনাতে ইহার পরিচয় আছে—এবং চিঠিপত্রেও আছে।

আগেই বলিয়াছি, আর কবিও স্বীকার করিয়াছেন, চিঠিপত্র

তথ্যের জগতের রচনা—তাহার প্রধান রস তথ্যজগতের সংবাদ; শুধু তা-ই নয়, লেখকের মনকে গ্রাহকের মনের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়; গ্রাহকের ব্যক্তিত্বের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বকে কিছুক্ষণের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে হয়; অথবা, নিজের সত্তাকে পাদপীঠে পরিণত করিয়া তাহার উপরে গ্রাহককে দাঁড় করাইয়া দিতে হইবে। তথ্যভারে যাঁহাদের মন অতি সহজে পীড়িত হয়, তাঁহাদের কাছে এ কাজ অতিশয় দুরূহ : রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কাজ দুরূহ কি না জানি না—কিন্তু অত্যন্ত পীড়াদায়ক। সম্পূর্ণ-দুরূহ এইজন্য নয় যে, ইচ্ছা করিলে পত্র-সাহিত্যের বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন চিঠি তিনি লিখিতে পারেন, কিন্তু এই ইচ্ছা তাঁহার কবি-প্রকৃতির অনুকূল নহে। চিঠি লিখিতে লিখিতে কখন যে তাঁহার কলম নিজের অজ্ঞাতসারে তথ্যজগৎ অতিক্রম করিয়া যায়, নিজেই তাহা যেন বুঝিতে পারেন না।

কবি-প্রকৃতির মধ্যে অসম্পূর্ণ Real ও সম্পূর্ণ Ideal-এর যে দ্বন্দ্বের কথা বলিলাম, যাহার অস্তিত্ব একখানি পত্রে কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—এই দ্বন্দ্বের পরিমাপে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র-গুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়--

(ক) সেইসব মুষ্টিমেয় চিঠিপত্র, যাহাতে সত্যকার পত্রসাহিত্যের রস আছে।

(খ) সেইসব সংখ্যায় অধিকতর চিঠিপত্র যাহাতে কবির কলম সত্যকার পত্র-সাহিত্য রচনা করিতে করিতে কবি-প্রকৃতির ইঙ্গিতে পত্রসাহিত্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

(গ) সেইসব চিঠিপত্র, আদৌ যাহাতে যথার্থ পত্রসাহিত্যের গুণ নাই। ইহাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয়—অন্তত আমি তাহাই মনে করি,—তবে আমার কাজ অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিয়াছে। এখন কবির চিঠিপত্র হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিয়া আমার বক্তব্য সবাস্তব করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

৩

প্রথম শ্রেণীর চিঠিপত্র ছিন্নপত্রে ও ভানুসিংহের পত্রাবলীতে প্রচুর—এত বেশি যে এক আধখানা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার কোন অর্থ হয় না; যে কোন মনোযোগী পাঠক বই খুলিলেই দেখিতে পাইবেন; অমনোযোগী পাঠকের পক্ষেও এড়াইয়া যাওয়া কঠিন।

কিন্তু 'পথে ও পথের প্রান্তে'র চিঠিপত্রে এই জাতীয় চিঠি একান্ত বিরল; সত্য কথা বলিতে কি, এ জাতীয় একখানা গোটা চিঠি পাইলাম না,—কেবল এখানে-সেখানে দু'চার ছত্র যার সঙ্গে তথ্যজগতের কোন রকম সম্বন্ধ আছে। "* * ইতিমধ্যে আমাব শনিগ্রহ একদিন রাত্রি দুটোর সময় আমাকে তলব করলেন। তখন বিছানায় শুয়ে ছিলুম। হঠাৎ একটা তীব্র শীতের হাওয়া হু হু করে এসে আমাকে চঞ্চল কবে তুললে। শিওরের কাছের দরজাটা প্রবলবেগে বন্ধ করবার চেষ্টা কবতে গিয়ে দরজাটা আমার ডান হাতের মধ্যে অঙ্গুলিব উপব পড়ে তাকে পেষণ করে ফেললে। ঐ মধ্য অঙ্গুলিটিই শিশুকাল থেকে হেঁট হয়ে আমাব লেখনীর ভার বহন কবে এসেছে। আমাব সাহিত্য ইন্দ্রের দুটি বাহন, একটি হচ্ছে বুড়ো আঙুল, সে হ'লো ঐরাবত; আবেকটি ঐ মধ্যমিক ত কে বলা যায উচ্চৈঃশ্রবা; সে খুবই জখম হযেছে।

নখটা তার কর্মে ইস্তফা দিয়েও তবু নড়বড়ে অবস্থায় লেগে রইলো। সে সম্পূর্ণ পদত্যাগ করলে আমি নিষ্কৃতি পাই। যাই হোক রচনার কাজটা এখন দুঃখসাধ্য। লেখার বিষয়টা যাই হোক তার লাইনে লাইনে আমার এই খোঁড়া আঙুলটা করুণ রস সঞ্চার করছে।* *" [১]

চিঠির বিষয়টা অত্যন্ত তুচ্ছ; পত্রসাহিত্যে তুচ্ছ বিষয় প্রধান

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্রসংখ্যা ১১; ৩০-৩ পৃঃ

অবলম্বন—অবহেলার বস্তু নয়; বস্তুত পত্রসাহিত্য তুচ্ছ বিষয়ের রাজসিংহাসন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উল্লেখ করিবার আগে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। ছিন্নপত্রের প্রথম দিকের অধিকাংশ চিঠিতেই পত্র-সাহিত্যের বিশিষ্ট রস আছে—শেষের দিকের অধিকাংশ চিঠিতে এই রস বিরল; হঠাৎ কবির মনে ইতিমধ্যেই একটা পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; যে-পরিবর্তনের ফলে কবির চিঠিপত্রে এই রসের তারতম্য ঘটিয়াছে। আর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র যেমন ছিন্নপত্র, তেমন পরবর্তী দুইখানি পত্রগ্রন্থ নয়; কারণ ছিন্নপত্রে আছে কবির মনেব দীর্ঘকালের ইতিহাস; আর রসের ওই কয়েকটি ধাপ কবির মনের পরিণতির সময়; পরবর্তী চিঠিপত্রের তলে আছে কবির পরিণত মন; তাহাতে ফলের পূর্ণতার স্বাদ আছে কিন্তু ফলের ক্রমবিকাশের রহস্য নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি চিঠির নমুনা ভানুসিংহের পত্রাবলী হইতে তুলিয়া দিতেছি।[১] চিঠির প্রারম্ভ দেখিয়া মনে হয় কবি সত্যকার পত্র রচনা করিতে বসিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে আসিয়া দেখা গেল তথ্যের জগৎ ছাড়িয়া তাঁহার লেখনী আত্ম-বিনোদনের ঊর্ধ্বাকাশে কখন চলিয়া গিয়াছে।—

"এইমাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁছেছি। আজ রাত্রে কলম্বো রওনা হবো। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহমন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকেচুরে গিয়েছিলো; ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম।"

এই পর্যন্ত এক ধরনের; ইহাতে লেখকের মনের সঙ্গে গ্রাহকের মনের যোগরক্ষার চেষ্টা আছে—আর পত্রসাহিত্যের প্রধান সংবাদ যে তথ্যজগতের সংবাদ, তাহা তো কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; পত্রসাহিত্য অপরের বিনোদনের জন্য লিখিত।

১ চিঠির সংখ্যা, ৫৪

এবারে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ :—

"গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলছিলো তখন মনে হচ্ছিলো যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্ছি। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবনপাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃতরস ঢেলে দিত; কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতোই আমার বাঁশি হাতে বিহার করতুম।"

এই ভাবের কথাতেই দীর্ঘ চিঠিখানা শেষ হইয়াছে। রচনা হিসাবে, কবির মনের ইতিহাস হিসাবে—চিঠিখানি অমূল্য, কিন্তু ইহা যথার্থ পত্রসাহিত্য নহে; এখানে গ্রাহকের মনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা নাই; ইহা নিজের সহিত নিজের সংলাপ; ইহার উদ্দেশ্য আত্মবিনোদন, অপরকে বিনোদন নয়; ইহাতে তথ্যজগতের কোন সংবাদ নাই—মনোজগতের কথায় ইহা পূর্ণ।

প্রথম প্যারাগ্রাফে তথ্যজগতের কিছু সংবাদ ছিল বটে, কিন্তু তাহাকে তাড়াতাড়ি এড়াইয়া গিয়া মনোজগতে প্রবেশের জন্য একটা ব্যাকুলতা লক্ষিত হয়; রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাস্তবের রূঢ় বাধাকে বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারে না, অল্পেই ব্যথিত হইয়া উঠে।

এবারে তৃতীয় শ্রেণীর পত্রের নমুনা তুলিয়া দিতেছি। ইহাতে তথ্যজগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবার চেষ্টা নাই—গ্রাহক একজন হয় তো আছে, কিন্তু না থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ বিশিষ্ট গ্রাহককে ইহা লিখিত নয়—ইহা যে-কোন লোককে লিখিত হইতে পারিত; এই জাতীয় রচনাকে চিঠিপত্র পর্যায়ে ফেলাই ভুল।

"আজ সকালে বিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে চমৎকার সূর্যোদয় হয়েছিল, ঈষৎ বাষ্পাবিষ্ট তার সকরুণ আলো এখানকার গাছপালা বাড়িঘর সব কিছুকে স্পর্শ করেছিল। এই তো চিরপূর্ণতার সুর, এই তো বিশ্বকে চিরনবীন করে রেখেছে—যত বড় আঘাত, যত নিবিড় কালিমাই জগতের গায়ে আঁচড় কাটতে থাকে তার কোনো

চিহ্নই থাকে না, পরিপূর্ণের শান্তি সমস্ত ক্ষয়কে অনিষ্টকে নিয়তই পূরণ ক'রে বিরাজ করে। * *" [১]

আবার—

"কাল অনেকদিন পরে সূর্যাস্তের পর ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি-অন্ত নেই, জলহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করছে, কোথাও দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় একপ্রান্তে সঙ্কীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে চলেছে; * *।" [২]

এক দুই পত্রখণ্ডকে পত্রসাহিত্য বলা নিরর্থক।

৪

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য বিষয় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি—এবং কি ভাবে এইসব চিঠিপত্র তাঁহার অন্যান্য রচনার সমগোত্রভুক্ত তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এদিক ছাড়াও অন্যান্য নানাদিক দিয়া তাঁহার চিঠিপত্রের আলোচনা চলিতে পারে; ইহাতে কবির মনের ইতিহাস আছে, ইহাতে কবির রচনার স্বকৃত টীকা আছে, ইহাতে তাঁহার ফিলজফির সচেতন ব্যাখ্যা আছে। এসব বিষয়ের আলোচনায় চিঠিপত্রগুলি অপরিহার্য। কিন্তু পত্রসাহিত্যের উৎকর্ষের আলোচনায় এগুলি নিতান্ত গৌণ; পত্রসাহিত্য সম্বন্ধে যাহা মুখ্য বক্তব্য, যাহা বুঝিলে কেবল চিঠি-পত্রগুলি নয়, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা বুঝিবার সুবিধা হইবে প্রধানত তাহাই এখানে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্রসংখ্যা ১৫

২ ছিন্নপত্র, পৃঃ ৩৪৯

রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস

বাল্মীকির রামায়ণের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রামচন্দ্র। রামায়ণে অনেক বৃহৎ ও বিচিত্র নরনারী-চরিত্র আছে সত্য, কিন্তু রাম-চরিত্র সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বাল্মীকির কল্পনায় তিনি আদর্শ মানব। আবার মহাভারতেও অনেক বৃহৎ ও বিচিত্র নরনারী আছে সত্য, কিন্তু কৃষ্ণ-চরিত্র সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কল্পনায় কৃষ্ণই আদর্শ মানব। ভারতবর্ষীয় কবিকল্পনা রাম ও কৃষ্ণের চরিত্রে তুঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে; আজ পর্যন্ত এ দুটি চরিত্রেই ভারতীয় কল্পনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। রামায়ণের রাম-চরিত্র একটি অম্লান শুভ্র রাজচ্ছত্রের ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষের মাথার উপরে বিস্তৃত থাকিয়া কত শোকতাপ নিবারণ করিতেছে! আবার কৃষ্ণ-চরিত্র সমগ্র ভারতখণ্ডের আকাশে কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের মতো চির-বিরাজমান থাকিয়া যুগে যুগে কত না রস বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে!

রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহা জানি তাঁহারা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির চেয়ে কম সত্য নহেন, বাস্তব সত্য এখানে কল্পনার সত্যের কাছে পরাজিত।

বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পরে কালিদাস ও তুলসীদাস আর দুইজন ভারতীয় মহাকবি। নানা কারণে পৌরাণিক যুগের কবিদের সহিত ঐতিহাসিক কালের কবিদের তুলনা করা সঙ্গত নয়। আর চরিত্রসৃষ্টিতেই যে কবিত্বের একমাত্র বিকাশ তাহাও নয়। এসব কথা মনে রাখিয়াও বলিতে পারা যায় যে, তাঁহারা কেহই পৌরাণিক কবিযুগলের কাছে ঘেঁষিতে পারেন নাই। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র উমা ও শকুন্তলা। তাহারা দুইজনেই অতিশয় কোমল ও স্পর্শকাতর, সূক্ষ্মশিরা তন্তুতে তাহাদের দেহ গঠিত; সীতা ও দ্রৌপদীর সুমহৎ বীর্যের অধিকারিণী তাহারা নয় কালিদাসের কালে নূতনতর সীতা বা দ্রৌপদী গড়া সম্ভব ছিল না, মানুষের মন অনেক সূক্ষ্মরসগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছিল। তুলসীদাসের রামচরিতমানসের রামের কল্পনা

বাল্মীকির কল্পনাশ্রিত, তাহাতে তুলসীদাসের মৌলিক কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নাই।

কালিদাস ও তুলসীদাসের পরে এ দেশে মহাকবির সন্ধান করিতে গেলে একেবারে রবীন্দ্রনাথে আসিয়া পড়িতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা বিশ্বস্পর্ধী—অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রাচীন কবিগণের সহিত সার্থকভাবে প্রতিস্পর্ধা করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও বলিতে হয় যে, তিনি রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মতো নিখিলমানবরসসম্পন্ন চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। খুব সম্ভব তাঁহার কালে তাহার সমর্থন ছিল না, খুব সম্ভব তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতি অন্যরূপ। আর আগেই তো বলিয়াছি যে, কবিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে মহৎ চরিত্র কল্পনার পথেই হইবে এমন কথা নাই।

রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সর্বব্যাপী ও সর্বরসের আধার, এবং এই দুটি গুণের ফলেই হাজার হাজার বছর ধরিয়া তাঁহারা এই মহাদেশোপম ভূখণ্ডের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছেন, আদর্শের তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করিতেছেন। এ দুটি চরিত্রের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতর জানি না; গান্ধীজী বলিবেন—রামচন্দ্র; বঙ্কিমচন্দ্র বলিবেন, শ্রীকৃষ্ণ। সে গূঢ় তর্কে প্রবেশ না করিয়াও অনায়াসে বলা যায় যে, মানুষের মনে পূর্ণ মানবের যে আদর্শ বিরাজিত এ দুটি চরিত্র প্রায় তাহার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে, পূর্ণমানবপরিকল্পনার মানুষ বোধ করি সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক কালে ভারতবর্ষে কত-না মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বুদ্ধ আছেন, অশোক আছেন, আরও কতজন আছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই মহাকবির লেখনীযোগে অমরত্ব লাভ করেন নাই, বাস্তব সত্যের বলেই অমর হইয়া রহিয়াছেন। রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ওকালতিতেই প্রমাণ হইয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে চালাইয়া দেওয়া

কত কঠিন। অন্তত কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু এখানেই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, তৎসত্ত্বেও সত্য, কারণ সত্য ইতিহাস-নিরপেক্ষ। 'রামজন্মের পূর্বে রামায়ণ-রচনা' প্রবাদে ইহারই সমর্থন। অর্থাৎ বাল্মীকি ও ব্যাস রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র অঙ্কনে বাস্তব সত্যের অনুসরণ করেন নাই, সুমহৎ কবিকল্পনার ইঙ্গিতের শরণ লইয়াছিলেন। কল্পনার সত্যকে তাঁহারা এমন ভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাহা বাস্তব সত্যের চেয়েও এমন অধিকতর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন লোকে তাঁহাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করে। আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কবি-কল্পনা যাহাকে সত্য মনে করে তাহাই সত্য, বাস্তব সত্য তাহার তুলনায় গৌণ। আরও একটি কথা, বাল্মীকি ও ব্যাস স্ব-স্ব কালে ঐরূপ এক-একটি পূর্ণমূর্তি সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন তাহা আর সম্যক্ বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাঁহাদের কালের তথ্যপবিবেশ এখন চিরকালের জন্য অবলুপ্ত; কেবল সত্য হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদের কালের বেদনা-সঞ্জাত ঐ মহামানবের চরিত্র দুটি।

এবারে বর্তমান প্রবন্ধে বিষয়ের প্রত্যক্ষ আসরে আসা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ব্যাস বা বাল্মীকির মতো সর্বব্যাপী ও সর্বরসাধার চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই সত্য, কিন্তু বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত এমন সব ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেগুলিকে একটি পবিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত করিলে একটি সুমহৎ চরিত্রের আভাস যেন পাওয়া যায়। কোন একটা ইঙ্গিত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কিন্তু সবগুলিকে পর পর বিন্যস্ত করিলে একটি অখণ্ড ধারণার সৃষ্টি করে। একটি ইঙ্গিত ও অপরটির মধ্যে অনেক সময়ে দীর্ঘ কালের ব্যবধান, কিন্তু তাহাতেই কি বুঝিতে পারা যায় না যে, চরিত্রের আদর্শটি একেবারে কবিকল্পনার

উৎস-মূলে আশ্রিত? আবার কোন ইঙ্গিতটিকেই সচেতন চরিত্রসৃষ্টিপ্রয়াস বলা যায় না। কিন্তু মহৎ কবিকল্পনা যে সচেতন প্রয়াস নয়, ইহা তো অত্যন্ত সুবিদিত।

কেন এমন হইল? প্রথম কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের কালের বেদনা তাঁহাকে একটি মহৎ আদর্শমানবের জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যাস ও বাল্মীকির সৃষ্টিপ্রয়াস সম্বন্ধে যাহা এখন আর জানিতে পারা যায় না, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রয়াস সম্বন্ধে তাহা জানিতে পাইতেছি: আমরা রবীন্দ্রনাথকেও জানি, আবার রবীন্দ্রনাথের কালকেও জানি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাস্তব সত্য অনেক সময়েই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবার আগেই কবিকল্পনার দর্পণে নিজেকে আভাসিত করিয়া তোলে—সেইজন্যই 'রামজন্মের পূর্বে রামায়ণরচনা' একেবারে অসম্ভব নয়।

এখন, এ দুটি কারণ স্মরণে রাখিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত পূর্বোক্ত ইঙ্গিতগুলিকে যদি পর পর কালানুক্রমে বিন্যাস করিয়া লই, তবে একটি মহামানবের আভাস চোখে পড়িবে। এবং সেই মহামানবের কাল্পনিক আভাসের সঙ্গে এ যুগের একজন মহামানবের বাস্তব রূপের অপ্রত্যাশিত সাদৃশ্য দেখিতে পাইব। সেই বাস্তব--মহামানব গান্ধী। গান্ধীর নামটিও জানিবার আগে রবীন্দ্রনাথ আভাসে গান্ধী-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। রামজন্মের পূর্বে আর একবার রামায়ণ লিখিত হইয়াছে, এবং এই দাবির বলে নবীন ভারতের মহর্ষিকবি প্রাচীন ভারতের কবি-মহর্ষিদ্বয়ের পাশে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

২

এবারে রবীন্দ্রসাহিত্যের গদ্য-পদ্য হইতে কতক উদ্ধার করিব। গান্ধীচরিত্র সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তিনিই ঐ সব অংশের সহিত গান্ধীচরিত্রের ঐক্য দেখিতে পাইবেন—সে ঐক্য এমনি প্রকট যে, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে না

এখানে বলিয়া রাখি, এখানে কেবল সেই দৃষ্টান্তগুলিই উদ্ধৃত হইবে যাহা লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর নামটি পর্যন্ত জানিতেন না; কেবল একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইবে, তখন তিনি নামটি জানিয়াছেন, কিন্তু তখনো মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখেন নাই। আর একটি কথা। গান্ধীজীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার পরে এই শ্রেণীর আভাস রবীন্দ্রসাহিত্যে আর পাওয়া যায় না, কেন যায় না বোঝা কঠিন নয়, আভাস তখন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, বাস্তবরূপে যে-মানুষ ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছে কবির লেখনী তখন তাহাকে দেখাইবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি লইয়াছে। আরও একটি কথা, এই সব ইঙ্গিত যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস, একথা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানিতেন না। জিজ্ঞাসিত হইলেও খুব সম্ভব অস্বীকার করিতেন। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না; কবিত্বের ব্যাখ্যায় কবিকে অস্বীকার করা অন্যায় নয়, বিবাহের আয়োজন ব্যাপারে বেচারা বরই সবচেয়ে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এসব ইঙ্গিত কবির সচেতন অভিপ্রায় নয় বলিয়াই এগুলির মূল্য সমধিক, একথা কিছুতেই ভোলা উচিত হইবে না।

প্রথম উদাহরণ:

মানসী কাব্যের অন্তর্গত গুরু গোবিন্দ কবিতাটি প্রথম উদাহরণ। রচনাকাল ১৮৮৫; গান্ধীজীর নাম তখন তাঁহার পরিবারের বাহিরে কে জানিত?

গুরু গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যদের কাছে নিজের সাধনোত্তর সার্থকতার কথা বলিতেছেন—

'আয়, আয়, আয়, ডাকিতেছে সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে
* * *

যত আগে চলি, বেড়ে যায় লোক
ভ'রে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

* * *

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ।

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু-পিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ
নাই তার কাছে জীবন মরণ
নাই, নাই আর কিছু।

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখ কতদূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দেবে ব'লে
আসে লোক কত শত।'

গুরু গোবিন্দ সিংহ মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই বলিবেন যে, এক্ষেত্রে কবিকল্পনা বাস্তব

সত্যকে অনেকদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আবার গান্ধীচরিত্রজ্ঞাতা পাঠককে বলিতে হইবে যে, এক্ষেত্রে বাস্তব সত্য কল্পনাকে পিছনে ফেলিয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। কবির বর্ণিত চিত্র গান্ধীচরিত্র ও গান্ধীকীর্তি সম্বন্ধে যেমন সত্য, এমন গুরু গোবিন্দ সম্বন্ধে নয়। বস্তুত কবির কাছে গুরু গোবিন্দ উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একজন মহামানবের চিত্র আঁকিতেছিলেন এবং সে অঙ্কনপ্রয়াসের মূলে ছিল তাঁহার কালের বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা।

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ'

ইহা গুরু গোবিন্দ সিংহের পক্ষে আকাঙ্ক্ষা, কবির পক্ষে কল্পনা, কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে ইহা বাস্তব সত্য, এবং তাহা আমাদের চোখের উপরেই এমন ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের আর কোন মহামানব নিজের জীবনকালে এমন সার্থক দাবি করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়াছিলাম যে, এ ক্ষেত্রে বাস্তব-সত্য কল্পনাকে ডিঙাইয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ

নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের ৬৩, ৬৫, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৭৭, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬ সংখ্যক চতুর্দশপদীগুলি। নৈবেদ্য গ্রন্থের প্রকাশ-কাল ১৯০১ সাল।

গুরু গোবিন্দ কবিতায় যাহা চিত্রাকারে এবং চরিত্রাকারে ব্যক্ত এখানে তাহা আইডিয়া বা ভাবাকারে প্রকাশিত। চিত্র বা চরিত্রের যে মূল্য দিতেছি, আইডিয়ার মূল্য এক্ষেত্রে তত নয়, কারণ আইডিয়া স্বভাবতই অনেকটা নির্গুণ; চিত্র যেমন রঙে রসে ভাবকে প্রকাশ করিতে সক্ষম, অপেক্ষাকৃত নির্গুণ আইডিয়া তেমন পারে না। তৎসত্ত্বেও বর্তমান প্রসঙ্গের মধ্যে এই কবিতাগুলিকে নিক্ষেপ করিয়া দেখিলে একটা বিশেষ অর্থ পাওয়া যায় এবং পরবর্তী কালে দৃষ্ট গান্ধী-চরিত্রের মহিমার একদিক উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

নূতন ভারতের জীবনাদর্শ, পাশ্চাত্ত্যের জীবনাদর্শের সঙ্গে কোথায় তাহার প্রভেদ, এবং লোভদ্বন্দ্বঈর্ষাসঙ্কুল বর্তমান পৃথিবীতে নূতন ভারত কর্তৃক আশার বাণী দান—ইহাই কবিতাগুলির মর্ম। এখন গান্ধীজীর কীর্তি ও বাণী নূতন ভারতকে যে প্রতিষ্ঠানভূমি দিয়াছে এবং পৃথিবীর চোখে ভারতকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া যদি কবিতাগুলি পড়ি, তবে মনে না হইয়া পারে না যে, বাস্তব সত্য রূপ পরিগ্রহ করিবার আগেই কবির কল্পনা যেন গান্ধী-বাণীকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্যের প্রতি আমাদের যে সূক্ষ্ম মোহ ছিল, গান্ধী যাহার প্রতি শেষ আঘাত হানিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলিতে যেন তাহার পূর্বাঘাত ধ্বনিত হইতেছে।

তৃতীয় উদাহরণ ঃ

"মনে হইতেছে, আমাদের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, যিনি ভারতবর্ষের সম্মুখে ভারতবর্ষের পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবেন, যিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে এই কথা ধ্বনিত করিয়া তুলিবেন যে, আমরা ভারতবাসী, আমরা ফিরিঙ্গি নই, আমরা বর্বর নই, আমাদের লজ্জার কোন কারণ নাই। যিনি ঘোষণা কবিবেন ভারতের কাম্য মুক্তি।" (১৯০২ সাল)

চতুর্থ উদাহরণ ঃ

এবার তিনটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি; প্রথম দুটি 'রাজা-প্রজা' গ্রন্থ হইতে, আর শেষেরটি 'স্বদেশ'-গ্রন্থ-ভুক্ত। দু'খানি গ্রন্থেরই প্রকাশকাল দেখিতেছি ১৯০৮ সাল; রচনাকালও খুব বেশি আগে নয়।

"শিখদিগের শেষ গুরু গোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানাজাতির নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি

আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সমস্ত দেশ অনিবার্য বেগে অন্ধকারে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহু যত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে, তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন **আমাদের চিরপরিচিত ভাষায়** আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হোক সহসা চৈতন্য হইবে, একদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা। আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজী কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে, মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোনো একটা বিশেষ আইন সংশোধন বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে, আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে আকর্ষণ করিতেছেন।" [১]

এখন এই অংশটিকে যদি নিতান্ত আক্ষরিকভাবে গ্রহণ না করি, তবে ইহা নিঃসংশয়ে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাসবর্ণনা-রূপে প্রতিভাত হইবে। কারণ তিনিই প্রথম সুদীর্ঘ আত্মপ্রস্তুতির পরে ভারতীয় সমাজকে 'চিরপরিচিত ভাষায়' আহ্বান করিলেন, আর তিনিই প্রথম আইন সংশোধন ও আইন সভার ভরসা পরিত্যাগ করিয়া দেশের

১ ইংরাজ ও ভারতবাসী, রাজা-প্রজা, প্রকাশকাল ১৯০৮ সাল।

দুর্গতির মূলে অনুপ্রবেশ করিলেন, ব্যাপকভাবে বুঝাইয়া দিলেন, প্রকৃত দুর্গতি মনুষ্যত্বের অভাবে।

এবারে আর একটি উদাহরণ :

“ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধন করিব যাহাতে শত্রুমিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়, যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্যে প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনোই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব।” [১]

এই ভাবটিই গান্ধীজী ভাষান্তরে বলিতে পারিতেন, কতবার বলিয়াছেন। মহাকবি যেন মহাযোগীর মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া আগেভাগে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

এবারে তৃতীয় উদাহরণটি উদ্ধৃত হইতেছে। এটি আগের দুটির চেয়ে অধিকতর অর্থসম্পন্ন। আগেব দুটি বাণী, এটি চিত্র ; আগের দুটি ভাব, এটি দেহী। এখানে কবি আশ্চর্য কৌশলে ভারতবর্ষ ও ভারতপুরুষকে সমরেখায় আঁকিয়াছেন, দেহ ও আত্মাকে সমবন্ধনে বাঁধিয়া মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

“আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না, তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্র রৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাসব্রতচারী ; তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনো

[১] পথ ও পাথেয়, রাজা-প্রজা।

জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি, তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিবে, ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে, যখন ঝড়ের গর্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজী বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডেব ঘর্ষণঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। সঙ্গহীন নিভৃতবাণী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাসসামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা কবিব না, এবং নিঃশব্দে তাহাব পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা কবিব।" ১

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত এই সন্ন্যাসী কে? ভারতবর্ষ, না গান্ধী? একাধারে দুই-ই। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত এই চিত্র কি ভাবতের দেহের না আত্মার? একাধারে দুয়েরই। ভারতবর্ষের আব কোন মহাপুরুষ এমনভাবে সমগ্র দেশের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে একাত্ম হইয়া যাইতে পারিয়াছেন কি? ত্রিশ বৎসরকাল গান্ধীই ছিল ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষই ছিল গান্ধী! কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই মানুষটিকে চর্মচক্ষে দেখিবার অনেক আগে মনশ্চক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া লইয়াছিলেন। ১৯০১ সালেও যেমন, ১৯০৮ সালেও তেমনি, গান্ধীজী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, তখন ছিলেন তিনি আত্মপ্রস্তুতির পথে এবং ভারতক্ষেত্রে প্রবেশেব

১ নববর্ষ, স্বদেশ, প্রকাশকাল ১৯০৮ সাল।

ভূমিকায়। পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীর চিত্র পড়িয়া যাহার গান্ধীজীর কথা মনে না হইবে তাহাকে বৃথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পঞ্চম উদাহরণ ঃ

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী।[১]

এই সময়কার অনেক প্রবন্ধাদিতে আমাদের মতের সমর্থক অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। সে সমস্তের বিস্তৃত উল্লেখ বাহুল্য, কৌতূহলী পাঠক পড়িয়া লইলেই দেখিতে পাইবেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর মন্ত্র অহিংসা ও অভয়। রাজার আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করিলে প্রকারান্তরে হিংসারই জয় হইয়া থাকে; ভয় না করিয়া আঘাতকে প্রেমের সহিত বহন করিলে আঘাতকারীর মনের পরিবর্তন হইয়া থাকে, এই শিক্ষাই ধনঞ্জয় বৈরাগী তাহার অনুচরদের শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহা স্পষ্টত গান্ধীজীর বাণীর পূর্বাভাস। ১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর বাণীর সহিত পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তখন এবং তাহার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী এই বাণীর প্রচার সুরু করিয়াছেন; দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় তিনি এই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মুক্তধারা নাটকেও[২] ধনঞ্জয় বৈরাগীর দেখা পাই। দুটি নাটকেই একই চরিত্র। তবু কিছু প্রভেদ আছে। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর শিক্ষার ঝোঁকটা অহিংসার প্রতি; মুক্তধারা নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর শিক্ষার ঝোঁকটা যন্ত্রের নিষ্ঠুরতাকে প্রাণের দ্বারা শোষণের প্রতি; মুক্তধারাতে অহিংসার বাণী আছে, তবে ঝোঁকটা স্থান কাল পাত্রের তাগিদে অন্যত্র পড়িয়াছে; ইহা স্পষ্টত গান্ধীজীর প্রভাবধর্মী। কিংবা বলা যাইতে পারে, এই চরিত্রটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ নিজেকে এবং গান্ধীজীকে রূপ দিয়াছেন; প্রায়শ্চিত্ত নাটক লিখিবার

১ প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রকাশকাল ১৯০৯ সাল।

২ প্রকাশ ১৯২২ সাল।

কালে গান্ধীজীকে জানিবার আগেই দিয়াছেন ইহা বিস্ময়কর। কিন্তু প্রতিভা সব সময়েই বিস্ময়ের আকর।

ষষ্ঠ উদাহরণ :

বলাকা কাব্যের "পাড়ি" নামক কবিতা। [১]

রবীন্দ্রনাথকৃত বলাকা কাব্যের ব্যাখ্যায় এই কবিতাটি যে ভাবেই ব্যাখ্যাত হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে ইহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে।

মত্ত সাগর পাড়ি দিয়া নেয়ে বা নাবিক আসিতেছে। তাহার 'নাইকো মাণিক, নাই রতনের হার,' শুধু 'একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার।' ধনী বা মানীর গৃহকে লক্ষ্য করিয়া নেয়ে আসিতেছে না; দীন, হীন, সর্বপরিত্যক্তের গৃহের উদ্দেশে নাবিক যাত্রা করিয়াছে। যখন নাবিক তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে—

বাজবে নাকো তূরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক পরশ পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে॥

রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানুসারে নেয়ে বা নাবিক যিনিই হোন, বর্তমান প্রসঙ্গের সূত্রে গ্রথিত হইয়া ইহার নূতন অর্থ মনে উদিত হয়, বিশেষ যখন জানিতে পারি যে ঠিক এই সময়েই গান্ধীজী শেষবারের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া লণ্ডনের পথে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। কবিতাটির রচনাকালে তিনি নেয়ের মতো হয় সমুদ্রে রহিয়াছেন, নয় কেবল লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। তিনি আমাদের জন্য ধনমানের বোঝা আনিতেছিলেন না; তাঁহার সঙ্গে ছিল একটি রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তাহা অহিংসায় শুভ্র, প্রেমে অম্লান এবং নিশীথান্ধকারের মধ্যে শ্বেতচন্দ্রের অভয় তিলক।

১ রচনাকাল ৫ই ভাদ্র, ১৩২১—আগস্ট, ১৯১৪ সাল।

এই কবিতাটি লিখিবার কালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে দেখেন নাই; কিন্তু উভয়ের পরিচয় ঘটিয়াছে। ইহার কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কবি এণ্ডরুজ ও পিয়ার্সন নামে দুইজন বন্ধুকে পাঠাইয়াছিলেন। মুখ্যত এণ্ডরুজের মাধ্যমেই দুজনে পরস্পরকে জানিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে যতগুলি অংশের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে কেবল এই কবিতাটি লিখিবার আগেই তিনি গান্ধীবাণীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই বর্তমান সূত্রে কবিতাটির মূল্য অত্যন্ত বেশি। তৎসত্ত্বেও আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি যে, এটি লিখিবার কালে কবির মনে নিশ্চয় কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা ছিল না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ কবি ভাবিয়া বা কিছু না ভাবিয়াই লিখুন প্রসঙ্গসূত্রে তাহাতে নূতন অর্থ প্রকাশ হইয়া পড়ে। মহৎ শিল্পের এটি একটি মূলগত ধর্ম।

ইহার কয়েকমাস পরে ১৯১৫ সালের বসন্তকালে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীব মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে। তাহার পর হইতে উভয়ের বন্ধুত্বেব ও মিলনের ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এই যে, চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিবার পরে পূর্বোক্ত শ্রেণীর ইঙ্গিত রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল; যাহা আছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সচেতন চিন্তার ফল, এবং সেইজন্যই তাহার শিল্পগত মূল্য অল্প।

এমন কেন হইল? কল্পনার বস্তু বাস্তবরূপ লাভ করিয়াছে বলিয়াই কি কবি আব তাহাকে পুনরঙ্কিত করিতে চাহেন নাই? কিংবা বাস্তব কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়াই কি কবি তাহার ব্যর্থ অনুসরণ করিতে চাহেন না? কিংবা কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে ভেদ দেখিতে পাইয়া কবি বিড়ম্বিত বোধ করিয়াছেন? কারণ যাহাই হোক তাহা গবেষণাযোগ্য।

এখানেই বর্তমান প্রবন্ধের সমাপ্তি। নবীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির কল্পনায় নবীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কর্মযোগীর পূর্বাভাস সাহিত্যিকের,

ঐতিহাসিকের ও মনস্তত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের যোগ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের মতো ভারতপুরুষ সর্বরসাধার মহামানব সৃষ্টি করেন নাই সত্য, কিন্তু আমার বর্তমান প্রচেষ্টা যদি সার্থক হইয়া থাকে তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি আর একজন ভারতপুরুষের অলৌকিক চরিত্র পূর্বাহ্ণে পূর্বাভাসে অঙ্কন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাঁশরী সরকার

শেষের কবিতা প্রকাশের চার বছরের মধ্যে বাঁশরী নাটক প্রকাশিত হয়। চার বছর আগে শেষের কবিতা লিখিবার সময়ে কবির মনে যে তরঙ্গাভিঘাত চলিতেছিল বাঁশরী লিখিবার সময়েও তাহা থামে নাই—বরঞ্চ তাহা যেন অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শেষের কবিতাতে যে তিক্ততার সূত্রপাত, বাঁশরীতে তাহা প্রখর হইয়া উঠিয়াছে; এমন ঝাঁঝ রবীন্দ্রনাথের অল্প রচনাতেই আছে।

শেষের কবিতার মূলে দুটি প্রেরণা, একটি অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমস্যা, দ্বিতীয়টিকে বলা চলে প্রেম-পরিণয়-তত্ত্ব, বাঁশরীতেও মূলে এই দুইটি সমস্যা। শেষের কবিতার মতো বাঁশরীর প্রারম্ভ Satire-এ, পরিণাম Seriousness-এ; শেষের কবিতা আংশিক Novel of Manners, বাঁশরী-ও অংশত Comedy of Manners, শেষের কবিতা গল্পাকারে লিখিত, বাঁশরীও গল্পাকারে লিখিত হইলে অধিকতর শিল্পসৌষ্ঠবসঙ্গত হইত।

এই নাটকের সূচনায় বাঁশরী সরকার ও ক্ষিতীশ ভৌমিকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়। ক্ষিতীশ ভৌমিক একজন আধুনিক লেখক, সে গল্প লিখিয়া নাম করিয়াছে, বাঁশরীর মতে দুর্নাম করিয়াছে। বাঁশরী এই হতভাগ্য লেখকটাকে টানিয়া লইয়া এক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কেন্দ্রে আনিয়া ফেলিয়াছে; সে ক্ষিতীশকে বলিতে চায় যে, যে সমাজকে দূর হইতে অস্পষ্টভাবে দেখিয়া তাহার দলের লেখকরা বিদ্রূপ করে, সেই সমাজকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ দিবার জন্যই তাহাকে এখানে আনিয়াছে।

ক্ষিতীশের চরিত্র আর্টিস্টের অপক্ষপাত তুলিতে অঙ্কিত নয়, তাহা ব্যঙ্গরচকের রচনা; তাহাকে উপলক্ষ করিয়া একদল আধুনিক লেখককে বিদ্রূপ করিবার জন্যই কবি প্রস্তুত। আধুনিক লেখকদের

বিদ্রূপ করাতে কাহারো আপত্তি থাকিবার কথা নয়, কিন্তু আধুনিকদের যোগ্যতম প্রতিনিধি বাছিয়া লওয়া উচিত ছিল। বাঁশরী সরকারের চরিত্র সৃষ্টিতে কবি যে মমতা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার মুখে যে শাণিত বাক্‌বৈভব দান করিয়াছেন, ক্ষিতীশের চরিত্রে ও মুখে কবি সে শক্তিদান করেন নাই; যোগ্যের বিরুদ্ধে যোগ্যকে দাঁড় করাইলে নালিশ উঠিত না এবং শিল্পীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগও করিতাম না। মনে করা যাক্, বাঁশরী সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি অমিত রায় হইত! অমিত যদিচ আধুনিক লেখক নয়, তৎসত্ত্বেও সে আধুনিকদের পৃষ্ঠপোষক। তাহা হইলে বাশরী সরকার কি এত সহজে নিষ্কৃতি পাইত? অমিত-বাঁশরী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁশরী জয়লাভ করিলেও অভিযোগের কারণ থাকিত না। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকেও অসাধারণ বাক্‌-কৌশলী পুরুষ আছে। যদিচ শেষরক্ষার চন্দ্রকান্ত বা চিরকুমার সভার অক্ষয় কেহই সাহিত্যিক নয়, তবু তাহারা বাঁশরীর প্রত্যেক যুক্তির এবং প্রত্যেক কুযুক্তির পক্ষচ্ছেদ করিতে পারিত যুক্তি-কুযুক্তিতে প্যাঁচানো বাক্‌-পটুতার শানোজ্জ্বল সুদর্শনচক্রে।

এই পক্ষপাতের ত্রুটি ছাড়াও ক্ষিতীশের চরিত্রে আর একটি গুরুতর ত্রুটি আছে—তাহা চরিত্রসৃষ্টির সমতার অভাব বা অসঙ্গতি।

ক্ষিতীশের 'বেমানান' বা 'ভালোবাসার নীলাম' নামে যুগান্তকারী উপন্যাসের স্বপক্ষে আমাদের কিছুই বলিবার নাই; বাঁশরী ক্ষিতীশের 'ভালোবাসার নীলাম'-এর পাণ্ডুলিপি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে—বাংলা সাহিত্যের উপকারই করিয়াছে। কিন্তু যে লেখক 'বেমানান' বা 'ভালোবাসার নীলাম'-এর মতো নিম্নশ্রেণীর গল্প লেখে সে এমন সুন্দর কথা বলে কি করিয়া? এমন সূক্ষ্ম কারুখচিত, শানিত, উজ্জ্বল বাক্‌-পটুতা সে কোথায় পাইল? সরল ভাষার উপরে এমন সহজ স্বচ্ছন্দ দখল যাহার, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, humour-এর অভাব তাহার হইবার

নয়; আর humour ও কাণ্ডজ্ঞান, একটিকে ছাড়িয়া আর একটি থাকিতে পারে না, যদি থাকে তবে সে বেমানান গল্প লিখিলেও নিশ্চয়ই তাহা প্রকাশ করিত না, আর নিতান্তই 'বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে' প্রকাশ করিলেও বাঁশরীকে পড়িবার জন্য সগৌরবে আনিয়া দিত না। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ও গল্পে বাক্‌-পটুতা একটি বিশেষ গুণ। কোন লোককে বুঝিবার প্রধান উপায় তাহার বাক্যব্যবহার-কলা। কাজের দ্বারা লোক বুঝা যায়; কিন্তু রবীন্দ্র-গল্প-নাটকে action নাই বলিলেই হয়, কাজেই বাক্যই একমাত্র লোককে বুঝিবার উপায়। চন্দ্রকান্ত, অক্ষয়, অমিত রায়কে যে আমরা বুঝি, তাহাদের কাজের দ্বারা নয়, তাহাদের বাক্‌-বৈদগ্ধ্যের দ্বারা; বাক্যই এখানে কার্যের স্থান অধিকার করিয়াছে।

এখন, বাক্য দ্বারা যদি ক্ষিতীশের চরিত্র-ধারণা করিতে হয় তবে কবি তাহাকে যেভাবে বিদ্রূপের পাত্র করিয়া তুলিয়াছেন, সেভাবে গ্রহণ করিতে আমাদের রসবোধ অস্বীকার করে।—

ক্ষিতীশ

দু'জন মানুষের ঠিকানা পাওয়া গেল। দুই সংখ্যাটা গড়ায় এসে সুশীতল গার্হস্থ্যে। তিন সংখ্যাটা নারদ, পাকিয়ে তোলে জটা, ঘটিয়ে তোলে তাপজনক নাট্য। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কোথাও আছে নিশ্চয়, নইলে সাহিত্যিকের প্রলোভন কোথায়?

* * * *

ক্ষিতীশ

আদালতের সাক্ষীর মতো জানিনে, বানিয়ে বলবার মতো জানি।

* * * *

ক্ষিতীশ

বাঁশি, বৈদিককালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্তর পড়ে দেবতা ভোলানো—যাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে, সেই দশা। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমরা, আবার

পাদোদক নিতেও ছাড়ো না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

* * * *

ক্ষিতীশ

আমার হয়েছে অন্ধ-গো-লাঙ্গুল ন্যায়। ল্যাজটা ধরেছি চেপে, বাকিটা টান মেরেছে আমাকে, কিন্তু চেহারাটা রয়েছে অস্পষ্ট। মোট কথাটা এই বুঝেছি যে, সুষমা বিয়ে করবে রাজাবাহাদুরকে, পাবে রাজৈশ্বর্য, তার বদলে হাতটা দিতে প্রস্তুত, হৃদয়টা নয়।

* * * *

ক্ষিতীশ

তাহলে অন্তত গলিটার ঘাট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তারপর ডিঙিয়ে হোক, খেয়া ধরে হোক্ পারে পৌঁছব।

* * * *

ক্ষিতীশ

আমাব মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস রাহুর পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ করে, শুধু চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।

* * * *

ক্ষিতীশ

এর থেকে ভাষার রেলেটিভিটি প্রমাণ হয়। আমার পক্ষে যা মর্মান্তিক জরুরী তোমার পক্ষে তা ঝেঁটিয়ে ফেলা বাজে।

* * * *

উপরে ক্ষিতীশের বচনের উদ্ধৃতি হইতে কী মনে হয়? ইহাতে যে কেবল অসাধারণ বাক্-কৌশল আছে তাহা নয়, নারীচরিত্রের রহস্যভেদের দৃষ্টি আছে, তীক্ষ্ণ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় আছে, বাঁশরীর মনস্তত্ত্ব বিদ্ধ করিবার মতো সুতীক্ষ্ণ বাণ আছে—এক কথায় অসাধারণত্ব আছে। এই কথাগুলি অমিত রায়ের বলিয়া চালাইলেও

বিস্ময়ের কারণ থাকিত না। অথচ এ-হেন ক্ষিতীশ, 'বেমানান' ও 'ভালোবাসার নীলাম' লিখিয়া যুগান্তকারী গ্রন্থ হিসাবে বাঁশরীকে পড়িতে দেয়। আরও অসঙ্গতি আছে। এমন সূক্ষ্ম কাণ্ডজ্ঞান যাহার, তাহার অবিলম্বে বুঝা উচিত ছিল সুষমা-পুরন্দরের মাঝখানকার তিন সংখ্যাটা স্বয়ং বাঁশরী সরকার। ক্ষিতীশের চেয়ে কম বুদ্ধিমান লোকেও ইহা সহজে বুঝিতে পারিত। আর হঠাৎ কেন যে বাঁশরী তিনি চারি দিনের নোটিশে ক্ষিতীশকে বিবাহ করিতে রাজী হইল—ইহাও ক্ষিতীশের পক্ষে না বুঝিয়া ওঠা বিস্ময়ের। ইহা যে ক্ষিতীশের প্রতি প্রেম নয়, সোমশঙ্করের অবহেলার সদম্ভ প্রত্যুত্তর —ইহা অন্ধেও বুঝিতে পারে।

এখন ক্ষিতীশ-চরিত্রে এই অসঙ্গতির কারণ কি? আগাগোড়া সুসঙ্গত একটা চরিত্র সৃষ্টি করিতে গেলে হয় একটা নিরেট বোকা বানাইতে হয়, নতুবা আর একটা অমিত রায় সৃষ্টি করিতে হয়। একটা নির্বোধ সৃষ্টি করিলে নাটকের সূত্রপাত করাই মুশকিল, আর দ্বিতীয় অমিত রায় সৃষ্টি করিলে সে এক মুহূর্তে বাঁশরী ও তাহার সমাজের অভাজনদের যুক্তিজ্ঞানকে তূলা ধুনিয়া উড়াইয়া দিয়া গোড়াতেই নাটকের সমাপ্তি সাধন করিয়া দিবে। এইবারে, শুরুতে যে তিক্ততার কথা পড়িয়াছিলাম তাহা আসিয়া পড়িল। তরুণ বাঙালী সাহিত্যিকরা যখন রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিতেছিল তখন কবি বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে ব্যক্তিগত কোন ক্ষোভ থাকিলেও থাকিতে পারে। এই অভিজ্ঞতা কবির একটা সময়ের রচনাতে আছে; যাহারা তাঁহার গড়া পুতুল তাঁহার কাছে বেচিয়া বড়াই করে— তাহাদের প্রতি কবির একটা গভীর ধিক্কারের ভাব ছিল। এই অভিজ্ঞতাই তাঁহাকে তরুণ সাহিত্যের ত্রুটি দেখাইয়া দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; এই প্রেরণা হইতেই নিবারণ চক্রবর্তী ও ক্ষিতীশ ভৌমিকের সৃষ্টি। একদিকে যেমন ক্ষিতীশ ভৌমিক প্রমুখ তরুণ

সাহিত্যিকদের প্রতি বিরাগের ভাব, অপর দিকে তেমনি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রতি, অন্তত এই নাটকের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রতি কবির মমত্ববোধ। এই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রতি তাঁহার মমত্ব-শ্রদ্ধা না থাকিলে সুষমার মতো অসাধারণ মেয়ে, বাঁশরীর মতো তেজস্বী মেয়ে এখানে আবিষ্কার করিতে পারিতেন না; সোমশঙ্করকে শম্ভুগড় হইতে টানিয়া আনিয়া এই আংটি বদলের সভায় ভর্তি করিয়া দিতেন না। এখন এই দুই দলের মধ্যে কবি দো-টানায় পড়িয়াছেন। তরুণ সাহিত্যের প্রতি ধিক্কার—তাহাদের একটা প্রত্যুত্তর—দেওয়া চাই; আবার যে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে তরুণদের অনভিজ্ঞতাজাত আক্রোশ, তাহাকেও সস্নেহে রক্ষা করা চাই। এমন দুই পক্ষ রাখিয়া সৃষ্টি করিতে গেলে পক্ষপাত-সৃষ্টি হইবেই।

ক্ষিতীশ ভৌমিকের দলের সাহিত্যিক বাড়াবাড়ি যদি থাকে তবে কবির সস্নেহপক্ষাশ্রিত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজেরও বাড়াবাড়ি বড় কম নয়। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সতীশ শচীন লীলা তারক বাঁশরী-ক্ষিতীশ সংবাদ লইয়া যে আলোচনা করিয়াছে তাহা যে কেবল অশোভন তাহা নয়, ঘটনা হিসাবে অসম্ভব এবং শিল্প হিসাবে অবিশ্বাস্য ও অবান্তর।

ক্ষিতীশের দলকে উপলক্ষ করিয়া একদল বাঙালী সাহিত্যিককে কবি বলিতে চান যে, তাহাদের পরিচয় কেবল পুঁথির সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে নয়; সেইজন্য তাহাদের রচনায় জীবনের সঙ্গীত নাই, আছে পুঁথির প্রতিধ্বনি।

"বানিয়ে তোলা লেখা তোমার, বই-পড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে তার অমন লেখা বিস্বাদ লাগে।"

যে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে ক্ষিতীশের দল বইয়ে দেখিয়াছে এবং অধিকাংশ সময়েই ইংরেজী বইয়ে দেখিয়াছে, সত্যভাবে তাহাকে দেখিবার জন্য বাঁশরী ক্ষিতীশকে এই দুর্গের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। ক্ষিতীশ দেখিয়া যাক্, এখানেও মানুষের বাস, সংসারের

নির্মম নিষ্পেষণে এখানকার অধিবাসীদেরও হৃদয়ের রক্ত ফাটিয়া ফাটিয়া পড়ে।

বইয়ের ভিতর দিয়া ইহারা সংসারকে দেখে বলিয়াই যাহাকে ইহারা 'রিয়ালিজম্' বলে তাহার সহিত রিয়ালিটির কোন সম্বন্ধ নাই—তাহা একপ্রকার ফিকে রোমান্স। ফিকে রোমান্স ও ফিকে রিয়ালিজম্ মূলে দুই-ই এক, কারণ দুই-ই অর্ধ-সত্য; কবির মতে বইয়ের দূরবীনের ভিতর দিয়া সংসার দেখা সাহিত্যিকের দল এই অর্ধসত্যের গোধূলিরাজ্যের জীব; রিয়ালিজমের সুরা বা রোমান্সের অমৃত কোনটাকেই সহ্য করিবার শক্তি তাহাদের নাই; পুঁথির দিগন্তের ঘের দেওয়া একটা মায়ারাজ্য সৃষ্টি করিয়া বালখিল্যের দল এখানে জগৎপিপাসা নিবৃত্তি করিতেছে।

সুষমাকে দেখিয়া ক্ষিতীশ বিস্মিত হইয়া বলিতেছে—

কী আশ্চর্য ওঁকে দেখতে! বাঙালী ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না; যেন এথীনা, যেন মিনর্ভা, যেন ব্রুনহিলড্।

বাঁশরী

(তীব্র হাস্যে) হায়, যত বড়ো দিগ্‌গজ পুরুষই হোক না কেন, সবার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্বর। হাড়-পাকা রিয়ালিস্ট বলে দেমাক করো, ভান করো, মন্তর মানো না। লাগ্‌ল মন্তর চোখের কটাক্ষে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজির যুগে। আজও কবি-মনটা রূপকথা আঁকড়িয়ে আছে। তাকে হিঁচড়িয়ে উজোন পথে টানাটানি করে মনের উপরকার চামড়াটাকে করে তুলছে কড়া। দুর্বল বলেই এত বড়াই।

ক্ষিতীশ

সে কথা মাথা হেঁট করেই মানবো! পুরুষ জাত দুর্বল জাত।

বাঁশরী

তোমরা আবার রিয়ালিস্ট! রিয়ালিস্ট মেয়েরা। যতো বড়ো স্থূল পদার্থ হওনা, যা তোমরা তাই বলেই জানি তোমাদের।

পাঁকে ডোবা জলহস্তীকে নিয়েই ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স বানাইনে। রং মাখাইনে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব। ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো! পোড়া কপাল আমাদের। এথীনা! মিনর্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়ালিস্ট, রাস্তায় চল্‌তে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে এথীনা, মিনর্ভা!

* * * *

বাঁশরী

লেখো, লেখো সত্যি করে, লেখো শক্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনর্ভার মুখোশটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল করে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায়, ঐ আশ্চর্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তর ছড়াচ্ছে। সামনে পড়লো পথ-চলতি এক রাজা, শুরু করলে জাদু। কিসের জন্যে। শুনে রাখো, টাকা জিনিসটা মাইথলজির নয়, ওটা ব্যাঙ্কের, ওটা তোমাদের রিয়ালিজ্‌মের কোঠায়।

ক্ষিতীশ

টাকার প্রতি দৃষ্টি আছে সেটা তো বুদ্ধির লক্ষণ, সেইসঙ্গে হৃদয়টাও থাকতে পারে।

বাঁশরী

আছে গো, হৃদয় আছে। ঠিক জায়গায় খুঁজলে দেখ্‌তে পাবে পানওয়ালীরও হৃদয় আছে। কিন্তু মুনফা একদিকে, হৃদয়টা আর একদিকে। এইটে যখন আবিষ্কার করবে তখনি জমবে গল্পটা। পাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে, বলবে মেয়েদের খেলো করা হোলো, অর্থাৎ তাদের মন্ত্রশক্তিতে বোকাদের মনে খট্‌কা লাগানো হচ্ছে। উঁচুদরের পুরুষ-পাঠকও গাল পাড়বে। বল কি, তাদের মাইথলজির রং চটিয়ে দেওয়া! সর্বনাশ! কি ভয় ক'রো না

ক্ষিতীশ, রং যখন যাবে জ্ব'লে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তখনো সত্য থাকবে টিকে, শেলের মতো, শূলের মতো।"

* * * *

বাঁশরীর মনে কি তিক্ততা! কথায় কি ঝাঁঝ! এথীনা, মিনর্ভা যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী! তাহার ব্যক্তিগত ঈর্ষা ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে—তাহা বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি কবির সনির্বন্ধ উপদেশ। রং নয়, মন্ত্র নয়, মাইথলজি নয়, কোন 'ইজ্‌ম্' নয়,—প্রত্যক্ষভাবে সত্যকে দেখো—সরলভাবে সত্যকে প্রকাশ করো—"লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরা ছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চমকে উঠে দেখুক এতদিন পরে বাংলায় দুর্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরোলো যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো।"

পুঁথি-মাত্র পড়া বাঙালী সাহিত্যিক এতদিন শিখিয়াছে যে রসাত্মক বাক্যই কাব্য। তাহাদের প্রতি কবির উপদেশ এই যে, "সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হোলেই তাকে বলে সাহিত্য।"

কোন একটা উপলক্ষে একদল বাঙালী সাহিত্যিককে বিদ্রূপ করা ছাড়াও নাটকের মধ্যে ক্ষিতীশের একটি শিল্পগত প্রয়োজন আছে, নতুবা ক্ষিতীশ-চরিত্র নাটকের পক্ষে অবান্তর হইয়া পড়িত। বাঁশরীর আত্মপ্রকাশের জন্য ক্ষিতীশের দরকার। সোমশঙ্করকে না পাওয়াতে বাঁশরী মনে গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। এমন স্থলে সাধারণ মেয়েরা কাঁদিয়া কাটিয়া পড়াপড়শীর করুণা জাগ্রত করিয়া, প্রচুর অশ্রুবর্ষণ করিয়া শান্ত হয়—ঐ তাহাদের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু বাঁশরীর মতো অসাধারণ মেয়ে, যে মরিয়া গেলেও কাহাকেও দুঃখ জানাইবে না, তাহার আত্মপ্রকাশ কি উপায়ে? আর এত বড় গুরুতর বোঝা মন হইতে কেমন করিয়া নামিবে—যদি সে দুঃখকে কোন উপায়ে প্রকাশ করিতে না পায়! সংসারে দুঃখপ্রকাশের দুটি উপায় আছে, একটি বাস্তব পন্থা, কান্নাকাটি, বুক চাপড়ানো,

হায় হায়; অধিকাংশ লোক যাহা করে; আর একটি শিল্পপন্থা, খুব অল্প লোকেই সে পথে চলে। নিজের দুঃখকে শিল্পবস্তু করিয়া তুলিতে পারিলে দুঃখেরও লাঘব হয়; তাহা অপরের মুখ দিয়া প্রকাশিত হওয়াতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা চলে, শিল্পগত বেদনা যেন অপরেরই বেদনা; ব্যক্তিগত পরিচয়ের লজ্জা যেন তাহাতে থাকে না। বাঁশরীর মতো চাপা মেয়ে দুঃখপ্রকাশের এই শিল্প-পন্থাকে স্বীকার করিয়াছিল; তাহাতে মনের ভারও যেন লঘু হয়, আবার ব্যক্তিগত লজ্জাকেও যেন স্বীকার করিতে হয় না। এই কারণেই সে শিল্পী ক্ষিতীশকে আশ্রয় করিয়াছে; নিজের দুঃখকে সে তাহার মুখে শুনিতে চায়, নিজের দুর্দশাকে সে তাহার চোখ দিয়া দেখিতে চায়, নিজের কলমকে সে তাহার হাত দিয়া ধরিয়া লেখাইতে চায়। বাঁশরী নিজের অসহায় অবস্থায় যে তাহাকে অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে, ক্ষিতীশের রচনাশক্তি সম্বন্ধে সে কৃতনিশ্চয়। বাঁশরীর মধ্যে একটি অপরিণত, অসম্পূর্ণ শিল্পী আছে, সেই শিল্পীর স্বাভাবিক আকর্ষণই ওই সম্পূর্ণতর, স্ফুটতর শিল্পী ক্ষিতীশের প্রতি। ক্ষিতীশ-শিল্পীর মধ্যে বাঁশরী-শিল্পী যেন নিজেকে objective ভাবে, বস্তুগোচর করিয়া, পূর্ণতর করিয়া দেখিতে পায়; সেইজন্য ক্ষিতীশের প্রতি তাহার অদ্ভুত মিশ্র একপ্রকার মনোভাব, ঈর্ষা, বিদ্রূপ, ধিক্কার, আকর্ষণ, প্রত্যাকর্ষণ, আসক্তি ক্ষণে ক্ষণে স্থানপরিবর্তন করিতেছে; নিজের অনায়ত্ত দোসরের প্রতি বোধ করি মানুষের ওই একরকম বিচিত্র আকর্ষণ হয়।

বাঁশরী

সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসন্ন ট্রাজেডির সঙ্কেত—আগুনের সাপ ফণা ধরেছে, এখনো চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হলো না। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়তো রক্তবর্ণ

আগুনের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছি আর্টিস্টের চোখে, বলতে পারছিনে আর্টিস্টের কণ্ঠে। ব্রহ্মা যদি বোবা হোতেন তাহলে অদৃষ্ট বিশ্বের ব্যথায় মহাকাশের বুকে যেতো ফেটে।

ক্ষিতীশ

কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পারো না, বাঁশি, তুমি নও আর্টিস্ট। তুমি যেন হীরে মুক্তোর হরির লুঠ দিচ্ছ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায় দেখে ঈর্ষা হয় মনে।

বাঁশরী

আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই, তবু বলা—সেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায়, হাতে-হাতে দিনে-দিনে। ঘরে-ঘরে মুহূর্তে-মুহূর্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায়।

*　　　*　　　*

মেয়েরা শিল্পের দ্বৈতবাদী, দুইজনের মধ্যে তাহাদের শিল্প আবদ্ধ; পুরুষ শিল্পের অদ্বৈতবাদী, আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া যায়—কি করিয়া সে কথা বিশ্বের কানে প্রবেশ করে। যেসব মেয়ে সার্থক শিল্পী, তাহাদের মধ্যে পুরুষ জাগ্রত হইয়া কলম ধরিয়া বসে। বোধ করি, প্রত্যেক মহৎ শিল্পীই পৌরুষে নারীত্বে সংমিশ্র; সে নিছক স্ত্রী-পুরুষের চেয়ে পূর্ণতর জীব; প্রত্যেক মহৎ শিল্পী অর্ধনারীশ্বর।

বাঁশরী-ক্ষিতীশ সংবাদ বাদ দিলে বাকি গল্পটা এই রকমের। শম্ভুগড়ের অবাঙালী রাজপুত্র সোমশঙ্কর মধ্যযুগীয় সাজসজ্জা লইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসে; সেখানে বাঁশরীর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বাঁশরী তাহাকে ঘষিয়া মাজিয়া আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া তোলে। তাহাদের প্রণয় যখন পরিণয়ে পরিণত হইবার মুখে, এমন সময়ে পুরন্দর নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়া পড়িল। সে বাছিয়া বাছিয়া ছাত্রী পড়াইত; সুষমা সেন তাহার অসাধারণ ছাত্রী; সুষমা পুরন্দরকে ভালোবাসিয়া ফেলিল। পুরন্দর কোথায়

নাকি একটা তরুণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য একটি নিষ্কাম দম্পতি খুঁজিতেছে; সুষমা ও সোমশঙ্কর সেই রকম ভাবী দম্পতি; সে সুষমার সঙ্গে সোমশঙ্করের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিল; বাঁশরী বঞ্চিতা হইল। ইহাই নাট্য-কাহিনীর কাঠামো।

সুষমা যে অসাধারণ মেয়ে, এমন পরিচয় নাটকের মধ্যে নাই: তাহার দৈহিক সৌন্দর্যের অপরূপত্বের উল্লেখ আছে মাত্র; কিন্তু তাহার কথাবার্তায় বা ব্যবহারে কোন বৈশিষ্ট্য নাই; তাহার অসাধারণত্ব বিষয়ে পুরন্দর ও সোমশঙ্করের অভিমতকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

পুরন্দরকেও অসাধারণ বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা আছে। সে কখনো রোশনাবাদের নবাবের সঙ্গে পোলো খেলে; কখনো ডাক্তার উইলকক্সকে যোগবাশিষ্ঠ পড়ায়; কখনো ভালুক শিকার করে, কখনো ছাত্রী নির্বাচন করে; দীর্ঘকাল নাকি ইউরোপেও ছিল; নানা বিরুদ্ধ কিংবদন্তী তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া একটা রহস্যের কুয়াশার সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার বিচিত্র খেয়ালও তাহার ব্যক্তিত্বের অংশ; মনকে নাড়া-দেওয়া দু-চারটা কথাও তাহার মুখে শোনা যায়; কিন্তু ইহা ছাড়া যদি কিছু অসাধারণত্ব থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া দেখানো হয় নাই; কবিকে বিশ্বাস করিতে হইবে।

সোমশঙ্কর চেহারায় ও আচার-ব্যবহারে অসাধারণ না হইলেও অদ্ভুত। এই বীরোচিত চরিত্র উদ্‌ভাবন করিতে কবি অবাঙালীর সাহায্য লইলেন কেন? আগেও অনেকটা এই জাতীয় একটি চরিত্র কবি সৃষ্টি করিয়াছেন, গোরা উপন্যাসের গোরা; সে গোরাও বাঙালী নয়, আইরিশম্যানের ছেলে।

সোমশঙ্কর ও গোরাকে অবাঙালী করাতে ইহাই কি বুঝিতে হইবে যে, এমন হাড়-মোটা, মাথায়-উঁচু, আদর্শনিষ্ঠ, ভাবাবেগে

অনুদ্বেজিত দৃঢ়-পিনদ্ধ-চরিত্র বাঙালী সমাজে বিরল? আমার মনে হয়, এই জাতীয় একটা ধারণা কবির মনে আছে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবির দুটি প্রবন্ধে বারংবার সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে, বিধাতা যেখানে চার কোটি বাঙালী গড়িয়াছেন, সেখানে কেন হঠাৎ একটা বিদ্যাসাগর গড়িয়া বসিলেন? বিদ্যাসাগর-চরিত্র যে বাঙালী সমাজে আকস্মিক—এই ধারণা কবির মনে যেন আছে। যাহা হোক, সোমশঙ্করের পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্য ছাড়া অন্য কোন অসাধারণত্ব থাকিলেও নাটকের মধ্যে বিশেষ করিয়া তাহা দেখানো হয় নাই।

বাঁশরী সরকার এই নাটকের প্রধান ব্যক্তি, কিংবা বাঁশরী সরকারই বাঁশরী নাটক। এই শাড়ি-পরা ঘূর্ণি হাওয়াটি নাটকের হাসির দিগন্ত হইতে অশ্রুর দিগ্‌বলয় পর্যন্ত হু-হু শব্দে ছুটিয়া গিয়াছে; তাহার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে চিরদিনের চেনা আকাশখানার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া অভিনবত্ব প্রকাশ করিয়াছে; তাহার মর্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস সোমশঙ্কর-পুরন্দর-সুষমার ব্রতনিষ্ঠ আদর্শের শুষ্ক পাতা উড়াইয়া একেবারে ভাবী বঙ্গসাহিত্যের বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, আর তাহার চাপা অশ্রুর আভাস দিগন্তস্পর্শী পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ভারে সন্নত হইয়া পড়িয়া আত্ম-বিসর্জনের মুখে উন্মুখ।

এই নাটকে সত্যই যদি কেহ অবাঙালী থাকে, তবে তাহা বাঁশরী সরকার। বিধাতা যে প্রাচীন শিলাখণ্ডে দ্রৌপদীকে গড়িয়াছিলেন, তাহারই অবশিষ্টাংশে বাঁশরী সরকার গঠিত। সে বাঙালীও নয়, আধুনিকাও নয়, সে ক্লাসিক্যাল।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাঁশরী একক হইলেও তাহার সগোত্র নারীচরিত্র আছে। ললিতা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, রত্নাবলী! কিন্তু একমাত্র দেবযানীই বোধ করি বাঁশরীর সর্বাংশে সমকক্ষ! দৃপ্ত, দর্পিত, উদ্ধত, স্বয়ং অদৃষ্টকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে উদ্যত। প্রেমের অবমাননায় ইহারা ইন্ধনহীন শিখার মতো নিষ্ঠুর নির্মম বিলাসিনী

রোমান-সম্রাজ্ঞী হইয়া উঠিতে পারে, আবার প্রেমের জন্যই ইহারা অকস্মাৎ অকাতরে সর্বস্ববিসর্জনপর অর্ধ-শাটিমাত্র-সহায় দময়ন্তীর মতো অরণ্য-অন্ধকারে নিঃশেষ আত্মবিলোপে সমর্থ।

এই নাটকে প্রেমতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যে আকস্মিক নয়; বরঞ্চ বলা যাইতে পারে যে, প্রেম-তত্ত্বের এই ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুত্র আছে, ইহা রবীন্দ্র দর্শনের একটা মৌলিক প্রয়াস।

প্রেম ও পরিণয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি? প্রণয়িনী গৃহিণী হইতে পারে কি না? অর্থাৎ প্রণয়িনীকে গৃহিণী করিলে প্রেমের প্রকৃতি অবিকৃত থাকে কি না? কিংবা প্রণয়িনী গৃহিণী হইবামাত্র প্রেমের এমন পরিবর্তন ঘটে, যাহাতে প্রণয়িনী আর প্রণয়ের পাত্র থাকে না? প্রণয়িনীর স্থান মনের মধ্যে, সেখানে তাহার কোন সীমা নাই; গৃহিণীর স্থান ঘরের মধ্যে, সেখানে পদে পদে সে সীমায়িত; এখন স্বভাবত যাহা অসীম, তাহাকে সীমার মধ্যে ভরা যায় কি না? আর ভরিলেই অসীম কি সীমাহীন থাকে? অর্থাৎ অসীম ও সীমাকে মিলাইবার কোন উপায় আছে কি না? অথবা মানুষ চিরকাল সীমা ও অসীমের মুক্তবেণীর তীরে বসিয়া পুরূরবার মতো বিরহ-রোদন করিতে থাকিবে?

"পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্য-রচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। * * * কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া লক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।" [১]

রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী পাঠকের পক্ষে কবির এই স্বীকৃতির কোন আবশ্যক ছিল না। সকলেই জানেন, সীমা ও অসীমের আপেক্ষিক

১ জীবনস্মৃতি, ২৪৯-৫০ পৃঃ, ১৩৫৫।

সম্বন্ধ নির্ণয়ই রবীন্দ্র-সাহিত্যের চরম ধুয়া; রবীন্দ্রনাথ সীমার সহিত অসীমের পরিণয়ের ঘটক। রবীন্দ্র-কাব্যের ধ্রুবত্ব বিচারের সময় এই একখানি মাত্র মানদণ্ড ব্যবহৃত হইবে। যে পরিমাণে সীমা ও অসীমের সম্বন্ধ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে—তত্ত্ব হিসাবে নয়, মত হিসাবে নয়, কাব্য হিসাবে—সেই পরিমাণে রবীন্দ্র-কাব্য শাশ্বত হইবে।

সীমা অসীমের তত্ত্বকে কবি জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়াছেন, প্রেমের ক্ষেত্রেও করিয়াছেন।

প্রেম তো অসীম, কিন্তু তাহাকে ঘরে আনিতে হইলে সীমাবদ্ধ মানব-রূপে আনিতে হয়, তাহা হইলে সীমার মধ্যে অসীমের স্থান কিরূপে সম্ভব? প্রেম ও বিবাহের আপেক্ষিক সম্বন্ধ কি রকম?

ভারতীয় শাস্ত্রে ইহার গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারিয়া একেবারে 'গডিয়ান গন্থি' ছেদন করিয়া ফেলা হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রেম ও বিবাহকে আদৌ এক পর্যায়ে ফেলা হয় নাই—ও-দুটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ; কখনো কোনো ক্ষেত্রে দৈবাৎ মিল ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে কাকতালীয় ন্যায়। ব্যবহারিক জীবনে প্রেমে ও বিবাহে মিল ঘটে না এবং ঘটানোর চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সেইজন্য ভারতীয় শাস্ত্রে প্রেমের ও বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক নহেন, স্বতন্ত্র; প্রেমের দেবতা মদন, বিবাহের দেবতা প্রজাপতি। ভারতীয় শাস্ত্রকারের বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা দুটাকেই স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে।

কালিদাস প্রেম ও বিবাহ দুইয়েরই গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এ দুইয়ের প্রকৃতি যে ভিন্ন তাহাও মানিতেন, সংসারে এ দুইয়ের চুলোচুলি লাগিয়াই থাকিবে, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই সমস্যার একটা সমাধান তিনি করিয়া গিয়াছেন। প্রেমের ও বিবাহের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, কাজেই বিবাহ হওয়া মাত্রই ইহাদের সমন্বয় হয় না, জায়াত্বে ইহার মীমাংসা নয়, কিন্তু জায়াত্ব

যখন জননীত্বে পরিণত হয়—তখন আপনি সব বিরোধ স্নেহের সমুদ্রসঙ্গমে আসিয়া পরমা শান্তি লাভ করে। এই যুগ্ম ভাবটিকে সুবিধার জন্য 'জায়া-জননীবাদ' বলা যাইতে পারে। কালিদাসের প্রেম-বিবাহের সিদ্ধান্ত 'জায়া-জননীবাদ'।

বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের ধারণা অনুযায়ী এই সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সংসারের প্রকৃতি জানিতেন, তাঁহারা রিয়ালিস্ট ছিলেন। প্রেমের সঙ্গে বিবাহের খাপ খায় না তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্যই আদর্শ প্রেমিকযুগল রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই—সামাজিক সম্বন্ধ তাঁহাদের ছিল না—বরঞ্চ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে তাঁহারা সমাজের বাহিরে স্থাপন করিয়াছেন। এই আদর্শে মিলনের সামাজিক বন্ধন নাই, সন্তান-সন্ততি নাই, গৃহের বাহিরে বৃন্দাবনের বনে তাহার লীলা। প্রেম মনোরাজ্যের ব্যাপার—সংসারের নয়।

মহাকবি দান্তেও প্রেমের ব্যাপার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন; তিনি বিয়াত্রিচেকে বিবাহ করিতে চান নাই। বিয়াত্রিচে তাঁহার গৃহিণী হয় নাই বলিয়াই তাঁহাকে বৈকুণ্ঠের পথ নির্দেশ করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রেম যে সংসারের মধ্যে থাকিলেও অবিকৃত থাকিয়া যায় অর্থাৎ প্রণয়িনী গৃহিণী হইলেও প্রেমের পরিবর্তন ঘটে না—এই ধারণা রোমান্টিক কল্পনার সৃষ্টি। প্রেম ও বিবাহের হরধনুর দুই কোটিতে গুণ পরাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় হতভাগ্য শেলির জীবন ট্রাজিক হইয়া উঠিয়াছিল।

রোমান্টিক কল্পনার উত্তরাধিকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাটি পাইয়াছেন। চিত্রাঙ্গদায় ইহার প্রথম দর্শন মেলে। অর্জুন প্রণয়িনী চিত্রাঙ্গদাকে ঘরে আনিতে চেষ্টা করিয়াছে—চিত্রাঙ্গদা জানিত, "এ প্রেমের গৃহ নাই।" গৃহে লইয়া গেলে অর্জুনের মোহভঙ্গ হইবে—সেইজন্য সে গৃহে যাইতে চাহে নাই। বর্ষভোগ্য প্রেম-লীলার শেষে আসন্ন জননী চিত্রাঙ্গদা যেদিন আত্মপ্রকাশ করিল,

সেদিনও সে গৃহে যায় নাই। এখানে প্রেম ও বিবাহের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'জায়া-জননীবাদ' সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। জায়াত্বে প্রেমের শান্তি নয়, জননীত্বে হয়তো হইলেও হইতে পারে।

বাঁশরী বলে—"মেয়েরা রিয়ালিস্ট।" বাস্তবিক মেয়েরাই রিয়ালিস্ট। চিত্রাঙ্গদা রিয়ালিস্ট—লাবণ্য রিয়ালিস্ট, বাঁশরী রিয়ালিস্ট।

শেষের কবিতাতেও এই একই প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা। অমিত নিজের জীবনে, লাবণ্য ও কেটি দুজনকেই স্থান দিতে চেষ্টা করিয়াছে; লাবণ্য তাহার উড়িবার আকাশ, মনের সঞ্চরণক্ষেত্র, সে নিছক প্রণয়িনী; আর কেটি তাহার বসিবার নীড়, সে গৃহিনী। অমিতের এই মানসিক সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তের ছল মাত্র, একটি মনোহারিণী মিথ্যা। রিয়ালিস্ট লাবণ্য জানে যে, অমন করিয়া জীবনকে ভাগ করিয়া চলা যায় না, সেইজন্য সে শেষের কবিতার শেষ প্রণামে অমিতের কাছ হইতে নিঃশেষে বিদায় লইয়া সর্বতোভাবে শোভনলালকে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিয়াছে। বক্ষ-ক্ষতের রক্তে চিহ্নিতপথ হরিণীর মতো বিবাহের পরেও পূর্বপ্রণয়ের জের টানিয়া চলে নাই।

পুরন্দর বাঁশরীর কাছ হইতে সোমশঙ্করকে ছিনাইয়া লইয়া সুষমার সঙ্গে বিবাহ দিল। সোমশঙ্কর বাঁশরীকে ভালোবাসে, ভালোবাসায় মোহ আছে, বাঁশরী সোমশঙ্করের ব্রতকে টলাইয়া দিত। বাঁশরীর সঙ্গে সোমশঙ্করের বিবাহে ইহাই আপত্তি।

বাঁশরী কেন সোমশঙ্করের ব্রত রক্ষা করিতে পারিবে না? পুরন্দর সন্ন্যাসী এত জানে, বিদেশীকে যোগবাশিষ্ঠ পড়াইবার মতো বিদ্যা তাহার আছে, অথচ সে কি জানে না যে, আমাদের দেশে পত্নীর প্রতিশব্দ সহধর্মিণী, সে ধর্মপালনের সহায়?

পুরন্দরের স্বপক্ষে এইটুকু বলা চলে যে, যখন সত্যই পত্নী আমাদের দেশে সহধর্মিণী ছিল, তখনকার বিবাহ রোমান্টিক

ভালোবাসার উপরে নির্ভর করিত না। বিবাহের পরে দম্পতির মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীল একপ্রকার ভাব আসিয়া পড়িত বটে, কিন্তু তাহাতে জীবনব্রতে ধর্মাচরণের বিঘ্ন উৎপাদন করিত না। বাঁশরী-সোমশঙ্করের বিবাহের মূলে যে ভালোবাসা, তাহা ব্রতের অনুকূল নহে।

কিন্তু এই ব্রতের সত্যই প্রতিকূল যদি এই বিবাহে কিছু থাকে, তবে তাহা বাঁশরীর চরিত্র। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সর্বদা জীবনগ্রন্থিকে অলগ্ন করিয়া দেখিতে উদ্যত· সে বুদ্ধিবাদিনী, সন্দিগ্ধা, এক রকমের নাস্তিক। এই ধরনের মানুষ পরের কথায়,—সে কথা হোক না ভালো,—চলিতে পারে না। বিশেষত বাঁশরী অত্যন্ত আত্ম-কেন্দ্রিক, পরের চাপানো ব্রতকে অনায়াসে ঘাড়ে বহন করা তাহার অসাধ্য। দুঃখ সহ্য করিতে সে পরাঙ্মুখ নয়, নিজের ব্যক্তিত্ব-সাধনার জন্য সে যৎপরোনাস্তি দুঃখ বহন করিতে প্রস্তুত। তাহার এই Cynical ব্যক্তিত্বই ব্রতপালনের পক্ষে যথার্থ প্রতিকূলতা।

তারপরে পুরন্দর প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে একটা মনগড়া পার্থক্য খাড়া করিয়াছে; মূলে হয়তো পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে পার্থক্য নাই, থাকা উচিত নয়।

বাঁশরী

সন্ন্যাসী বলেছেন—"প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্বত্র। কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা, সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে তোলে। * * * প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।"

সামান্যত এ-তত্ত্ব মিথ্যা না হইলেও বিবাহের ক্ষেত্রে এ মিথ্যার চেয়েও মারাত্মক—ইহা অর্ধ-সত্য। ভালোবাসা যদি ব্যক্তিগত হয়, আর প্রেম যদি সর্বজনীন হয়, তবে বিবাহিতজীবন যাপনের ফলে ব্যক্তিগত ভালোবাসাই সর্বজনীন প্রেমে পরিণত হয়, অন্তত বিবাহের আদর্শ ই তাহা। কিন্তু গোড়া হইতেই সর্বজনীন প্রেমের বিবাহে প্রেমও ব্যর্থ হয়, বিবাহও নিষ্ফল হয়।

এখন সমস্যাটা এই, সোমশঙ্করের মন রহিল অন্যত্র বাঁধা, আর সুষমার মনে রহিল এমন প্রেম যাহার উপরে সোমশঙ্করেরও যেমন দাবি, পাঠকের দাবিও তেমনি, এমন ক্ষেত্রে সোমশঙ্করের চলিবে কেমন করিয়া ? ওদিকে সুষমার মন বাঁধা পড়িয়াছে আবার গুরু পুরন্দরের পায়ে—এরূপ মানসিক ত্রিভুজের বর্গফল কি দাঁড়ায় ?

বাঁশরী

"প্রেমের সরকারী রাস্তায় যে প্রেমে সকলেরই অধিকার খোলা হাওয়ার মতো। তুমি লেখকপ্রবর, তোমার সামনে সমস্যাটা এই যে, খোলা হাওয়ায় সোমশঙ্করের পেট ভরবে কি ?"

বাঁশরী বলিতে চায় যে, মোহের আশঙ্কায় পুরন্দর ভালোবাসার গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সোমশঙ্করকে সমর্পণ করিতেছে সুষমার হাতে, পরিশেষে সেই মোহই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। মোহ-ভঙ্গের পালা যখন আসিবে, তখন কোথায় থাকিবে ব্রত, কোথায় থাকিবে সার্বজনীন বিবাহের বারোয়ারি !

বাঁশরী ক্ষিতীশকে বলিতেছে—"প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে পোড়াতে।"

ইহার টীকা করিলে দাঁড়ায়, সুষমা মনে মনে পুরন্দরকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, তাকে যখন সে পাইবে না, তখন তাহার কাছে সোমশঙ্করও যেমন, অপর একজন লোকও তেমনি। বরঞ্চ প্রেমের সার্বজনীন ব্যাখ্যাটা তাহার ভালোই লাগিবার কথা, কারণ স্বামীকে স্বতন্ত্রভাবে ভালোবাসিবার তাগিদ তাহাতে নাই, অন্য দশজনের মতোই সে সোমশঙ্করকে ভালোবাসিবে। কিন্তু এই ফাঁকা ভালো-বাসায় দীর্ঘকাল তো সোমশঙ্করের পেট ভরিবার নয়, বিশেষ সুষমার প্রেমের 'সরকারী রাস্তা'র উপরে দশজনের দাবি সে

স্বীকার করিবে না, তখন অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? সোমশঙ্করকে এখন সুষমা দেবচরিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, পরীক্ষার মুহূর্তে তাহারই মধ্য হইতে মানবচরিত্র তৃষ্ণার্ত স্বামী বাহির হইয়া পড়িবে। রামচন্দ্রের মতো স্বামী যদি সীতার সতীত্বে সন্দিহান হইয়া থাকেন, তবে সোমশঙ্করের কাছে কী আশা করা যায়? বাঁশরীর কাছে ইহাই তাহাদের দাম্পত্য ভবিষ্যৎ।

ভালোবাসায় মোহ আছে, সেই মোহে বাঁশরী পূর্ণ—কিন্তু সন্ন্যাসীর ব্রতটাও কি একটা সূক্ষ্ম মোহ নয়?

বাঁশরী

পুরুষ বলেই বুঝতে পারছ না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

পুরন্দর

মেয়ে বলেই বুঝতে ইচ্ছে করছ না, ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে, প্রেমের মিলনে মোহ নেই।

বাঁশরী

মোহ চাই, চাই সন্ন্যাসী, নইলে সৃষ্টি কিসের। তোমার মোহ তোমার ব্রত নিয়ে—* * * আমাদের মোহ সুন্দর, আর ভয়ঙ্কর তোমাদের মোহ।

পুরন্দর

মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রণয়, একথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু তুমিও একথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। * * *

কোণঠাসা তার্কিকের শেষ যুক্তি সন্ন্যাসী প্রয়োগ করিয়াছে, আমার কাজ তোমার চেয়ে বড়ো। কে ইহার বিচার করিবে? বাঁশরীও তো মনে করে জগতের সকলের চেয়ে তার কাজ বড়ো, সোমশঙ্করকে পাওয়া সবচেয়ে বড়ো।

বাঁশরী সুষমাকে বলিতেছে—"তুই পুরুষ নোস্, আইডিয়ার

সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।"

আসল কথা, পুরুষ আইডিয়ালিস্ট, অ্যাবস্ট্রাকশন, প্রেম লইয়া তাহার চলে; মেয়েরা রিয়ালিস্ট, তাহাদের বস্তু চাই, ব্যক্তি চাই, ভালোবাসা চাই; আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তাহাদের শেষ পর্যন্ত চলে না।

সন্ন্যাসী শাস্ত্রজ্ঞ, বাঁশরী মর্মজ্ঞ; নিজের ব্যথ্যার মধ্য দিয়া সে সকলের মর্মকথা জানিয়া ফেলিয়াছে; সে বেদনার অন্তর্যামী।

কিন্তু আসল সমস্যার মীমাংসা হইল কই? প্রণয়িনীকে গৃহিণীভাবে পাওয়া যায় কি না?

বাঁশরীকে সোমশঙ্করের সঙ্গে কবি বিবাহ দেন নাই। ভালোই করিয়াছেন, কারণ বাঁশরী-প্রণয়িনী সোমশঙ্কর-গৃহিণী হইলে প্রেমের মোহভঙ্গের যে আঘাত বাঁশরী পাইত, সেই আঘাত হইতে কবি তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

সোমশঙ্কর-সুষমার ভালোবাসার বিবাহ নয়, কাজেই ভালো-বাসার মোহভঙ্গের ভয় নাই! কিন্তু আর এক সূক্ষ্মতর মোহ যে রহিয়া গেল! তাহাদের বিবাহে মোহের কোন স্থান নাই—এইটাই যে তাহাদের মোহ। সন্ন্যাসীর থিওরী অনুসারে মানবচরিত্র গঠিত নয়; যেদিন সোমশঙ্করের ভালোবাসার বুভুক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিবে, সেদিন কোথায় থাকিবে ব্রত, কোথায় থাকিবেন ব্রতপতি!

অনুপস্থিতে সন্ন্যাসীর পায়ে মন সঁপিয়া দিয়া অপরের ঘর-করা যে সম্ভব নয়, সুষমার এ-মোহও কি শেষ পর্যন্ত অটুট থাকিবে?

সবসুদ্ধ দেখিয়া মনে হয়, কবির এই ধারণা হইয়াছে, প্রণয়িনী-গৃহিণী একসঙ্গে পাওয়া যায় না, পাওয়ার চেষ্টা করাও উচিত নয়।

বিবাহের ভিত্তি ভালোবাসা না হইলেও চলে সোমশঙ্কর-সুষমার বিবাহ-দৃষ্টান্তে বোধকরি ইহাও কবির বক্তব্য; কিন্তু দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত অসামান্য; কারণ বর-বধূর দু'জনের মন দু'জায়গায় বাঁধা পড়িয়াছে,

এমন দৃষ্টান্ত না গ্রহণ করলেই ভালো হইত—এমন বিবাহ কোন প্রকারেই স্থায়ী হইতে পারে না।

নাটকখানাকে গতানুগতিক শিল্পরীতি অনুসারে কমেডি বলা চলে। বাঁশরী-সোমশঙ্করের মধ্যেও শেষের দিকে একটা মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে; বাঁশরী সোমশঙ্করকে পাইল না কিন্তু তাহার ভালোবাসা পাইল। কিন্তু ওইটুকু মিল না করিলেই বোধ করি ভালো ছিল। ওইটুকুতে বাঁশরীর মহিমা যেন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; আগ্নেয়গিরির উচ্চ চূড়ায় বেদনার তাপে দেদীপ্যমান তাহার মূর্তি সান্ত্বনার ক্ষণিক মেঘে কিয়ৎপরিমাণে যেন পরিম্লান হইয়াছে; এই কৃপাটুকু কবি তাহার উপরে না করিলে কল্পনার জগতে তাহার স্থান উজ্জ্বলতর হইত; বেদনার রসই ইহার প্রকৃত রস, কারণ মূলত ইহা ট্রাজেডি।

সোমশঙ্করকে ক্ষমা না করিয়া সে যদি দেবযানীর মতো দিব্য স্পর্ধায় বলিতে পারিত, "ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে", তাহার তুচ্ছ সান্ত্বনাকে সে যদি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিতে পারিত—

"ক্ষমা কোথা মনে মোর,
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশ-কঠোর
হে ব্রাহ্মণ।"

তাহা হইলে পরম বেদনার বজ্রদীর্ণ রন্ধ্রপথে সে আরও নিবিড়ভাবে পাঠকের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিত। শিল্পলোকের স্বর্ণ-বহ্নিসমুজ্জ্বল মহিমার উচ্চতম সুমেরু-শিখরে তাহার আসন চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত।

রবীন্দ্রকাব্যে একটি প্রতীক

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও নাটকে সূর্যোদয় ও প্রভাত নবজীবনের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিতাতে প্রতীকরূপে প্রভাতের ব্যবহার এত স্পষ্ট ও প্রচুর যে তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু নাটকেও যে প্রভাত প্রতীকের মাহাত্ম্য পাইয়াছে এবং প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সকলের জানা না থাকিতেও পারে।

নাটকে প্রথম হইতেই প্রভাত প্রতীকী হইয়া ওঠে নাই—কিন্তু কবির জীবনবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের ব্যবহারে বৈশিষ্ট্য ঘটিয়াছে—এবং ক্রমে ক্রমে গভীরতর মহিমা লাভ করিয়াছে। প্রথমে অনেক পরিমাণে কবির অগোচরেই যেন সূর্যোদয় কবির নাটকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত অগোচরত্ব থাকে নাই; কবি ভাবিয়া-চিন্তিয়া সজ্ঞানে সূর্যোদয়ের দ্যুতিতে নবীন দ্যোতনা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

নাটকের সংলাপ ও সঙ্গীতে সূর্যোদয়ের প্রতীক-রূপ প্রচুর আছে, কিন্তু সেগুলির উপরে জোর দিবার প্রয়োজন নাই; নাটকের ঘটনাসংস্থানে ও কালবিন্যাসের পতাকাস্থানে বারংবার প্রভাত আসিয়া পড়িয়াছে—এমনতরো প্রভাতের সংখ্যা এত বেশি, এবং তাহার উপরে কবি এমন ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছেন যে তাহা চোখে পড়িবেই—আর চোখে পড়িলেই মনে হয় ওগুলি কেবল নৈসর্গিক সূর্যোদয় নয়, নাটকের পাত্রপাত্রীর জীবনেরও কোন মহত্তর আভাস ইহার মধ্যে যেন নিহিত আছে।

প্রভাতের আলো যেমন নূতনতর মহিমালাভ করিয়াছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারও নূতনতর অর্থ পাইয়াছে; এবং নৈসর্গিক আলো-অন্ধকারের ক্রমন্যাস ও লীলা কবির মনোজগতের অনৈসর্গিক সত্তার প্রতীক হইয়া বারংবার প্রকট হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে দু'টি কথা মনে করিয়া রাখিতে হইবে। প্রথমত, গোড়া হইতেই কবি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না; দ্বিতীয়ত, প্রভাত ও রাত্রি, আলো ও কালো গোড়া হইতেই যে নৈসর্গিক ঘটনারূপে কবির কাব্যে স্থান লাভ করিয়াছে, এমন নয়; বিভিন্ন ঘটনা, মূর্তি ও বস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রথমে দেখা দিয়াছে; কিন্তু ঘটনা, মূর্তি, বস্তু যাহাই হোক না কেন—তাহাদের মধ্যে মনে রাখিবার মতো হইতেছে আলো ও কালো; আলো ও কালোতে নূতন মহিমার আরোপ।

প্রভাতসঙ্গীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের প্রভাতটি কবির জীবনের একটি যুগান্তকারী ঘটনা; কবির কল্পনাশক্তির সুপ্ত নির্ঝরিণী যেন ওই দিন জাগিয়া উঠিয়াছিল; ওই প্রভাতকালের অভিজ্ঞতাকে কবি বহুবার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ফলে ওই দিনটি কবির জীবনের ইতিহাসে অতিশয় গুরুত্ব লাভ করিয়াছে; এবং ওই দিন হইতেই নৈসর্গিক প্রভাতের সঙ্গে কবিজীবনের অনৈসর্গিক প্রভাতের যেন একটা অদৃশ্য নাড়ীর যোগ সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রভাত-আলোর প্রতীকী গুরুত্ব আরও আগে হইতে কবির রচনায় সুরু হইয়া গিয়াছে। প্রভাতসঙ্গীতের আগে বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত; বাল্মীকি-প্রতিভাতে প্রভাত ও রাত্রির, আলো ও অন্ধকারের এমনভাবে ব্যবহার আছে যাহা কেবল নৈসর্গিক বা গতানুগতিক মাত্র নয়; তবে ইহা কবির অগোচরে ঘটিয়াছে, কিন্তু অগোচরে ঘটিয়াছে বলিয়াই যে কবিত্বের ইতিহাসে তাহার মূল্য কম এমন মনে করিবার কারণ নাই—বরঞ্চ অনেক সময়েই কাব্যব্যাপারে অগোচর প্রকাশের উচ্চতর মূল্য।

বাল্মীকি-প্রতিভার গল্পটি কি? বাল্মীকি কালীর উপাসক ছিল; একদিন সরস্বতী তাঁহাকে দেখা দিয়া গেলেন—সেই হইতে কালীর প্রতি তাহার মন বিরূপ হইয়া গেল—সে বনে বনে উষাময়ী প্রতিমার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে অবশ্য

রামায়ণের ক্রৌঞ্চবধের কাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রামায়ণের গল্পাংশ এই নাটকে গৌণ; মুখ্য হইতেছে দুই দেবীর মধ্যে বাল্মীকিকে লইয়া টানাটানি; একজন কালো আর একজনের স্থির-চপলার বর্ণ।

আদিকবি আদি শ্লোক উচ্চারণ করিবার পরেই বলিতেছে—

"একি! হৃদয়ে একি দেখি,
ঘোর অন্ধকার মাঝে এ কি জ্যোতি ভায়,"

এই যে জ্যোতি ইহা হৃদয়ের, বাহ্য নয়। তার পরে সরস্বতীর আবির্ভাব। অনৈসর্গিক জ্যোতির অনুরূপ এতক্ষণে সরস্বতীর মুখে দেখা গেল।

সরস্বতী অন্তর্ধান করিলে বাল্মীকি বলিতেছে—"সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার।" লক্ষ্মী দেখা দিলেন; বাল্মীকির মনে রহিয়াছে সেই 'স্থির-চপলা,' সে বলিতেছে—"কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা।" সরস্বতী পুনরায় যখন দেখা দিলেন তখন বাল্মীকি বুঝিল—"উষা আনিলে প্রাণের আধারে।" এবং কালী-প্রতিমাকে শেষবারের জন্য ছাড়িয়া যাইবার সময়ে বাল্মীকি বলিতেছে—"কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন।"

কালী এবং সরস্বতী, কালো এবং আলো; রাত্রি এবং প্রভাত; যে আলো-কালোর লীলা কবির পরবর্তী কাব্য ও নাটকে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত—এইখানে তাহার সুরু, অগোচর ভাবে সুরু, অবাস্তর ভাবে সুরু অপরিণত ভাবে সুরু, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে সুরু।

বাল্মীকি-প্রতিভাকে কবির অপরিণত ও লঘু রচনা বলিয়া মনে করিবার ফলে রসিক সমাজের দৃষ্টি গভীরভাবে ইহাতে পড়ে নাই—কাজেই এ সমস্তকে কষ্টকল্পনা মনে হইতে পারে। কিন্তু নাটকখানির কোন কোন অংশ অত্যন্ত prophetic। নাটকের শেষে সরস্বতী বাল্মীকিকে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন আদিকবির পক্ষে তাহা যেমন প্রযোজ্য—রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা তেমনি প্রযোজ্য।

সরস্বতী সেদিন কিশোর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আসীন হইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কি ওই কথাগুলি বলিয়া যান নাই? ইহা যদি prophetic না নয়, তবে prophetic কাহাকে বলে জানি না।

বাল্মীকি-প্রতিভাতে কালো ও আলো এখনো রাত্রি ও প্রভাত হইয়া দাঁড়ায় নাই—কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাত্রি ও প্রভাতের প্রধান লক্ষণ তাহাতে রহিয়াছে। এখানে নাটকের আলোচনায় বসিয়াছি। কাজেই অপ্রাসঙ্গিক হইবার ভীতিসত্ত্বেও উল্লেখ করিতে হইতেছে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর। এই কাব্যেও আগের ভাবের অনুবর্তন রহিয়াছে। এই কাব্যের নায়ক—কৃষ্ণ। এখানে এ তর্ক তুলিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা এখানে ছিল না, একটা নির্দিষ্ট ঐতিহ্যকে তিনি অনুসরণ করিতে-ছিলেন মাত্র। গোড়াতে অবশ্য একটা ঐতিহ্যকে অনুসরণের ভাব কবির মনে ছিল; কিন্তু ছোট কবির হাতে যেখানে tradition, tradition মাত্র রহিয়া যায়, মহাকবির কলম সেখানে tradition-কে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে; শ্যাম আর শ্যাম নাই; সে মৃত্যুব প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে, কিংবা মৃত্যুই শ্যামের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে—

"মরণ রে,
ভুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।"

নির্দিষ্ট ঐতিহ্য কোন্ পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। মহাকবির লেখনী অনির্দেশ্যের অভিমুখে অভিসার করিয়াছে।

এখন আমার বক্তব্য, এই কাব্যে কালো মৃত্যু কালো শ্যামের প্রতীক—এই কাব্যে, এবং কবির অল্প বয়সের অনেক কাব্যেই ঘটে। কিন্তু কবির জীবনবাদের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কালো শ্যাম আর মৃত্যুর প্রতীক নয়, শুভ্র মহাদেব মৃত্যুর প্রতীক হইয়া পড়িয়াছেন।

"মরণ রে,
ভুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।"

আর

"যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন।
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কত মতো ছিল আয়োজন,
ছিল কত শত উপকরণ।"

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের মৃত্যুর প্রতীক আর কৃষ্ণ নয়, শুভ্রকান্তি মহাদেব; প্রতীক পরিবর্তনের মানেই, কবির মনে নিশ্চয় মৃত্যু সম্বন্ধেও ধারণার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই মহাদেবের Idea হইতেই আরও পরে কবির মনে নটরাজের Idea মূর্তি লাভ করিয়াছে। কবির জীবনবাদের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে পৌরাণিক দেবতাদের Idea-র বিবর্তন ঘটিতেছিল, নূতন ধারণা প্রকাশের জন্য নূতন নূতন মূর্তি সন্ধান করিতেছিলেন—ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইলে কবিমনের অনেক রহস্য ধরা পড়িতে পারে।

তাহা হইলে ভানুসিংহের পদাবলীতেও প্রকারান্তরে সেই কালোকেই দেখিলাম, পরবর্তী কাব্যে যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কবি শুভ্র দেবতাকে আশ্রয় করিয়াছেন। মূলত সেই কালো এবং আলো।

দেবপ্রতিমাশ্রয়ী কালোর লীলা বিসর্জন নাটকেও আছে। বাল্মীকি-প্রতিভার মতো বিসর্জনের অধিদেবতাও কালী। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। বাল্মীকি-প্রতিভাতে কালীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর বিসর্জনে স্বয়ং কালীকেই শেষ দৃশ্যে মন্দির পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখানে অবশ্য প্রত্যক্ষত আলোর কথা নাই—কিন্তু আভাসত আছে। বিসর্জন নাটকের সমাপ্তি হইতেছে, শরতের প্রথম প্রত্যূষে; শরতের প্রথম প্রত্যূষটির উপরে জোর দিয়া কবি কি ইহাই বলিতে চান না যে, বর্ষাকালের দুর্যোগের মধ্যে যে-নাটকের সূত্রপাত, যাহার নাটকীয় পরিণাম ঝড়-বাদলের

অন্ধকার রাত্রিতে [ধ্রুবকে হত্যার চেষ্টা ও জয়সিংহের আত্মনাশ চতুর্দশী ও অমাবস্যা তিথিতে], তাহার পরিণামে নির্মল আলোক-ধন্য 'শরতের প্রথম প্রত্যুষ।' এই রকম কোন একটি Idea কবির মনে যে ছিল তাহা বুঝা যায় বিসর্জনের একটি সংস্করণে "তিমির দুয়ার খোলো" গানটি প্রারম্ভে জুড়িয়া দেওয়ায়। ঐ গানটিতেই যেন সমস্ত নাটকের ধুয়াটি ধ্বনিত। তিমির-দুয়ার খুলিয়া কবি দর্শকদের শরতের প্রথম প্রত্যুষে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এখানেও সেই কালো ও আলো; কালোটি দেবপ্রতিমাকে অবলম্বন করিয়া আছে বটে, কিন্তু আলোটি প্রভাতের আলো হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিমাশ্রয়ী কালোর ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য বিসর্জন পর্যন্ত আসিয়াছি, এবারে প্রভাতের ক্রমবিকাশ দেখিবার জন্য একটু ফিরিয়া যাইতে হইবে।

প্রকৃতির প্রতিশোধের উপান্ত-দৃশ্যটির কাল প্রভাত। পৃথিবীতে যেমন অরুণোদয় ঘটিয়াছে তেমনি আর একটি মহত্তর অরুণোদয় ঘটিয়াছে সন্ন্যাসীর জীবনে; এতদিনের সমস্যার সিদ্ধান্তে আজ সে পৌঁছিয়াছে; এতদিন সে জীবনকে কাট-ছাঁট করিয়া পাইবার দুরাশায় নিরন্তর শূন্যতার মধ্যে ছিল: আজ জীবনকে সমগ্রভাবে স্বীকার করার ফলে জীবনরসের স্বাদ লাভ করিয়াছে; তাহার মধ্যে এই যে চৈতন্যোদয় হইয়াছে, পার্থিব প্রভাতের দ্বারা কবি তাহাই বুঝাইতে চান। ইহার আগের দৃশ্যটির কাল ঝড়-বৃষ্টির রাত্রি; বিসর্জনের শেষদৃশ্যটির ঠিক অনুরূপ। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর এই প্রভাতের যে অভিজ্ঞতা, প্রভাত-সঙ্গীতের কবিরও ঠিক অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়াছিল; প্রভাত-সঙ্গীত ও প্রকৃতির প্রতিশোধের রচনার মধ্যে এক বছরের বেশি সময়ের ব্যবধান নয়। প্রভাতসঙ্গীতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই কবি প্রকৃতির প্রতিশোধে ব্যবহার করিতেছিলেন।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিবার পরবর্তী যে অভিজ্ঞতা তাহার সঙ্গে সন্ন্যাসীর অভিজ্ঞতার কি ঐক্য!

"রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আবেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত * * *। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা পালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে * * *।"[১]

এসেছে সখা সখী, বসেছে চোখাচোখা
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাইবোন্ পুলকে ভরা মন
ডাকিছে ভাই ভাই আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখারা এল ছুটে, নয়নে তারা ফুটে
পরাণে কথা উঠে, বচন গেল ভুলি।
সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।
শিশুরে ল'য়ে কোলে জননী এল চ'লে
বুকেতে চেপে ধ'রে বলিছে "ঘুমো, ঘুমো।"[২]
"উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধূলায় ব'সে খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা।"[৩]

উপরিলিখিত তিনটি অংশে যা-কিছু প্রভেদ তাহা ভাষা ও ছন্দের মাত্র—বক্তব্য একই।

---

১ জীবনস্মৃতি, প্রভাতসঙ্গীত।
২ প্রভাতসঙ্গীত, প্রভাত-উৎসব।
৩ প্রকৃতির প্রতিশোধ, ১৪শ দৃশ্য, প্রভাত।

এই প্রভাতটি কেবল নৈসর্গিক ঘটনা মাত্র নয়—ইহাতে সন্ন্যাসীর জীবনের একটি ভাবান্তর সূচিত হইতেছে; সন্ন্যাসী যে নব-জীবন লাভ করিয়াছে, এই নব-প্রভাতটি তাহারই প্রতীক, এবং রবীন্দ্র-নাথের নাটকে প্রতীক হিসাবে প্রভাতের ব্যবহার এই প্রথম।

চিত্রাঙ্গদা নাটকের অন্তিম দৃশ্যটির শেষরাত্রি নামকরণ করা হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদা স্থির করিয়াছে দেবপ্রসাদে লব্ধ বর্ষভোগ্য রূপ পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের কাছে আজ সে স্বরূপ প্রকাশ করিবে; তাহাতে অর্জুনের মন যদি বিরূপ হইয়া যায় সে-ও ভালো, কিন্তু এই ছদ্মবেশের অভিনয় আর সে সহ্য করিতে পারে না। ঠিক সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সে অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া চিত্রাঙ্গদাদর্শনকাতর অর্জুনের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল—"আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।" সূর্যোদয়ে যেমন রাত্রির মায়াচ্ছন্ন জগতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল, তেমনি ছদ্মরূপের অবগুণ্ঠন উন্মোচনেও চিত্রাঙ্গদার স্বরূপ উদ্ভাসিত হইল; বাহিরের প্রভাত এখানে চিত্রাঙ্গদার মোহভিন্ন সত্যাগ্রহের প্রতীক হইয়া পড়িয়াছে; ইহা আর অগোচর শিল্পকলা মাত্র নয়; শিল্পীর মনের মধ্যে যে প্রতীকী কবি আজ আরম্ভ করিয়াছে তাহারই সচেতন প্রকাশ।

রাজা নাটকের শেষভাগে রাণী সুদর্শনা পিতৃগৃহ হইতে স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। এখন তাঁহার আর রাজ্ঞীত্বের অহঙ্কার নাই, রথ নাই, বাদ্য নাই—ধূলার পথে একাকিনী দীনের মতো চলিয়াছেন। এমন সময়ে সুরঙ্গমা বলিল—

"রাণী-মা, ঐ দেখ, পূর্বদিকে চেয়ে দেখ ভোর হ'য়ে আসছে। আর দেরি নেই মা, তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।"

এমন সময়ে ঠাকুর্দা প্রবেশ করিয়া বলিল—

"ভোর হ'ল দিদি, ভোর হ'ল।"

এই যে প্রভাত ইহাও রাণীর মধ্যে যে নূতন জীবন আরম্ভ

হইয়াছে তাহারই প্রতীক। যে-রাণী একদা অন্ধকার ঘরের ভারকে দুঃসহ মনে করিতেন, অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য কত অনর্থের না সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্ধকারের রাজাকে আলোকে দেখিবার জন্য কি মর্মান্তিক ভুল না করিয়াছেন, দুঃখের সুদীর্ঘ তপস্যায় ধৌত হইয়া আজ তাঁহার অন্ধকারের অবসান ঘটিয়াছে। ঠাকুর্দা যখন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে—"কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।" তখন সুদর্শনা বলিলেন—"বল কি! সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।"

এমন কথা সুদর্শনার মুখে নূতন। সে-সুদর্শনা ছদ্মবেশী সুবর্ণকে রাজা বলিয়া মনে করিয়াছিল সে এমন কথা বলিতে পারিত না। দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়া গেলে হৃদয়ে যে আলোক আবির্ভূত হয় সুদর্শনার হৃদয়ে আজ সেই আলোক; আর সেই আলোকই আজ প্রতিফলিত নৈসর্গিক প্রভাতের মধ্যে।

'রাজা' নাটকের শেষ দৃশ্যটি অন্ধকার ঘরে। কিন্তু প্রারম্ভের অন্ধকার ঘরের মতো এখানকার অন্ধকার আর রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়; তিনি দুঃখের দ্বারা অন্ধকারের রহস্য ভেদ করিয়াছেন। এ কথা রাজা বুঝিয়াছেন—তাই তিনি রাণীকে বলিলেন—"আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম, এখানকার লীলা শেষ হ'ল। এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস,—আলোয়।"

অচলায়তনের শেষ দৃশ্যে প্রভাতের কোন উল্লেখ নাই। মাঝখানকার একটা দৃশ্যে প্রাচীর-ভাঙা আলোর আনন্দের উল্লেখ আছে বটে।

"আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।"

—এই গানটিতে।

অচলায়তনের রূপান্তর 'গুরু' নাটকে এই ত্রুটি যেন সংশোধন

করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই নাটকের গুরু আলোকের গুরু, তিনি নূতন জীবনের আলো সঙ্গে করিয়া প্রাচীর ভাঙিয়া অচলায়তনে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। অচলায়তনে আলোক-উৎসবের যে-দৃশ্যটি মাঝখানে ছিল গুরু-তে তাহাকে শেষে স্থাপন করা হইয়াছে, এবং এই আলোক যে নবজীবনের প্রতীক তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য অচলায়তনের "আলো, আমার আলো, ওগো আলো ভুবনভরা" অপেক্ষা গভীরতর অর্থদ্যোতক একটি সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়াছে—

"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে—"

* * *

ফাল্গুনীর গুহাদ্বারের শেষ দৃশ্য। যুবকগণ বিষণ্ণভাবে গুহাদ্বারে উপবিষ্ট; চন্দ্রহাস বুড়াকে ধরিবার জন্য গুহার অন্ধকারের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে আর বাউলটা আসন্ন অলক্ষণের মতো নিস্তব্ধ।

এমন সময়ে বাউল উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবকগণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—

"ওকে দেখলেই বুঝতে পারি কে আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ ক'রে।"

"ঐ দেখ জোড় হাত ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছে।"

"পূবের দিকে মুখ ক'রে কা'কে প্রণাম করছে।"

"ওখানে তো কিচ্ছুই নেই—একটু আলোর রেখাও না।"

"আমার কি মনে হচ্ছে জানো? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।"

"যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়ানৌকাটির মতো এসে ঠেকেছে।"

এমন সময়ে চন্দ্রহাস গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল, যুবকদল জিজ্ঞাসা করিল সে বুড়াকে ধরিতে সমর্থ হইয়াছে কিনা। চন্দ্রহাস

জানাইল সে বুড়ার রহস্যভেদ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বুড়া কই? এখনি সে আসিয়া পৌঁছিবে।

বহু-প্রতীক্ষিত, বহু-অনুসন্ধিত বুড়া যখন বাহির হইয়া আসিল তখন যুবকেরা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল সে তাহাদেরই জীবন সর্দার। এতক্ষণে বার্ধক্যের রহস্যভেদ হইল; প্রকৃতিতে যেমন শীতান্তে বসন্ত উজ্জ্বলতর হইয়া ফিরিয়া আসে, মানুষের জীবনেও তেমনি বার্ধক্যের শেষে যৌবন—কবি যাহাকে বলেন প্রৌঢ়েরযৌবন, নিরাসক্ত যৌবন—গভীরতর অর্থসূচক হইয়া পুনরায় দেখা দেয়। যেমনি এই রহস্যভেদ হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সূর্য উঠিয়া পড়িল।

চন্দ্রহাস সর্দারকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—"এ তো বড় আশ্চর্য! তুমি বারেবারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।"

"ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হাব হ'ল। বুড়োকে ধরতে পারলে না।"

চন্দ্রহাস—"আর দেরি না, এবার উৎসব সুরু হোক। সূর্য উঠেছে।"

চন্দ্রহাস যুবকদলের প্রিয়; সে প্রেম। যুবকদলের সর্দারের নাম জীবন সর্দার; তাহাকে বলা যাইতে পারে "প্রিন্সিপল অব্ লাইফ"; আর কেহ পারিল না, চন্দ্রহাস গিয়া জীবন সর্দারকে ধরিয়া আনিল; একমাত্র প্রেমের দ্বারাই জীবনের রহস্য, বার্ধক্যের মধ্য হইতে যৌবনকে উদ্‌ঘাটিত করিবার রহস্য ভেদ করা সম্ভব।

ফাল্গুনী স্পষ্টত প্রতীকী নাটক; একটানা প্রতীকের মধ্যে এই সূর্যোদয়টি আবার একটি প্রতীক।

এমন সময়ে চৌপদী-চালিত দাদা আসিয়া পড়িল। এমন যে দাদা তাহার চৌপদীতেও এই জীবনরহস্যভেদী প্রভাতের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

সূর্য এল পূর্বদ্বারে তূর্য বাজে তার।
রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার।
এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার,
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার॥

নটীর পূজার সূচনার কাল অতি-প্রত্যূষ—তখনো রাজপুরীর নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। ভিক্ষু উপালি রাজবাড়ির নটীর কাছে ভগবান্ বুদ্ধের নামে ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। নটী ভাবিল সে কী ভিক্ষা দিবে? তাহার কি সে যোগ্যতা আছে? কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ যে নটীর কাছেই ভিক্ষা চান। উপালি নটীকে বলিল—"তোমার সেই দিন এসেছে, আমি তোমাকে জানিয়ে গেলুম তুমি ভাগ্যবতী।"

'এমন সময় রাজকন্যারা ভিক্ষাদানের জন্য উপালিকে আহ্বান করিল, উপালি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। নন্দা বলিল—"আজকের দিন ব্যর্থ হ'ল।"

রাজকুমারীদের অন্য দিনের মতো আর একটা দিন ব্যর্থ হইল, কিন্তু নটীর আজকার দিন চরমভাবে সার্থক। সূচনায় এই প্রভাত নটীজীবনের নব-প্রভাতকে সূচিত করিতেছে।

তপতীর প্রারম্ভ মানকেতুর পূজায়োজনের সন্ধ্যায়—সমাপ্তি ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ড-মন্দিরে সূর্যোদয়কালে। 'রাজা ও রাণী'র পরিসমাপ্তি ছিল পূর্ণিমার রাত্রে, কবির পরবর্তী জীবনের রূপান্তরিত নাটক তপতী রাজা ও রাণীর লৌকিক রীতি ত্যাগ করিয়া প্রতীকী রীতি অবলম্বন করিয়াছে।

রাজ্ঞী সুমিত্রার আত্মবিসর্জন কেবল যে একটি প্রভাতকালে তাহা নয়, স্বয়ং মার্তণ্ডেরই মন্দির-প্রাঙ্গণে চিতাশয্যায় রাণী আত্মবিলোপ করিয়াছেন। সুমিত্রা বুঝিয়াছেন তাঁহার প্রতি যে-আসক্তির ফলে বিক্রম রাজধর্ম লোকধর্ম হইতে স্খলিত আত্মনাশ ব্যতীত সে আসক্তি লোপ হইবার উপায় নাই। বিক্রমের আসক্তির মূল সুমিত্রার রূপ, মার্তণ্ডমন্দিরের চিতাগ্নিতে সেই রূপকে সুমিত্রা নিঃশেষে অপরূপের হাতে সমর্পণ করিয়া বিক্রমকে মোহপাশ হইতে ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। এখানে আর প্রভাতমাত্র নয়; অন্যান্য নাটকে প্রভাত যে-স্থান অধিকার করিয়াছে, এখানে স্বয়ং প্রভাতপতি সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহাকে রবীন্দ্রনাটকের

প্রতীকা প্রভাতের চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুমিত্রা এই আশা বহন করিয়া গেল যে, এই প্রভাতটি বিক্রমের মনের আসক্তির নৈশমুগ্ধতার মরীচিকাপাশ ছিন্ন করিয়া দিয়া নব-জীবনের সূচনা করিয়া দিবে।

শিশুতীর্থ নামে নাটকোপম রচনাটিতেও একাধারে নবপ্রভাতের ও নবজন্মের কাহিনী।

"আদিকাল থেকে মানব-ইতিহাসের যাত্রা নবজন্মের তীর্থে। বুদ্ধ একদিন শিশুরূপে দেখা দিয়েছিলেন, এনেছিলেন নবজন্ম। মানুষ তাকিয়ে আছে শিশুর দিকে।"

"স্বর্গকে উদ্ধার করবে নূতন প্রাণ। নবজাত কুমার দেখা দেবেন অভয় বহন করে।"

শিশুতীর্থ রবীন্দ্রনাথের কুমারসম্ভব কাব্য।

ইতিহাসের উত্থানপতনের মধ্য দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী-আশা-পরিচালিত মানব যখন মাতার দ্বারে গিয়া পৌঁছিল, তখন অজানা সিন্ধুতীরের কবি গান ধরিল—

> "তিমির-দুয়ার খোলো, এসো এসো নীরব চরণে,
> জননী আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে।"

তখন "দ্বার খুললো। মা ব'সে তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু —অন্ধকারের পরপার থেকে প্রকাশমান শুকতারার মতো।

"কবি গেয়ে উঠলো, জয় হোক মানুষের, জয় হোক নবজাতকের, জয় হোক চির-জীবিতের।

"যাত্রীরা প্রণাম করলে, দেশ দেশান্তরের কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো সেই জয়গান, যুগ-যুগান্তরে তা ব্যাপ্ত হোলো।"

"জয় হোক্, জয় হোক্ নব অরুণোদয়।"

পূর্ববর্তী নাটকের দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে বর্তমান দৃষ্টান্তটির প্রভেদ এই যে, আগেরগুলিতে ব্যক্তিগত জীবনের নবজন্মের সূচনা, আর ইহাতে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের নব-অভ্যুদয়ের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক খণ্ডভাবে আলোচনা করিলে ভুল করিবার আশঙ্কা। কাব্য হোক, নাটক হোক, সমগ্রভাবে আলোচনা করিতে হইবে; আবার কাব্য নাটক গল্প একসঙ্গে বিধৃত করিয়া আলোচনা করিতে পারিলে সমধিক ফলপ্রসূ হইবে। যে-সমালোচক যত বেশি সমগ্রতাকে আয়ত্ত করিয়া আলোচনা করিবেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের রহস্য তাঁহার কাছে তত বেশি ধরা পড়িবে।

তার পরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে স্থান ও কালের সংস্থানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চিত্রাঙ্গদার সূচনা রাত্রে কেন, সমাপ্তি সূর্যোদয়ে কেন? সোনার তরী কাব্যের প্রথম কবিতার কাল প্রভাত কেন, সমাপ্তির কাল সন্ধ্যা কেন? বিশেষভাবে কাব্য ও নাটকের সময়সংস্থানের মধ্যে কবিপ্রতিভার অনেক রহস্য নিহিত আছে।

নাটকের মধ্যে প্রতীকী-প্রভাতের যে দৃষ্টান্তগুলি দিলাম তাহা ছাড়াও উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে; কবিতায় এই জাতীয় দৃষ্টান্ত এত বেশি ও স্পষ্টার্থ যে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না।

কিন্তু কাব্য ও নাটক ছাড়াও আর এক স্থানে এই প্রতীকের মূল আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। স্বয়ং কবির নামটির মধ্যে নামটি অবশ্য কবির ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে নাই, কিন্তু পরিণত বয়সে কবি যখন ধীরে ধীরে নিজের জীবনবাদকে হৃদয়ঙ্গম করিতে-ছিলেন, তখন নিজের নামের মধ্যে তাহার একটা প্রতীক যেন খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন; হয়তো ইহাকেও জীবনদেবতার একটা লীলা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সূর্যের লীলাতেই রাত্রি ও প্রভাত, আলো ও অন্ধকারের ক্রমন্যাস; সূর্যোদয়ের আলোতে জীবনের স্থিরতম প্রতীকের দর্শন। সেই সূর্য যে তাঁহার মিতা, এই ভাবটি তাঁহার কবিতায়, চিঠিপত্রে অজস্র স্থানে টুক্‌রা আকারে ছড়ানো আছে; সেগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে শিক্ষাপদ একটি রচনা হইতে পারে। শেষজীবনের অনেক কবিতাতে 'রবি' এই

শব্দটিকে দ্ব্যর্থভাবে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন,—এক অর্থে সূর্য, এক অর্থে স্বয়ং কবি। এই প্রবন্ধের এক স্থানে কবির মনে পৌরাণিক দেবমূর্তির ক্রমবিকাশের কথা বলিয়াছি; নূতন ভাবকে প্রকাশের জন্য কি করিয়া নূতন নূতন পৌরাণিক মূর্তিকে আশ্রয় করিতেছিলেন, যাহার শেষ ধাপ বলিয়াছিলাম নটরাজের idea; তাহারও পরে আর একটি ধাপ যেন আছে, নটরাজ-idea-র সঙ্গেই যাহা সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে, তাহাকে বলা যাইতে পারে সবিতৃ-দেব।

"নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।"

১ ছেলেবেলা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯৫

জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা

আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে এমন এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন বাঙালী-সমাজের ভিত্তিতে ফাটল এমন প্রশস্ত হয় নাই যে, এক খণ্ড হইতে অন্য খণ্ডে চলাচল নিতান্ত দুস্তর। ফাটল তখনই ধরিয়াছিল, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম রেখা তখনও সমগ্রতার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয় নাই, এমন কি, সে সূক্ষ্মতা অধিকাংশ লোকেরই চোখে পড়ে নাই। স্থূলভাবে বিচার করিয়া আমরা বলিতে পারি, ব্যবহারিকভাবে তখন সমগ্র বাঙালী-সমাজ অখণ্ড অতএব এক ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলে, সুতরাং তাঁহার কাব্যের মূলে এই অখণ্ড বাঙালী-জীবন। একদিন অকস্মাৎ স্বপ্ন ভাঙিয়া যে নির্ঝরিণী বিশ্বের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িল, তাহাকে যেন সমগ্র বাঙালী-জীবন বরফগলা জলের দ্বারা পুষ্ট করিয়াছে। অবশ্য পরবর্তী কালে রবীন্দ্রকাব্যের ভিত্তি প্রশস্ততর হইতে হইতে, ক্রমে অধিকতর ভূমি গ্রাস করিতে করিতে বিশ্বকে পাদপীঠ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নির্ঝরের সঙ্গে দেশবিদেশের ধারা মিশিতে মিশিতে তাহা বিশ্বের রসজাহ্নবী হইয়া পড়িয়াছে।

যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলা দেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল। সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই।[১]

কোনো কবির কাজ বিচারের পক্ষে তাহার প্রাথমিক ভিত্তিটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রাথমিক ভিত্তি তাঁহার সামাজিক ভিত্তি, তাঁহার জাতির ভিত্তি, যে মাটিতে ভর করিয়া কবি প্রথমে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই মাটির দৃঢ়তা ও উদারতার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ জাতির এমন এক সন্ধিক্ষণে

১৪ ছেলেবেলা, ১

জন্মিয়াছিলেন, যখন বাঙালী-সমাজ আজিকার মতো ফাটিয়া এমন চৌচির হইয়া গিয়া সংকীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। আর মাটির দৃঢ়তা! বাংলাদেশের পলিমাটি অবশ্য নরম—কিন্তু তাহার তলে রহিয়াছে ভারতবর্ষের বজ্রবৎ কঠিন গ্রানিট-স্তর। বাঙালীর জীবন অবশ্য চিরকালই ভাবালুতায় দোলায়মান, কিন্তু তাহার পিছনে রহিয়াছে ভারতবর্ষের বহুযুগপুঞ্জিত তপশ্চর্যার কঠোরতা।

রবীন্দ্রনাথ যদি আর পঞ্চাশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করিতেন, কিংবা ত্রিশ বছর পরেও! প্রতিভার প্রাচুর্য সত্ত্বেও এমন মহত্ত্ব লাভ করিতেন কি না সন্দেহ। এই অত্যল্প কালের মধ্যে প্রাথমিক ভিত্তির উদারতা যে অনেক সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে জন্মিলে তিনি মহৎ জাতীয় কবি মাত্র হইতে পারিতেন—কিন্তু মহত্তর সর্বজাতীয় কবি হইতেন কি না সংশয়।

শেক্সপীয়রও ইংলণ্ডের ঠিক এমনি এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন—যখন সমাজ-ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও দুর্লঙ্ঘ্য বাধারূপে অত্মপ্রকাশ করে নাই। ফলে তিনি নিজের পাদপীঠরূপে সমগ্র ইংরেজ-সমাজের জীবনকে লাভ করিয়াছিলেন। আর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া মিল্টনের সমকালে জন্মিলে মিল্টনের মতোই তিনি আংশিক জীবনের মহাকবি হইতেন। মিল্টন পিউরিটান দৃষ্টির মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, শেক্সপীয়র খুব সম্ভব ক্যাভেলিয়র দৃষ্টির মহাকাব্য লিখিতেন, কিংবা তাহার চেয়েও যে আশঙ্কা অধিকতর ছিল—প্রথম চার্লসের দলে যোগদান করার অপরাধে পিউরিটানদের হাতে কবির প্রাণদণ্ডের বিধান হইত, আর মিল্টন তাহা সাগ্রহে সোল্লাসে সমর্থন করিতেন।

সর্বজাতীয়তার ভিত্তি জাতীয় জীবন; নিখিল মানুষের আশ্রয় দেশের মানুষ; বনস্পতির চারাটিকেও প্রথমে একখানি বাঁশের কাঞ্চি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে হয়। এ-কথা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়া যাই—বিধাতাপুরুষ ও মানবপ্রকৃতি এই অতি প্রাথমিক

সত্যটা এমমুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় না। সেইজন্যই বলিতেছিলাম রবীন্দ্রনাথ যে সেই যুগে জন্মিয়া মহাকবি হইবার পাদপীঠ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের সৌভাগ্য। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, যতদিন না আবার শতদীর্ণ বাঙালী-সমাজ জোড়া লাগিতেছে ততদিন বাঙালী-জাতির মধ্যে আর মহাকবি হইবার সম্ভাবনা নাই। শক্তিমান লেখকের শক্তির অনেকটাই এই ফাটল-পথে রসাতলে চলিয়া যাইবে; যে-রসে সে পুষ্ট হইতে পারিত তাহা তাহার কোনো কাজে লাগিবে না।

এখনকার দিনে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শহরে গ্রামে, কৃষি ও ইণ্ডাস্ট্রিতে সমাজ বহুখণ্ড হইয়া গিয়াছে; একের সঙ্গে অন্যের যে যোগ নাই, মাত্র তাহা নয়—একটি অন্যের পরিপন্থী। এখানে কেহ কেহ জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিতে পারেন, বলিতে পারেন, সে ভেদ কি ভেদ নয়? জাতিভেদের ভেদ দাবার ছকের নানা রঙের ভেদের মতো—সবটা মিলিয়া তবেই তাহার সমগ্র চেহারা; ঐ ভেদটুকু আছে বলিয়াই পক্ষ প্রতিপক্ষ সাজিয়া খেলা চলে—সব একাকার হইলে কোনো কাজ চলে না। আসল কথা, বহুকাল হইল আমাদের সমাজ জাতিভেদটাকে তাহার ভালোমন্দসুদ্ধ স্বীকার করিয়া লইয়া কাজ চালাইবার মতো একটা ব্যবহারিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিল; আদর্শের বিচারে হয়তো খাটো ছিল—কিন্তু কোনোরকম করিয়া কাজ চলিয়া যাইত—একেবারে অচল অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। এই অচল অবস্থার উদ্ভব হইল অন্যপ্রকার ভেদে—ভারতীয় জীবনের উপর য়ুরোপীয় জীবনের সংঘাতে। ভারতীয় মন্ত্রের উপরে যখন য়ুরোপীয় যন্ত্র আসিয়া পড়িল, এদেশীয় সমাজচৈতন্যের উপরে যখন য়ুরোপীয় ব্যক্তিচৈতন্য আসিয়া পড়িল, তখন দেখিতে দেখিতে এদেশের শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শহরে গ্রামে, ব্যবসায়ে বাণিজ্যে ফাটল চৌচির হইয়া দেখা দিল। য়ুরোপ যে অরাজকতার সমুদ্রে আজ চার-শ বছর আগে পাড়ি ধরিয়াছিল, কালের দৈর্ঘ্যের

জন্য তাহার জীবনে যে পরিবর্তন মন্থরগতিতে আসিয়াছে, আমরা অত্যল্প সময়ে সেই অরাজকতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলাম। ফলে বিরাট একটা অরাজকতার সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাইতেছি, ডুবিব কি উঠিব জানি না—ইহার মধ্যে আত্মস্থ হইয়া মহাকাব্য-রচনার, চরম শিল্পসৃষ্টির সুযোগ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ অন্তত কৈশোরে ও যৌবনে এই সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন নাই। তিনি কিছুক্ষণের জন্য তীরে দাঁড়াইয়া, সমাহিত হইবার, সমগ্রটাকে দেখিবার, মহাকাব্যের আত্মস্থতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এখনকার বাঙালীর মতো সবটা মনোযোগ কেবল নিজের জন্যই তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয় নাই—আর তাহা করিতে হয় নাই বলিয়াই তিনি একসঙ্গে আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজের এই দুই চেহারাই দেখিয়াছেন।

তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলি মনে হয়, তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল এখন সেটা নাই। পূর্বেকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল সুতরাং মজলিস তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজলিসি মানুষ ছিলেন, তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজলিস করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তখন বাড়িতে কত আনাগোনা দেখিতাম—হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত। চারিদিকে সেই নানা লোককে জমাইয়া তোলা, হাসিগল্প জমাইয়া তোলা, এ একটা শক্তি—সেই শক্তিটাই কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। মানুষ আছে, তবু সেই-সব বারান্দা সেই-সব বৈঠকখানা যেন জনশূন্য। তখনকার সময়ের সমস্ত আসবাব আয়োজন ক্রিয়াকর্ম সমস্তই দশজনের জন্য ছিল—এইজন্য তাহার মধ্যে যে জাঁকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে। এখনকার বড়ো মানুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাহা নির্মম, তাহা নির্বিচারে

উদারভাবে আহ্বান করিতে জানে না—খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ সেখানে বিনা হুকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিতে পারে না।…

আমাদের মুশকিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবি সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই—মাঝে হইতে প্রত্যেক ঘর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য দেশহিতের জন্য দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি—কিন্তু কিছুর জন্য নহে, শুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইয়া জমাইয়া বসা—মানুষকে ভালো লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা—এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এত বড়ো সামাজিক কৃপণতার মতো কুশ্রী জিনিস কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য তখনকার দিনে যাঁহারা প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হালকা করিয়া রাখিয়াছিলেন—আজকের দিনে তাঁহাদিগকে আর কোনো দেশের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।[1]

সেইসব লোকের সামাজিক হাসি ক্রমবিস্তীর্ণ ফাটলের কীর্তিনাশা পার হইয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতিধ্বনিতে আসিয়া পৌঁছিতেছে—আর কয়দিন পরে এই প্রতিধ্বনিও আর শুনিতে পাওয়া যাইবে না।

সামাজিক মনের বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আচার-ব্যবহার আসবাবপত্র ঘরবাড়ির আকৃতি পর্যন্ত বদলাইয়া গিয়াছে। বৈঠকখানা হইয়াছে ড্রয়িংরুম, ফরাস হইয়াছে চৌকি-টেবিল। ফরাসে দশজনের জায়গায় ঠাসাঠাসি করিয়া পনেরোজন বসা যায়—কিন্তু চেয়ারের অনমনীয় সংকীর্ণতায় একের স্থানে দুইজনকে ধরে না। এক-একখানি চেয়ার যেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক-একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। আর বাড়িগুলির চেহারাতেই বা কত বদল হইয়াছে। চিৎপুর বাগবাজার অঞ্চলের বিরাট প্রাসাদোপম বাড়িগুলিতে কত তলা, কত কক্ষ, বারান্দার সে কি অকারণ উদারতা, আঙিনায় কি জনতাগ্রাসী প্রশস্তি, আর বিশাল বলিষ্ঠ স্তম্ভগুলির কি স্ফীতি! এ সব বাড়ি

[1] জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া"

কি শুধু মালিকের জন্য তৈয়ারি হইয়াছিল। এ-সব বাড়িতে যে আস্ত একটা পাড়ার লোক ধরিতে পারিত। আত্মীয়-স্বজন আপন-পর দূর-নিকট রবাহূত-অনাহূত সকরেই আশ্রয় ছিল এই-সব বাড়িতে। এ যেন এক-একটা সামাজিক দুর্গ—কেবল বাসস্থানমাত্র নয়। ইহাদের সঙ্গে কত প্রভেদ কলিকাতার নূতন পত্তনের বাড়ি-গুলির। ছাঁটাকাটা, বাহুল্যহীন, পায়রাখুপি। এত বেশি সংযত যে, ভালোবাসিতে পারা যায় না; এত বেশি ভদ্র যে, অভদ্র বলিয়া সন্দেহ জন্মায়! এইসব বাড়ির ফিলজফি কি? "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী।" এখানে রবাহূত-অনাহূত তো দূরের কথা, আপন স্ত্রীপুত্রকন্যাটি ছাড়া আর কাহারো স্থান নাই। এ যেন এক-একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিখা—কোনোমতে শুইয়া বসিয়া দুঃসময়ের রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিয়া দিবার জন্য। এক বাড়ির দশটি ফ্ল্যাটে যে দশটি পরিবার থাকে তাহারা কেহ কাহাকেও চেনে না, জানে না; চিনিবার জানিবার প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না। পাশের মানুষ সম্বন্ধে এতখানি যাহার নির্মম ঔদাসীন্য তাহারই কিনা আপিস হইতে আসিয়া পোশাক ছাড়িবার সবুর সয় না, রেডিও-সেটে চাবি ঘুরাইয়া দিয়া সে বুয়েনোস্ এয়ারিসের নূতনতম সংবাদ সংগ্রহ করিতে বসিয়া যায়। তাহার সব চেষ্টাই যে বৃথা চেষ্টা, তাহার কারণ পায়ের তলায় তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই; সামাজিক ভিত্তি বলো, জাতির ভিত্তি বলো—কিছুই নাই। আর তাহারই অবচেতন অভাব-মোচনের জন্য সে রেডিওর চাবি দিয়া একটার পরে একটা খুলিয়া যাইতে থাকে। শূন্যাশ্রয়ী ত্রিশঙ্কু ত্রিভুবনের পরিহাসের পাত্র, বড়জোর করুণার, তাহাকে দিয়া কোনো কাজ চলে না।

জীবনস্মৃতির যুগের সঙ্গে বর্তমানের প্রভেদটা বুঝাইবার জন্য আর-একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত-অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের

অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। ..

মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচ নির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।[১]

এমনটি কি আজকালকার দিনে হইতে পারে? ভোটের জন্য আমরা দরিদ্রের দ্বারস্থ হই বটে, সে আর-এক কথা। পরোপকারের জন্য দুর্গতের কাছে যাওয়া, তাহার মধ্যেও আত্মশ্রেষ্ঠতার চৈতন্য গুপ্ত থাকে। কিন্তু কেবল আমোদের জন্য, বিহারের জন্য এমন নির্বিচার সম্মিলন আধুনিক কালে কখনোই দেখা যায় না। গ্রামাঞ্চলে এখনো থাকিতে পারে, কিন্তু কলিকাতায় অসম্ভব। দ্বারকানাথের পৌত্রের চেয়ে ধন ও বংশমর্যাদায় যাঁহারা অনেক নিচে তাঁহারাও এমন নির্বিচার মিশ্রবিহারে নিশ্চয় রাজি হইবেন না। এই শিকারী দলটির কি অদ্ভুত বৈচিত্র্য! দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, রাজনারায়ণ বসুর মতো সাধু ও পণ্ডিত, ব্রজবাবুর মতো রাশভারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞাত-পরিচয় ছুতোর-কামার! এ যেন চসারের ক্যান্‌টারবেরি তীর্থযাত্রীর দল। জীবনস্মৃতির যুগে আজিকার মতো সমাজচৈতন্যের সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া যায় নাই। সেইজন্য দ্বারকানাথের পৌত্রকে ধরিয়া টান দিলে পাড়ার ছুতোর-কামার পর্যন্ত টান পড়িত। এখনো আমাদের হয়তো ছুতোর-কামারের সঙ্গে মিলিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা আছে—কিন্তু যতই টান দাও, টান বেশিদূর পর্যন্ত পৌঁছায় না; অনেক টানাটানির ফলে কেবল একটি-একটি গুটি খসিয়া হাতে আসে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের শুষ্ক রুক্ষ রুদ্রাক্ষের গুটি; সমগ্র সমাজ-মাল্যের আর দেখা পাই না—সূত্র যে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

১ জীবনস্মৃতি, "স্বাদেশিকতা"

তখনকার দিনে শহরে গ্রামে প্রভেদ প্রকট হয় নাই; শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধনের এক আসরেই স্থান ছিল। এই অতি-প্রাথমিক সত্য দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র পাতায় পাতায় ইহার প্রচুর উল্লেখ আছে।

২

জীবনস্মৃতি বাংলা সাহিত্যে বোধকরি সবচেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে লিখিত এই বইখানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্য-মণির মতো দুলিতেছে। ইহার পূর্বের ও পরের রবীন্দ্রনাথের স্টাইল সম্বন্ধে লোকের মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু জীবনস্মৃতির স্টাইল সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলে একমত। এই বইখানিতে কবি সকলের মন হরণ করিয়া লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে গ্যয়টের জীবনচরিত 'কল্পনা ও সত্যে'র অনেক মিল আছে। গ্যয়টেও তাঁহার জীবনচরিতের দ্বারা জার্মান পাঠকের মন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার 'ফাউস্ট' ও লিরিক কবিতাগুলি ছাড়িয়া দিলে জার্মান সাহিত্যে এমন সর্বজন-আদৃত পুস্তক আর নাই।

গ্যয়টে এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই জীবনকথা জীবনের সিংহদ্বারের কাছে আসিয়া অকালে থামিয়া গিয়াছে। জীবনের উদ্যোগপর্বটার বিশ্লেষণ করিয়া, যে-সব প্রভাব-উপাদানে তাঁহাদের জীবন গঠিত তাঁহারা তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেখান হইতে তাঁহাদের কবি-জীবন বৃহত্তর সংসারে প্রবেশ করিল সেখানে আসিয়া তাঁহারা নীরব। জীবনের উত্তরপর্বগুলি তাঁহারা লেখেন নাই কেন? তাহার কারণ, সে কাহিনী তাঁহাদের কাব্যে নাটকে গানে গল্পে লিখিত হইয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যেই তাঁহাদের জীবন।

বাস্তবিক গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথের মতো এমন আত্মজীবনাশ্রয়ী সাহিত্যিক আর আছেন কিনা সন্দেহ।

সম্প্রতি 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে 'ছেলেবেলা' যুক্ত হইয়াছে। দুই-ই জীবনী বটে, তবে দুইখানি দুই জাতের রচনা। এ সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি, সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা যাচ্ছে গাছে।[১]

এই প্রভেদ অন্য রকমেও বোঝানো যাইতে পারে। 'জীবনস্মৃতি' চিত্রশালা আর 'ছেলেবেলা' রূপকথার জগৎ। 'জীবনস্মৃতে'তে কবি জীবনকে দূর হইতে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যেন ছবি দেখার মতো। চিত্র আর চিত্রকরে দূরত্ব যতই থাক, তবু যোগ না থাকিয়া উপায় নাই। 'জীবনস্মৃতি'র জীবন-আলেখ্য ও কবির মধ্যে সেই রকমের প্রভেদ।

'ছেলেবেলা' রূপকথার জগৎ; সে যেন আর কাহারো সৃষ্টি, তাহার উপরে কবির কোনো কর্তৃত্ব যেন নাই। আর দশ জনের মতো তিনিও একজন দর্শকমাত্র। এমন হইবার কারণ, কবির বাল্যকাল ও এই গ্রন্থরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। শুধু তাই নয়, কবির ছেলেবেলার সেই যুগ, সেই আবহাওয়া, সেই সব নরনারী কবে বাস্তবলোক হইতে অপসারিত হইয়া কবির মনোলোকে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তব রূপ ছাড়িয়া আজ তাহারা যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সে রূপকথার রূপ।

দূরত্বের যথেষ্ট অভাবের জন্য জীবনস্মৃতির চিত্রশালায় কবি যে পরিপ্রেক্ষিতটি লাভ করেন নাই, ছেলেবেলাতে সেই রূপকথার পরিপ্রেক্ষিতটি লাভ করিয়াছেন। আর এই রূপকথার জগৎ হইতে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ বিবিক্ত মনে করিয়াছেন বলিয়াই পূর্বতন গ্রন্থে

---

১ ছেলেবেলা, ভূমিকা

সংকোচবশত যে-সব কথা বলিতে পারেন নাই, এবারে তাহা বলিয়াছেন। জীবনস্মৃতিতে যাহা ছিল নিজের কথা, বড়জোর শিল্পীর কথা—এবারে তাহা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর-এক ব্যক্তির কথা। ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, "ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক।" এ যে কেবল ছেলেমানুষ তাহা নয়, অন্য জগতের মানুষ; সে-জগৎ, পূর্বেই বলিয়াছি, রূপকথার জগৎ। আরো একটি লক্ষ্য করিবার মতো বিষয়—ছেলেবেলার স্টাইল লিখিত-সাহিত্যের স্টাইল নয়, তাহা রূপকথার স্টাইল—অর্থাৎ তাহাতে কলমের স্পন্দন তেমন ধরা পড়ে না, যেমন ধরা পড়ে রূপকথা বলিবার দীর্ঘবিতানিত লতানমনীয় কণ্ঠস্বর।

৩

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে যে-সব প্রভাব পড়িয়াছে, জীবন-স্মৃতি গ্রন্থে সেই-সব সূত্রের মূল বর্ণিত আছে। কবি যেন অন্তত একবারের জন্য নিজ জীবনের ইন্দ্রধনু বিশ্লেষণ করিয়া উপাদানগুলি পাঠককে দেখাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থের সুখপাঠ্যতা ছাড়িয়া দিলেও এইজন্যও ইহা রবীন্দ্রানুরাগীর পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিশ্বপ্রকৃতির। প্রকৃতি তাঁহার কাছে সবচেয়ে জীবন্ত, সবচেয়ে সত্য সত্তা। ইহা এমন অবিসংবাদিত সত্য যে, প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই—আশা করি, এ বিষয়ে পাঠক আমার সঙ্গে অভিন্নমত। সিদ্ধান্ত লইয়া যখন তর্কের অবসর নাই, তখন দেখাইলেই চলিবে যে, কোন অভিজ্ঞতার সোপান-পরম্পরা আরোহণ করিয়া কবি বিশ্বপ্রকৃতির অন্দরমহলে পৌঁছিয়াছেন।

শ্যাম নামে এক ভৃত্য-বালক রবীন্দ্রনাথকে সঙ্কীর্ণ এক গণ্ডি

টানিয়া তন্মধ্যে বসাইয়া রাখিত। বালক-কবি সেই গণ্ডিকে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতে না পরিয়া সেই সংকীর্ণ স্থানে বসিয়া বৃহত্তর বাহিরটাকে অনুমানের দ্বারা অতিরঞ্জিত করিয়া সৃষ্টি করিয়া উপভোগ করিতেন। এই শ্যামের গণ্ডির স্মৃতিই যেন সারাজীবন ধরিয়া তিনি মস্তিষ্কে বহন করিয়া চলিয়াছেন। স্বল্প অভিজ্ঞতার বাহিরের যে জীবন, কি মানুষের, কি প্রকৃতির, রবীন্দ্রনাথ তাহা কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন; তাহার কতক বাস্তবের সঙ্গে মেলে, কতক আবার মেলে না। যে-অংশে মেলে, পাঠক বেশ বুঝিতে পারে; যে-অংশে মেলে না, পাঠক বুঝিতে না পারিয়া বলে—রবীন্দ্রনাথে বস্তুতন্ত্র নাই।

শ্যামের গণ্ডির ফলে মানুষের সংসারকে যেমন তেমনি প্রকৃতিকে তিনি আড়াল-আবডাল হইতে দেখিয়াছেন। কলিকাতা শহরের প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে একটি অসহায় বালকের পক্ষে প্রকৃতির নিরাবরণ মূর্তি দেখিবার সুযোগ কোথায়? কিন্তু পুরাপুরি দেখিতে পান নাই বলিয়া কোনো ক্ষতি হইয়াছে মনে হয় না। অর্ধেক না-দেখার আগ্রহ তাঁহার চিত্তকে সতত সজাগ করিয়া রাখিয়াছে। গুণ্ঠন সুন্দর মুখচ্ছবিকে রহস্যময় করিয়া সুন্দরতর করিয়া তোলে। পাড়াগাঁয়ে জন্মিলেই যে প্রকৃতির আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথে অধিকতর হইত এমন মনে করিবার কারণ নাই, বরঞ্চ তাঁহার কবি-প্রকৃতি অনুধাবন করিয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, বালক-কালে পল্লীগ্রামের অবাধ প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চরণ করিবার সুযোগ পাইলে প্রকৃতির আকর্ষণ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রভাব হইয়া দাঁড়াইত না; হয়তো মানুষই প্রধানতম প্রভাব হইয়া উঠিয়া প্রকৃতি গৌণ হইয়া পড়িত। পল্লী প্রকৃতি-প্রধান, শহর মানবপ্রধান, কিন্তু কোন্‌টি যে কাহার উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা পূর্বাহ্নে বলা যায় না; অনেকটা নির্ভর করে মনের গড়নের উপর, এক একজন এক-একরকম প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে—রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা স্বভাবতই প্রকৃতিকে গ্রহণ

করিবার পক্ষে সহজ ছিল। শহরের অর্ধাবগুণ্ঠিত প্রকৃতি সেই প্রবণতার সাহায্য লইয়াছে মাত্র।

প্রকৃতির অন্দরমহলে পৌঁছিবার যে তিনটি ধাপের চিহ্ন জীবন-স্মৃতিতে দেখা যায় সেগুলি এই—জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রকৃতির দূরাপহৃত অর্ধগুণ্ঠিত মূর্তি দর্শন; গঙ্গাতীরে পেনেটির বাগানে প্রকৃতির কোলের কাছে উপবেশন; ও হিমালয়ে গিয়া প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিসর্জন।

জোঁড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।[১]

পেনেটির বাগানবাড়ির অভিজ্ঞতা—যখন প্রকৃতির সহিত কবির পরিচয় আর একটু ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে—

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।... প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।...কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর একবার নূতন

---

[১] জীবনস্মৃতি, "ঘর ও বাহির"

করিয়া জানিতে গিয়া পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল। আমরা বাহিরে আসিয়াছি, কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।[১]

হিমালয়ে গিয়া কবির স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে তাঁহার জগৎ অনেকটা বাড়িয়া গেল। দুপুরবেলা পড়িতে বসিলেই তাঁহার ঘুম পাইত—আর ছুটি পাইলেই

ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।... আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাড়াইয়া আছে, তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম।[২]

এবারকার হিমালয়-যাত্রার প্রভাব তাঁহার কবিকাহিনী ও বনফুল কাব্যে রহিয়াছে। তাহার গুরুত্ব এতই বেশি যে, ঐ সময়ে কবির হিমালয়দর্শন না ঘটিলে ও-দুইখানি কাব্য নিশ্চয় ঐ আকার পাইত না।

পরবর্তী কালে অর্থাৎ শিলাইদহ-পর্বে কবির কৈশোরের প্রকৃতির আকর্ষণের সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয় যুক্ত হইয়াছে এবং আরো পরবর্তী কালে অর্থাৎ শান্তিনিকেতন-পর্বে এ-দুইয়ের সঙ্গে নূতন একপ্রকার আধ্যাত্মিকতা সংযুক্ত হইয়া, কবির অভিজ্ঞতা ক্রমে পূর্ণতার মুখে চলিয়াছে।

৪

রবীন্দ্রনাথের উপরে মহর্ষির প্রভাব অল্প নয়। তবে ইহাকে প্রভাব বলিতে দ্বিধা হয় এইজন্য যে, ইহা প্রভাব না হইয়া, পিতা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইতেও পারে।

---

১ জীবনস্মৃতি, "বাহিরে যাত্রা"

২ জীবনস্মৃতি, "হিমালয়-যাত্রা"

মহর্ষির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন কবি ছিল—তাহার প্রধান পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার প্রকৃতিপ্রীতিতে। মহর্ষির পুত্রগণের মধ্যে, যতদূর জানি, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রই পিতার এই গুণ সবচেয়ে বেশি পাইয়াছিলেন।

মহর্ষি গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইলেও প্রচুর হাস্যরসবোধ তাঁহার ছিল; তাঁহার সব পুত্রেরাই পিতার এই গুণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই গুণ সর্বাধিক বর্তিয়াছে।

তার পর, মহর্ষি সাধক হইলেও বিষয়কর্মকে কখনো অবহেলা করেন নাই, তিনি নিপুণ বিষয়ী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রেও এই স্বাভাবিক বিষয়দক্ষতা দেখা গিয়াছে। কবি হইলেই যে সংসারবিমুখ অবিষয়ী হইতে হইবে, রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন তাহার সুদীর্ঘ প্রতিবাদ।

কিন্তু এগুলিকে প্রভাব বলা যায় না। এবারে যাহা বলিব, খুব সম্ভবত তাহা প্রভাবের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে মহর্ষি বছরের অধিকাংশ সময়ই বিদেশে কাটাইতেন—মাঝে মাঝে কখনও কদাচিৎ বাড়ি আসিতেন। পিতার এই অনুপস্থিতি বালকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল—বহু পরবর্তী কালে রচিত ‘শিশু’ কাব্যে তাহার পরিচয় আছে। ‘শিশু’ কাব্যের প্রধান চরিত্র শিশু-পুত্র ও তাহার মাতা। পিতা বিদেশে রহিয়াছেন, মাঝে মাঝে তাঁহার চিঠিপত্র আসে, এই পর্যন্ত। ‘শিশু’ কাব্যের শিশু কবির মাতৃহীন পুত্র; এই মাতৃহীন পুত্রের অভিজ্ঞতার সঙ্গে হয়তো নিজের অগোচরেই, নিজের পিতৃহীন (অনুপস্থিত অর্থে) শৈশবের স্মৃতি মিশিয়া গিয়া এই কাব্যের রসসৃষ্টির সাহায্য করিয়াছে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁহার জননীর প্রভাবের কথা বলা যাইতে পারে। বাল্যকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। সেই মাতৃ-বিয়োগের দুঃখ নূতন করিয়া এবং সত্য করিয়া—কারণ অল্পবয়সের দুঃখ অনেক সময় অল্পবয়সে মানুষ তেমনি করিয়া বুঝিতে পারে না

—কবি যেন পাইলেন নিজের পুত্রের মাতৃবিয়োগ। এই একখানি কাব্যে একই সঙ্গে পুত্রের ও নিজের মাতৃবিয়োগদুঃখ মিশ্রিত। ইহাকে যাঁহারা অসম্ভব মনে করেন, তাঁহারা মানুষের মনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ নহেন। কোন্ সূত্রের সঙ্গে যে কোন্ সূত্র মিশিয়া যাইতেছে, কখন কোন্ সমুদ্রের জোয়ার যে ইহার মোহনায় ঢুকিয়া পড়ে, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে। যে দুঃখ অবচেতন অবস্থায় ত্রিশ বছর কবির মনে ছিল, পুত্রের মাতৃশোকের উপলক্ষে তাহা অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া দুইপুরুষের অশ্রুর গঙ্গা-যমুনার যুক্তবেণীর তীরে অমর কাব্য রচনা করিয়া তুলিল।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপরে সবচেয়ে বেশি। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, নিজের লেখাপড়ার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বাস করিতেন; সত্যেন্দ্রনাথও বয়সে যথেষ্ট বড়, তা ছাড়া চাকুরি উপলক্ষে দূরে দূরে থাকিতেন। হেমেন্দ্রনাথ বড় রাশভারী লোক ছিলেন, বিশেষ তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রভৃতির অব্যবহিত কর্তৃপক্ষ। কাজেই ইঁহাদের কাহারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অবকাশ কবির ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট বড় হইলেও, তিনি অনুজকে বন্ধুরূপে কাছে টানিয়া লইলেন। হেমেন্দ্রনাথ ইংরেজী শিক্ষাকে গৌণ স্থান দিয়া রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকে বাংলা ভাষার পথে চালিত করিয়া তাঁহার মহদুপকার করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অনেক বেশি। তিনি সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিজের সঙ্গে টানিয়া লইয়া অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালো-মন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।[১]

১ জীবনস্মৃতি, "গীতচর্চা"

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো-ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু এই সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোট। বয়সের এতদূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি বলে কখনো আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয়নি।...এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম স্বর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।[১]

জ্যোতিরিন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে সঙ্গীতে শিকারে অভিনয়ে সঙ্গী করিয়া লইয়া একদিনে তাঁহার বয়স বারো বছর বাড়াইয়া নিজের সহচর করিয়া লইলেন।

কবির কাব্য ও জীবনের উপর তাঁহার নতুন-বৌঠাকরুনের কিছু প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। এই মাতৃহীন বালককে স্নেহের সাহচর্য দ্বারা তিনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম মৃত্যুশোক পাইয়াছিলেন—"আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল সে স্থায়ী পরিচয়।"

কিন্তু ইনি ছাড়া আরো একটি মহিলা কিশোর-কবির জীবনে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বিলাতযাত্রার পূর্বে ইংরেজি শিখিবার উদ্দেশ্যে "কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম।" এই বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে, মেয়েটিও রবীন্দ্রনাথকে কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। তার পরে

কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে, শুনলেন সেটা

---

১ ছেলেবেলা, ১০

ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে, বললেন, কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণ-দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।[১]

কবি যখন নামটি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন নাই, তখন আমাদের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইবে, কিন্তু এই নামটি তাঁহার কাব্যে একবার মাত্র নয়, বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে। নামের গুরুত্ব কি এতই? বোধ করি বাস্তবরূপের চেয়ে নাম-রূপই অধিকতর সত্য।

সে যাই হোক, এই মেয়েটি যে কবিকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তাঁহার "দিনরাত্রির দাম" বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, 'ছেলেবেলা'তেই তাহার উল্লেখ আছে।

আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবন-যাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিন-রাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।[২]

এ তো গেল মানুষের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোনো কোনো বাড়ির প্রভাবও রহিয়া গিয়াছে। এককালে যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়ির ছবি সেদিনকার সুখদুঃখের বিচিত্র স্মৃতি বহন করিয়া তাঁহার কাব্যের মধ্যে গানের ধ্রুবপদের মতো ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহাদের মধ্যে প্রধান, মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি। ইহা ছাড়া শাহিবাগের জজের বাড়ি, পেনেটির বাগানবাড়ি, শিলাই-দহের কুঠিবাড়ির স্মৃতি তাঁহার কাব্যে বহুত্র রহিয়াছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির কথা জীবনস্মৃতির "গঙ্গাতীর" পর্যায়ে এবং

---

১ ছেলেবেলা, ১৩

২ ছেলেবেলা, ১৩

'ছেলেবেলা'র ১৩ অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবৃত আছে। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিতেছেন—

ঘরগুলি সমতল নহে, কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে।[১]

এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, উত্তরায়ণের প্রথম বাড়িটি যেন মোরান সাহেবের বাড়ির ছাঁচেই গঠিত। পরবর্তী কালে কবি অনেক সময়ে বোটে করিয়া বেড়াইবার সময়ে মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি যে-অঞ্চলে ছিল, সেখানে গিয়া নৌকা ভিড়াইয়া থাকিতেন। সে বাড়ি কবে ডাণ্ডির কারখানা গ্রাস করিয়াছে, মুগ্ধ চিত্ত তবু তাহারই আশেপাশে ঘুরিয়া সান্ত্বনা পাইবার আশা পোষণ করিত।

৫

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বিহারীলালের মতো কবিতা লিখিবেন। বিহারীলালকে একদা তিনি অনুকরণ করিতেন; কিন্তু অতি অল্প বয়সেই বিহারীলালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত হইতে তাঁহার কাব্য প্রকাশ্য মনে করেন; তৎপূর্বের কাব্য এতদিন অপ্রচলিত ছিল। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বেই তিনি বিহারীলালের প্রভাব উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রভাব দেখিতে হইলে 'বনফুল', 'কবি-কাহিনী' ও 'শৈশবসংগীত' পড়িতে হইবে। 'শৈশবসংগীত' হইতে একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরনা দিতেছে ঢালি।
মলয় ঢালিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ডালি।

[১] জীবনস্মৃতি, "গঙ্গাতীর"

ইহার অনুরূপ বিহারীলালের বিশিষ্ট ছন্দ—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।...এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।[১]

রবীন্দ্রকাব্যে বিহারীলালের প্রভাব সম্বন্ধে যে-পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহার যথোচিত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বিহারীলালের প্রভাব যে রবীন্দ্রকাব্যকে যথার্থ পথের নিশানা দিয়াছে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। বরঞ্চ বিহারী-লালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার পরেই রবীন্দ্রকাব্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়াছে। তবে বিহারীলালের স্বপক্ষে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, যে-সময়ে মাইকেলের প্রভাবে বাংলা কাব্য প্রধানত বহির্মুখী ছিল তখন বিহারীলাল রবীন্দ্রকাব্যকে হয়তো কিয়ৎ-পরিমাণে অন্তর্মুখীনতার ইশারা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এমন মনে করি না যে, বিহারীলালের কাব্যের ইঙ্গিত ব্যতিরেকে রবীন্দ্রকাব্য অন্তর্মুখী হইতে পারিত না—অন্তর্মুখীনতাই তাহার স্বাভাবিক খাত। কিন্তু কি হইতে পারিত তাহার বৃথা আলোচনা না করিয়া যাহা হইয়াছে তাহাকে অনিবার্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াই ভালো।

হেমচন্দ্রের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতায় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়—কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যে এইসব প্রভাব অন্তর্হিত হয়।

১ জীবনস্মৃতি, "সন্ধ্যাসংগীত"

আজি পূরনিমা নিশি,
তারকা-কাননে বসি
অলস-নয়নে শশী
মৃদু হাসি হাসিছে।
পাগল পরানে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাবিছে।[১]

শৈশবসংগীতের অধিকাংশ কবিতা রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের রচনা। এই কাব্যের "হরহৃদে কালিকা" কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট।

কে তুই লো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে
ভিখারীর সর্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে?…
তখনো রবি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনা-বাসনা-হীন এই বুক মাড়ায়ে?

ক্রিয়াপদের মিল ব্যবহার হেমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। এই কবিতায় অধিকাংশ মিল ক্রিয়াপদিক।

হেমচন্দ্রের প্রভাবযুক্ত আরও কয়েকটি বাল্যরচনা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।[২]

হিমাদ্রিশিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি—

১ শৈশবসংগীত

২ "অভিলাষ"। কবিতাটি মুদ্রণকালে কবির বয়স তেরো বৎসর সাত মাস; দ্রষ্টব্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়।

কাঁপায়ে পর্বতশিখর কানন
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।[১]

এই জাতীয় প্রভাবযুক্ত অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু স্বদেশ-প্রীতি। স্বদেশপ্রীতি বিশেষ করিয়া যে হেমচন্দ্রের কাব্যেরই বিষয়-বস্তু এমন নয়—তখনকার কালের অধিকাংশ কবিরই ইহা অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। কাজেই ভাবসাম্যের দ্বারা প্রভাব বিচারের চেয়ে ছন্দঃস্পন্দের সাম্যের দ্বারা বিচার করাই যুক্তি-যুক্ত। যে-সব কবিতা উদ্ধার করিলাম তাহাদের ছন্দঃস্পন্দ স্পষ্টত হেমচন্দ্রীয়। শৈশব-সংগীতের পরেই রবীন্দ্র-কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রভাব তিরোহিত হয়।

তৎকালীন কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁহার প্রভাব একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।[২]

ইহার কারণ কি? মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও কাব্যধর্ম এমনই বিপরীত যে, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেও অবচেতনভাবে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হন নাই। কবিধর্মের কিছু সাম্য থাকিলে তবেই আকর্ষণ সম্ভব, আর আকর্ষণের ফলেই প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের দ্বারা প্রভাবিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না বটে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে তাঁহার কাব্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে আক্রমণ করিয়াই তিনি সমালোচক-জীবন আরম্ভ করেন; পরিণত বয়সেও মাইকেল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনো

১ "হিন্দুমেলার উপহার"। কবির বয়স তেরো বৎসর নয় মাস; দ্রষ্টব্য, তদেব।

২ বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ, ১৩৫০, সংখ্যায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন রচিত, 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা" নামে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইহাতে লেখক রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় হেমচন্দ্র মধুসূদনের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কবির বাল্যরচনায় একটি মাত্র অংশে মাইকেলের প্রভাব তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তদ্দারা বর্তমান লেখকের উক্তি অপ্রমাণ না হইয়া বরঞ্চ অধিকতর প্রমাণিত হয়।

স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে এই দ্বন্দ্বের কারণ উভয়ের কবিধর্মের ঐকান্তিক বৈষম্য। মাইকেল 'সন্ধ্যাসংগীত' পড়িলে বিচলিত হইতেন—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসায় বোধ করি সম্মতি দিতেন না।

অবশ্য মাইকেল-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই ইহাকে মাইকেলের প্রভাব বলিতে পরা যায়। কিন্তু মাইকেলী অমিত্রাক্ষরে আর রাবীন্দ্রিক অমিত্রাক্ষরে প্রভেদ আছে। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর এপিকোচিত, কোনো কোনো স্থলে নাটকোচিত; আর রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর কখনো কখনো নাটকোচিত হইলেও অধিকাংশ স্থলে লিরিক-ধর্মাক্রান্ত; সে চলিতে গিয়া নাচিয়া ওঠে, বলিতে গিয়া গাহিয়া ওঠে; তাঁহার অমিত্রাক্ষরের অভিসারিকা পায়ের নূপুর খুলিতে ভুলিয়া যায় বলিয়াই অন্ধকারেও সে শ্রুতিগম্য হইয়া উঠে।

এই পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যে যে-সব প্রভাবের কথা বলা হইল তাহা নিতান্ত বাহ্য, অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের বহির্লোকে মাত্র তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই তিরোহিত হইয়াছে। এবারে যে তিন কবির কথা বলিতেছি, তাঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্লোক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে—বৈষ্ণব কবি, শেলি ও কলিদাস। পূর্ববর্তী কবিদের ন্যায় ইঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কৈশোরপর্বে মাত্র পর্যবসিত নয়—ভিন্ন আকারে, সূক্ষ্মতর ভাবে ইঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সহচর হইয়া পরিণত বয়স পর্যন্ত চলিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যে। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতা কবির ষোল হইতে বিশ বছর বয়সের মধ্যে রচিত। বিহারী-লালের মতো বৈষ্ণব কবিরাও রবীন্দ্রনাথের মুখ বহির্জগৎ হইতে

অন্তর্জগতের দিকে ফিরাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের উপরে ইহাই বৈষ্ণব কবিদের সবচেয়ে বড় প্রভাব।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত। বৈষ্ণব কাব্যের পিছনে একাধারে শিল্প ও সাধনা রহিয়াছে। ভানুসিংহে তাঁহাদের শিল্পটাই শুধু আছে, সাধনা নাই। ইহার সগোত্র বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে পাওয়া যাইবে না—ইহার একমাত্র সগোত্র ও অগ্রজ মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্য। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের কাব্যে শিল্প ও সাধনা একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ভানুসিংহের পদাবলীতে তাহা খুঁজিতে যাওয়া বৃথা।

কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে পড়িয়াছেন, কুমারসম্ভবের কিয়দংশ অনুবাদও করিয়াছেন। তবে কালিদাসের প্রভাব তাঁহার কাব্যে 'মানসী'র সময় হইতে কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছে; এই সময় হইতেই কালিদাসের কাব্য ও দর্শন রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বিদেশী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপরে শেলির প্রভাব গভীরতম। অনেকের ধারণা 'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে শেলির প্রভাবের যুগ—বাস্তবিক তাহা নয়। 'কবি-কাহিনী' ও 'বনফুল'-এও শেলির প্রভাব অবিরল। শেলির সমাজ-অসহিষ্ণুতা, তাঁহার শ্রেণীবর্ণশাসনহীন সমাজ-পরিকল্পনা, তাঁহার মানবহীন বিশুদ্ধ প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ, আর প্রকৃতির হাতেই যে মানবজীবনের সর্বদুঃখের সর্বৌষধ আছে এই ধারণা—এ সমস্তই পূর্বোক্ত দুই কাব্যে আছে। শেলির ভাব ও অলংকারের আতিশয্যজাত অসংযম, ছবির পরে ছবি আঁকিয়া রেখান্যাস অস্পষ্ট করিয়া ফেলা, রঙের পরে রঙ ঢালিয়া ঝাপসা করিয়া দেওয়া—শেলির এই সব শিল্পরীতির অনেকগুলিই 'কবি-কাহিনী' হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুত বৈষ্ণব কবিদের চেয়েও কালিদাস ও শেলির প্রভাব তাঁহার কাব্যে ও সাহিত্যে অধিকতর গভীর ও দীর্ঘতরস্থায়ী। ইহার সঙ্গে আছে উপনিষদের তত্ত্ব।

৬

এই তিনটিই রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্থায়ী ও সজীব প্রভাব, ইহাদের কার্যকারিতা দেহান্তরে রূপান্তরে তাঁহার জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার পক্ষে বড় আনন্দের নয়। স্কুলের লেখাপড়ায় কোনোদিন তিনি মন দিতে পারেন নাই। স্কুল পরিবর্তন করিয়া যখন কোন সুফল হইল না, তখন কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হইয়া তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিলেন; রবীন্দ্রনাথও যেন নিষ্কৃতি পাইলেন।

স্কুলের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণ কি? আগেই বলিয়াছি, শৈশব হইতেই প্রকৃতির প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের ছিল। বাড়িতে বসিয়া আড়ালে-আবডালে প্রকৃতির যে রূপ তিনি দেখিতে পাইতেন, স্কুলে গিয়া তাহাও যেন তাঁহার কাছে লুপ্ত হইয়া গেল। প্রকৃতির-স্পর্শহীন স্কুল-অট্টালিকার নীরস শুষ্ক জঠরের মধ্যে কিছুতেই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। এই প্রকৃতির স্পর্শের অভাবও কতক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে যদি তাহার বদলে মানুষের প্রীতি পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে তাহারও অভাব। সেখানে মানুষ দুইটি মাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত; ছাত্র ও শিক্ষক। কিন্তু এ বিভাগ তো একান্ত কৃত্রিম। সংসারে কেহ ছাত্র ও শিক্ষক-রূপে জন্মগ্রহণ করে না; সংসারের বিভাগ পুত্র কন্যা, পিতা মাতা, ভাই বন্ধু রূপে। কিন্তু স্কুলে তাহা কোথায়? পিতা মাতা, পুত্র কন্যার স্পর্শ হৃদয়ে হৃদয়ে; ছাত্র শিক্ষকের স্পর্শ মাথায় মাথায়; এই মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকির মধ্যে বুদ্ধির স্পর্ধা আছে, অন্তরের টান নাই। কাজেই এখানে তিনি প্রকৃতির স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইলেন, তৎপরিবর্তে মানুষের অন্তরের স্বাদও পাইলেন না। ফলে স্কুল-জীবন তাঁহার কাছে দুঃসহ হইয়া উঠিল।

প্রত্যেক কল্পনাপ্রবণ বালকেরই হয়তো স্কুল-জীবনে প্রথমে এমন অভিজ্ঞতা ঘটে, কিন্তু অভ্যাসের আবর্তনে ও কর্তৃজনের তাড়নায় শীঘ্রই তাহারা এই অবস্থায় অভ্যস্ত হইয়া যায়; শেষে অস্বাভাবিকটাই তাহাদের কাছে স্বাভাবিক হইয়া ওঠে; আবার তাহারা শিক্ষকশ্রেণীতে পরিবর্তিত হইয়া কোমলমতি বালকদিগকে অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করিয়া লইতে শিক্ষা দেয়। এ এক বিষম বিষচক্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, কর্তৃপক্ষও তেমন গরজ দেখাইলেন না, ফলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক হইয়াই রহিল।

পরিণত বয়সে এই দুঃখের অভিজ্ঞতা তিনি ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া দেশের বালকদের রক্ষা করিবার জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন তাহা প্রচলিত প্রথার রীতিমত স্কুল নয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত; এখানকার চরম বিভাগ ছাত্র ও শিক্ষক নয়; ইহা একটি সুবৃহৎ আশ্রম-পরিবার। নিজ নিজ পরিবার হইতে ছিন্ন হইয়া আসিয়া বালকেরা এই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত হইয়া কতক পরিমাণে পারিবারিক স্নেহস্পর্শ পায়। এই বিদ্যালয়ে প্রকৃতি ও মানুষে হাত মিলাইয়া বালকদিগকে গড়িয়া তোলে। কিন্তু কেবল প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের জগৎ নয়—প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিন সত্তা মিলিয়া তাঁহার জগতের সম্পূর্ণতা। শান্তিনিকেতনে সাম্প্রদায়িকতানির্মুক্ত ভগবানের বিশুদ্ধ রূপের শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। যখন দেশের প্রচলিত স্কুলগুলি হইতে প্রকৃতি ও ভগবান নির্বাসিত, মানুষেরও মাত্র খণ্ডিত অস্বাভাবিক সম্বন্ধ, সেই সময়ে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে এই তিন সত্তাকে সম্মিলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা দেশের শিক্ষা-প্রথায় যে কতবড় যুগান্তর, অস্বাভাবিক অবস্থায় আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত না হইয়া গেলে তাহা বুঝিতে পারিতাম। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের মধ্যে পূর্ণতার প্রতি

যে আগ্রহ আছে, সেই পূর্ণতারই বাস্তব প্রকাশ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জীবন।

স্কুলের পড়ায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উপকার হয় নাই বটে, কিন্তু সে ক্ষতি পূরণ হইয়া গিয়াছিল বাড়ির পড়ায় ও বাড়ির আবহাওয়ায়। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া কুস্তি শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি নয়টা পর্যন্ত তাঁহার আর বিরাম ছিল না। কখনো বাংলার মাস্টার, কখনো সংস্কৃতের, কখনো বা ইংরেজির ; তাহা ছাড়া বিজ্ঞান ছিল, ব্যাকরণ ছিল, শারীরতত্ত্ব ছিল ; সংগীত তো ছিলই। সব বিষয় তাঁহার সমান ভালো লাগিত এমন নয় ; যে বিষয়ে রস পাইতেন তাহাতে অগ্রসর হইয়া যাইতেন ; যে বয়সে তিনি কুমারসম্ভব পড়িয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ বালকের ঋজুপাঠ পড়িবার সময়।

কিন্তু বাড়ির পড়ার চেয়ে বাড়ির আবহাওয়ায় তাঁহার বেশি উপকার হইয়াছিল। তৎকালে ঠাকুরবাড়ি বাংলা দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সর্বাগ্রণী ছিল। দেশের যত গুণী জ্ঞানী সকলের যাতায়াত ছিল সেখানে ; সংগীত, অভিনয়, কাব্যচর্চা নানাদিক দিয়া নাড়া খাইয়া বালকের মন প্রত্যূষেই জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তার পরে আর কোনোদিন ঘুমাইয়া পড়ে নাই।

ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।...আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্রদাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল।[১]

১ জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া'

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে বহুমুখিতা আছে, পূর্ণজীবনের প্রতি যে একটা আকর্ষণ আছে, বালককালের এই অভিজ্ঞতাই তাহার মূলে, এ-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোট ডেক্‌স লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন।...তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম। · সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কিনা জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—তাহার আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।[১]

বাড়ির আবহাওয়ায় নানাদিক হইতে নানারকমের তরঙ্গ তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িয়া তাঁহার কবি-মনকে নানাদিক হইতে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছিল। বাড়ির এক-একজনের এক-একদিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কাহারও কাব্যে, কাহারও সংগীতে, কাহারও চিত্রে, কাহারও তত্ত্বে, কাহারও ধর্মে এবং স্বাদেশিকতায়—এ সমস্তই যেন একাধারে এই বাড়ির একটি বালকের মধ্যে আসিয়া বর্তিয়াছে। বাড়ির এই বহুমুখী নিয়তজাগ্রত পূর্ণতা-প্রয়াস আবহাওয়াই রবীন্দ্রনাথের জীবনতন্ত্র গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৭

রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, অনেক লেখক চরিত্রসৃষ্টি করিবার সময়ে বাস্তব মানুষের একটা রূপ সামনে রাখেন, তাহার উপরে রং ফলাইয়া কারিগরি করিয়া তাঁহার নূতন চরিত্র গড়িয়া তোলেন—কিন্তু তাঁহার চরিত্রসৃষ্টির সময়ে সম্মুখে তেমন কোনো বাস্তব মানুষ

১ জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া"

থাকিত না। ইহা অংশত সত্য হইলেও সর্বতোভাবে সত্য বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক চরিত্র দেখা যায়, যাহাদের বাস্তবরূপ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে আছে বলিয়া মনে হয়! তাঁহার বাল্যকালে দেখা অনেক মানুষ পরিবর্তিত হইয়া তাঁহার কাব্যে নূতন জন্ম লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ঠাকুরদাদা বলিয়া সর্বজনপ্রিয়, ছোটো বড়ো সকলের সমানভাবে সাথী, সংগীতমুখর ও সুরসিক একটি চরিত্র আছে। এই ঠাকুরদাদা, অবস্থাভেদে দাদাঠাকুর, দাদা প্রভৃতি নানা নাম ধারণ করিয়াছে। এই পর্যায়ের আরম্ভ বোধ করি 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর বসন্ত রায়ে। এই চরিত্রটি কবির জীবনের পরিণতির সঙ্গে অভিব্যক্ত হইতে হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে। এই চরিত্রেব বাস্তব মূল 'জীবনস্মৃতি'র শ্রীকণ্ঠ সিংহ। এই বৃদ্ধ ভক্ত তাঁহাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন। মহর্ষির সঙ্গেও যেমন অনায়াসে তিনি মিশিতে পারিতেন, তেমনি অনায়াসে মিশিবার তাঁহার শক্তি ছিল মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত; বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলের তিনি সমানবয়সী ছিলেন। তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিল সেতার, মুখে তাঁহার সর্বদা সংগীত। এই সংগীতরসিক, অজাতশত্রু, সকলের সমবয়সী বন্ধুই, কবির সৃষ্ট ঠাকুরদাদা চরিত্রের বাস্তব মূল বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথকে তাঁহার 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। বৈকুণ্ঠের পাণ্ডিত্য, রচনার বাতিক, তাঁহার দুরূহ রচনা শুনিবার লোকের অভাব, আবার রচনা শুনিবার নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা পয়সা আদায়, তাঁহার সংসারে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি সমস্তই দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে ঘটিয়াছিল।

'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রমাধব চরিত্রের বাস্তব উপাদান সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর], কতক রাজনারায়ণবাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ—এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে। কিন্তু কোনো রিয়াল্ মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে-রকম প্রতীয়মান সে-রকমভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়।⋯ চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছসারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলায় সরলার কল্পনা উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে—কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিস আছে যা তাঁদের কারোই নয়।[১]

'চিরকুমার সভা'র অক্ষয় চরিত্রও দুই চরিত্রের মিশলে সৃষ্ট। 'জীবনস্মৃতি'র অক্ষয় চৌধুরী ও কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে কবির কল্পনা মিশিয়া অক্ষয়কে রচনা করিয়াছে। অক্ষয় চৌধুরীর কবিত্বশক্তি, কাব্যানুরাগ, বাক্‌পটুতার সঙ্গে কিশোরী চাটুজ্যের সংগীত-তৎপরতার মিশ্রণে 'চিরকুমার সভা'র অক্ষয়ের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে তাঁহাদের বাড়িতে একটি বালকভৃত্য ছিল,

তার নাম শ্যাম, বাড়ি যশোরে খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতীয়া নয়।⋯তার রং ছিল শ্যামবর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেলচুকচুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে তার ছিল দরদ।[২]

ঠিক এই রকম একটি ভৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে।

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে, তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপছিপে বালক।

খুব সম্ভব বাস্তব শ্যাম কালক্রমে গল্পের রাইচরণে পরিণত হইয়াছে।

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৫০, "পত্রাবলী"

২ ছেলেবেলা, ৬

৮

'ছেলেবেলা' গ্রন্থে বালক রবীন্দ্রনাথের কাজকর্মের যে পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, তাহাতে এই বালককে একেবারে নিজেদের ঘরের বলিয়া মনে হয়। পরিণত রবীন্দ্রনাথকে ঘরের বলিয়া কে কল্পনা করিতে পারে। ইস্কুলের পণ্ডিতমহাশয়ের ইঙ্গিতে এই বালক একদিন নিজেদের বাড়ি হইতে কেয়া-খয়ের 'অপহরণ' করিয়াছিল। আবার ইস্কুল হইতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চিংড়িমাছের চচ্চড়ি দিয়া লঙ্কামাখা পান্তাভাত খাইত। সরু করিয়া সুপারি কাটায় তাহার নাকি দক্ষতা ছিল। আর শিলাইদহে সেই ফুলের রস দিয়া কবিতা লিখিবার চেষ্টা! এ যে নিতান্ত ছেলেমানুষি। ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ই যে 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে।

কিন্তু এ কেমন ছেলেমানুষ! কিশোর কবির মনে ও কাব্যে পরিণত মহাকবির কাব্যের সব ভাব যেন ছায়াশরীরী আকারে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

য়ুরোপীয় সমালোচকগণ তাঁহাদের দেশের লেখকদিগকে মনের গঠন অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন, জাতীয় ও য়ুরোপীয়; একদল লেখকের রচনায় জাতীয় উপাদান অধিক, অপর দলের রচনায় য়ুরোপীয় উপাদান। এই দুই শ্রেণীকে অল্প পরিবর্তিত করিয়া বলা যাইতে পারে—জাতীয় ও সর্বমানবীয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে সর্বমানবীয় উপাদান অধিকতর। মানুষকে জাতি-দেশ-সম্প্রদায়-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানবমাত্ররূপে দেখিবার সহজাত শক্তি লইয়াই যেন তিনি জন্মিয়াছিলেন। ইহা বৈদেশিক সংস্কৃতি বা বিদেশভ্রমণের ফলে সঞ্জাত নহে—কারণ বিদেশ গমনের

পূর্বেই তাঁহার কৈশোরের রচনাতে প্রভূত পরিমাণে ইহা লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গত, এখানে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার এ বিষয়ে প্রভেদ তুলনীয়। মাইকেল মধুসূদন কিশোর বয়স হইতে বৈদেশিক সংস্কৃতির মধ্যে ডুবিয়াছিলেন; তাঁহার বিলাত গমনের অস্বাভাবিক (সেকালের পক্ষে স্বাভাবিক) আগ্রহের ফলে বিদেশগমনের পূর্বেই বিদেশই যেন তাঁহার দেশ হইয়া গিয়াছিল; ধর্মে সংস্কৃতিতে ভাষায় তাঁহাকে বিদেশীই বলিলে যেন চলে। কিন্তু লেখক হিসাবে তাঁহার ধাত ছিল জাতীয় লেখকের; তিনি তাৎস্থানিক ও তাৎকালিকের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই বলিয়া মানুষের বিশুদ্ধ রূপ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই; তাঁহার রাম, রাবণ, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ—সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী।

কৈশোরে বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মাইকেলের মতো গভীর ছিল না, কিন্তু সহজাত শক্তির বলেই তিনি অনায়াসে যেন তাৎকালিক ও তাৎস্থানিকের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিশুদ্ধ মানুষকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৈশোরে বিলাতে গিয়া সেখানকার মানুষকে দেখিয়া তাঁহার এই সহজাত বোধ সমর্থিত হইয়াছিল মাত্র। যে ইংরেজ-পরিবারে তিনি ছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—

> এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটা বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই।[১]

ভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহার-প্রথা ভেদ করিয়া মানুষের অন্তরতর

---

১ জীবনস্মৃতি, "বিলাত"

রূপটি দেখা, বিশেষ এত অল্পবয়সে, সহজ কথা নয়—ইহার জন্য সহজাত শক্তির প্রয়োজন।

'ছেলেবেলা' গ্রন্থে এই ভাবটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন—

আমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমসলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধ্যেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা করে কাব্য নাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন। বিলেতে গেলেম, ব্যারিস্টার হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।[১]

রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাই যে সর্বমানবীয় উপাদানে রচিত। এইদিকে স্বাভাবিক প্রবণতা না থাকিলে কেহ এত অল্পবয়সে এমন অনায়াসে বৈদেশিক আবহাওয়ার কুয়াশা ভেদ করিয়া জাতি-দেশ-সম্প্রদায়-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানুষের রূপ দেখিতে পায় না। সর্বমানবীয়তা তাঁহার সাহিত্যের প্রধান উপাদান বলিয়াই বিদেশের পক্ষে তাঁহাকে বুঝিতে পারা বোধ করি এত সহজ হইয়াছিল। আবার তাঁহার কাব্যে তাৎস্থানিকতা গৌণ বলিয়াই দেশের লোকের পক্ষে তাহা অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিতে বোধ করি এমন বিলম্ব হইয়াছিল। রবীন্দ্র-কাব্যে 'বিশ্ববোধ' কবির জীবনের পরিণতির সঙ্গে পল্লবিত পুষ্পিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু অঙ্কুররূপে তাহা গোড়া হইতেই বর্তমান ছিল।

১ ছেলেবেলা, ১৪

৯

জীবনস্মৃতির ভাষারীতি বা স্টাইলের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির একটি প্রধান লক্ষণ অলঙ্কারবাহুল্য ; অলঙ্করণবহুল গদ্য সব ক্ষেত্রে গুণ নয়, অনেক ক্ষেত্রেই দোষ। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাময়িক প্রবন্ধাদির একটি প্রধান দোষ অলঙ্করণবহুলতা। অন্যত্র ইহা গুণ, যেমন বিচিত্র প্রবন্ধে বা প্রাচীন সাহিত্যে ; অলঙ্করণবাহুল্য তাঁহার গদ্যরীতির সাধারণ লক্ষণ, কৈশোরের রচনা হইতে বার্ধক্যের রচনা সর্বত্র সমান ভাবে বর্তমান। কিন্তু মাঝখানের একটা পর্বের কতকগুলি রচনায় অলঙ্করণপ্রবণতা অনেকটা কম। 'জীবনস্মৃতি' ও 'গোরা' এই পর্বের সেই শ্রেণীর রচনা। বোধ করি 'জীবনস্মৃতি'র চেয়েও 'গোরা'তে অলঙ্কার অল্প। এই সময়টাকে তাঁহার গদ্য রচনারীতির মধ্যপর্ব বলিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্বদ্বয়ের অধিকাংশ গদ্যগ্রন্থ অলঙ্কারভারে মন্থরগতি। পরবর্তী পর্বে অলঙ্কারের ব্যবহার পূর্ববর্তী পর্বের চেয়েও বোধকরি বেশি। বিচিত্র পর্যায়ের উৎপ্রেক্ষা ও উপমাকে 'ঘরে বাইরে' বা 'শেষের কবিতা'র মতো উপন্যাসের ভাবের বাহন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মে'র মতো সাময়িক প্রবন্ধও অলঙ্কারভারে বিব্রত।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত মধ্যপর্বে রচিত 'গোরা' ও 'জীবনস্মৃতি'র ন্যায় গ্রন্থ বহুল পরিমাণে এই দোষ হইতে মুক্ত—আর সেই জন্যই তাঁহার এই পর্বের গদ্যরীতি এমন একটি ঋজুতা ও দার্ঢ্য লাভ করিয়াছে যাহা অনন্যসাধারণ। ঋজুতা ও দৃঢ়তা সুসমন্বিত হইলে গদ্য ভারসাম্য লাভ করে—উহাতেই গদ্যের পরাকাষ্ঠা। গোরা ও জীবনস্মৃতির ভাষায় যে ভারসাম্য দেখি রবীন্দ্র-গদ্যের অন্যত্র তাহা বিরল। তাহার পরবর্তী গদ্যে নমনীয়তা, লঘুতা প্রভৃতি গুণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তাহাকে সাধারণভাবে গদ্যরীতির আদর্শ বা রবীন্দ্র-গদ্যরীতির আদর্শ বলা

চলে না। উক্ত গদ্যরীতির উত্তরপুরুষ রবীন্দ্রনাথের গদ্যচ্ছন্দ বা গদ্য-কবিতা। সমসাময়িক গদ্যরীতি বা পদ্যরীতির (গদ্য-কবিতাকে পদ্য বলিয়া ধরিলে) উপরে উহার প্রভাব সমধিক হইলেও উহা গদ্য রচনার আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ। উহা রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশিষ্ট সরণী বলিয়া চিহ্নিত থাকিবে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে অনুসরণযোগ্য রাজপথ বলিয়া গৃহীত হইবে মনে হয় না। যে গদ্য লেখকের ব্যাক্তিত্বের ছাঁচে আগাগোড়া ঢালাই করা, তাহা একান্তভাবে লেখকেরই নিজস্ব থাকিয়া যায়, সাধারণের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা বিপদ্‌জনক। শ বা চেস্টারটনের গদ্য-রীতিকে অনুসরণ করিবার কথা কোন বুদ্ধিমান ইংরেজ লেখক মনে করে না। এ ক্ষেত্রেও তেমনি হওয়া উচিত। কিন্তু উচিত মতো অনেক কাজ সংসারে যে হয় না, তাহার প্রমাণ অনেক আধুনিক রবীন্দ্রেতর লেখকের গদ্যরীতি। ইহাদের অনুসৃত (সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে) গদ্যের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের গদ্যরীতি। তাহাদের ব্যাক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া যায়, ফলে লেখার উদ্দেশ্যটাই যে ব্যর্থ হইতে থাকে তর্ক করিয়া ইহা বোঝানো সহজ নয়।

শরৎচন্দ্রের উক্তি বলিয়া প্রচলিত আছে যে তিনি লেখক-জীবনে গোড়াতে গোরা উপন্যাসখানা নাকি পঞ্চাশবার পড়িয়া-ছিলেন। ইহা সত্য বলিয়াই মনে হয়, কেন-না, শরৎচন্দ্রের গদ্য-রীতির উৎকর্ষের মূলে গোরার গদ্যরীতির আদর্শ। অথচ ঐ আদর্শকে তিনি নিজের রসে জারিত করিয়া বৈশিষ্ট্যদান করিয়াছেন, পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের মধ্যে যেমন মিল থাকা উচিত তেমনি আছে অথচ দুটিই বিশিষ্ট, একটি আর-একটির নকল নয়।

আবার প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি স্বকীয়তায় বিশিষ্ট, তাহাকে অপর কাহারো রচনার সঙ্গে ভুল করিবার উপায় নাই—তৎসত্ত্বেও

আমার ধারণা—প্রমথ চৌধুরীর গদ্য রচনার উৎকর্ষের মূল রহিয়াছে 'গোরা'র ঋজু, স্বল্পবাক্, অলঙ্কারবিরল গদ্যে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনারীতির আলোচনা করিলে মনে হয় যে 'গোরা' ও 'জীবনস্মৃতি'র অনুসৃত গদ্য ভাষাটাই পরবর্তী গদ্য রচনারীতির পক্ষে সুফল প্রসব করিয়াছে, কারণ লেখক এখানে সাধারণের অনুসরণযোগ্য একটি রাজপথ তৈয়ারি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিজের কীর্তি কিন্তু একান্তভাবে নিজস্ব নয়; আর 'শেষের কবিতা' বা তিন সঙ্গীর ভাষা কেবল তাঁহার নিজের কীর্তিমাত্র নয়, তাহা নিতান্তই তাঁহার নিজস্ব। ও গরুড় কল্পনালক্ষ্মীর অধিপতি একমাত্র বিষ্ণুরই যোগ্য বাহন, অপরে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে পারে, কিন্তু পিঠে চাপিয়া গেলেই বিড়ম্বিত হইবার আশঙ্কা।

'গোরা' ও 'জীবনস্মৃতি'র গদ্য রচনারীতির ভারসাম্যের আর একটি কারণ, এখানে তৎসম, তদ্‌ভব ও দেশী শব্দের একটি সুষ্ঠু ও রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বিদ্যাসাগরের আমল হইতে বাংলা গদ্য এই সংমিশ্রণ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে—বাংলা গদ্যরীতির সম্মুখে ইহাই পরীক্ষা এবং ইহাই আদর্শ। বাংলা গদ্যরীতি এখনো সম্যক্‌ভাবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও এই আদর্শে উপনীত হয় নাই সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের গদ্যরীতিতে তাহার একটা সার্থকতা ঘটিয়া গিয়াছে। তাই কেবল রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিবর্তনে মাত্র নয়, বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসেও 'গোরা' ও 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যরীতি একটি স্থায়ী উল্লেখ লাভ করিবার যোগ্য।

১০

অনেকের ধারণা যে, ক্রিয়াপদের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতার উপরেই চলিতভাষার নির্ভর। বস্তুত ক্রিয়াপদের রূপের সঙ্গে সাধুভাষা

বা চলিতভাষার সম্বন্ধ সামান্যই। দীর্ঘ ক্রিয়াপদ সত্ত্বেও ভাষা চলিতভাষা হইতে পারে, উদাহরণ 'আলালের ঘরের দুলাল'। আবার ক্রিয়াপদ হ্রস্ব হওয়া সত্ত্বেও ভাষা সাধুভাষা হইতে পারে, উদাহরণ রাজশেখর বসু কর্তৃক অনূদিত 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপরেই বহুল পরিমাণে ভাষার সাধুত্ব বা চলিতত্ব নির্ভর করে; বিষয়ভেদে ভাষা মন্থরতা বা দ্রুতি লাভ করে। আমরা যাহাকে ভাষার সাধুত্ব বা চলিতত্ব বলি তাহা মূলত ঐ মন্থরতা বা দ্রুতি। হ্রস্ব ক্রিয়াপদ অনেক সময়ে ভাষাকে দ্রুত করিয়া তোলে বলিয়াই অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, উহা বুঝি চলিতভাষার অপরিহার্যতম লক্ষণ। ক্রিয়াপদের রূপের সঙ্গে ভাষার রূপের যে কার্যকারণ-সম্পর্ক নাই তাহার উদাহরণ তো পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে; চলিত-ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের গদ্য রচনারীতি, প্রধানত নিম্নোক্ত তিনখানি গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া ইহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে—'গোরা', 'জীবনস্মৃতি' ও 'চতুরঙ্গ'।

ছিন্নপত্রের কবি

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিকে আমরা অন্যত্র পত্রসাহিত্যরূপে আলোচনা করিয়াছি। এখানে আলোচ্য বিষয়, এই পত্রগুলিতে প্রকাশিত কবি-পুরুষের স্বরূপ।

ছিন্নপত্রে সবসুদ্ধ একশ বাহান্নখানা চিঠি আছে। তন্মধ্যে প্রথম চৌদ্দখানা ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৫ সনের মধ্যে লিখিত। ছয় বছরে মাত্র চৌদ্দখানি, নিতান্তই বিক্ষিপ্ত, কবিপুরুষের সুসংলগ্ন পরিচয় পাইবার পক্ষে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট একশ আটত্রিশখানি পত্র ১৮৯১ হইতে ১৮৯৫ সনের মধ্যে অর্থাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে লিখিত। হিসাব করিলে দাঁড়ায় যে, মাসে দুইখানার অধিক; কাজেই পত্রাঙ্ক অনুসরণ করিলে লেখকের অন্তঃপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। এখানে সেই চেষ্টাই করিব।

১৮৯১ হইতে ১৮৯৫ সনে, কবির বয়স তখন ত্রিশ হইতে চৌত্রিশ, পরিণত প্রতিভার প্রথম পর্ব। রবীন্দ্রনাথ ডায়ারি লেখেন না, এই চিঠিগুলিকে তাঁহার ডায়ারিলিপি বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই। মূল চিঠির যে-সব অংশে ব্যক্তিগত ও সাময়িক বিষয় ছিল সে-সব কর্তিত হওয়াতে পত্রগুলি প্রায় ডায়ারির নৈর্ব্যক্তিকতা লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে পত্রসাহিত্যরূপে এগুলির ক্ষতি যেমনি হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের তেমনি ক্ষতি হয় নাই, কারণ লেখক ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অকরুণ হস্তে ছাঁটিয়া দিলেও রবীন্দ্রনাথের কবিপুরুষের ধ্যানধারণার উপরে হস্তক্ষেপ করেন নাই, বরঞ্চ অনেক অবান্তর বস্তু ঝরিয়া যাওয়াতে সেই পরিচয়টি আরও উজ্জ্বল, আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সেই পরিচয় উদ্ঘাটনই তো আমাদের কাজ, কবি আমাদের কাজ অনেক সহজ-সাধ্য করিয়া দিয়াছেন।

এই চিঠিগুলি পড়িবার সময়ে তরুণ কীট্সের চিঠিপত্রের কথা মনে পড়িয়া যায়। অবশ্য কীট্সের বয়স আরও কম ছিল, কিন্তু

বয়সের কম্‌তি প্রতিভার স্ফূর্তিতে পূরণ হইয়া গিয়াছে। দু'জনেরই পত্রে সেই একই কৌতুকপ্রিয়তা ও হাস্যরসের উচ্ছল প্রকাশ, কবিমনের অভাবনীয় দীপ্তি ও গোপন পদসঞ্চার সম্বন্ধে সেই একই কৌতূহল; জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে দু'জনেরই অনন্ত জিজ্ঞাসা; নৈসর্গিক নিয়মজালের উর্ধ্বে যে আর একটা মহত্তর নিয়মজাল বর্তমান সে বিষয়ে চৈতন্য; মানবসংসারের প্রতি সুগভীর ঔৎসুক্য, প্রকৃতির প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ, শিল্পকলার প্রতি প্রেমিকের দৃষ্টি, দু'জনের চিঠিপত্রেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। কীট্‌সের কবিতার চেয়ে কোন কোন বিষয়ে তাঁহার চিঠিপত্র অধিকতর পরিণত। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি সম্বন্ধেও এরূপ দাবি উত্থাপন করিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে না।

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিতে রবীন্দ্র-জীবন ও কাব্যের বিচিত্র উপাদান ও ইঙ্গিত সঞ্চিত আছে এ কথা বলিয়াছি। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরব্যাপী কবি-জীবনের এরূপ তথ্যপুঞ্জ, কবিমনের ধ্যানধারণার এরূপ পূর্ণ পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। এক একবার আক্ষেপ হয়, তাঁহার ছিন্নপত্র-রচনার পূর্ববর্তী জীবনের চিঠিপত্রগুলি সযত্নে কেহ রক্ষা করে নাই কেন? কিংবা তিনি এরূপ ধারাবাহিক পত্ররচনা তখন করেন নাই! কারণ যাহাই হোক, তাহাতে ছিন্নপত্রের নিঃসঙ্গ গৌরব বাড়ে বই কমে না।

তরুণ কবি এই পত্রগুলিতে যে বিচিত্র আখ্যান ও ব্যাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন তন্মধ্যে একটিমাত্র সূত্রকে বাছিয়া লইয়া আজ আলোচনা করিব।

রবীন্দ্র-কাব্যের সমগ্রতার সঙ্গে যাঁহার কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনি জানেন যে, মুক্তি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা, আর সারা দীর্ঘ জীবন নানা পন্থায়, নানা পরীক্ষায় তিনি এই মুক্তির সাধনাই করিয়াছেন। এখানে মুক্তির দার্শনিক আলোচনায় প্রবেশ করিব না। ভারতীয় মনে মুক্তি বলিতে যে বিচিত্র ভাবোদয় হয় ব্যাখ্যায়

তাহার ইতরবিশেষ করা সম্ভব হইলেও মূলে একজনের ধারণার সঙ্গে অপরের ধারণার কোন প্রভেদ নাই, যেটুকু প্রভেদ তাহা তর-তমের প্রভেদ মাত্র, প্রকৃতিগত প্রভেদ নয়। তবে মুক্তিই যে রবীন্দ্র-সাধনার চরম লক্ষ্য এ বিষয়ে আমার অন্তত কোন সন্দেহ নাই। ওটুকু স্বীকার করিয়া লইয়াই অগ্রসর হওয়া যাক। এখন এই মুক্তির পরম রূপটি তাঁহার পরিণত জীবনের কাব্যে স্পষ্ট হইলেও তাহার বীজ তরুণ কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয়। ছিন্নপত্র রচনার পর্বে সেই বীজ উদ্ভিন্ন হইয়া একটি দু'টি কিশলয় দেখা দিতে শুরু করিয়াছে; সে কিশলয় পরিণত বনস্পতির পত্র-পল্লবের মতো পূর্ণায়ত নয় সত্য, আবার তাহার রঙটিও অনেক সময়ে মোহময় রক্তিম, হয়তো এই কথা স্মরণ করিয়াই কবি লিখিয়াছেন, "মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া।" মোহের পরিণাম মুক্তি কি না জানি না, তবে ছিন্নপত্রের অঙ্কুরের মাথায় যে-দু'টি কচি কোমল যগ্মপত্র দৃষ্ট হয় তাহার একটি বৈরাগ্য অপরটি বিষাদ, আর এই বৈরাগ্য ও বিষাদেরই পরিণাম যে মুক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কাহার মুক্তি কোন্ অভাবিত পথে আসিবে তাহার ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। রাজা ভর্তৃহরি অপরিমেয় ভোগের মহাসমুদ্রে আন্দোলিত হইতে হইতে অবশেষে সেই সমুদ্রেরই তরঙ্গ-বাহু দ্বারা মুক্তির উদার-কঠিন সৈকতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, আবার শুকদেব ও প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভ হইতেই মুক্তির ঠিকানা লইয়া যেন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তবে এই অভাবিতের মধ্যেও একথা নিশ্চয় যে, অহেতুক বৈরাগ্য ও অহেতুক বিষাদ মুক্তি-বনস্পতির প্রথম যুগ্ম-কিশলয়। এই যুগ্ম-কিশলয়ের সাক্ষাৎ ছিন্নপত্রে পাইব, তাহার অনুধাবনই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়।

২

প্রত্যেক সভ্যতার একটি বিশিষ্ট সাধনা আছে, সেই সাধনার সার্থকতা ও ব্যর্থতার দ্বারাই শেষ পর্যন্ত সেই সভ্যতার বিচার হইয়া

থাকে। এ পর্যন্ত কোন সভ্যতাই তাহার সাধনার শেষ সার্থকতায় পৌঁছিতে পারে নাই, নানা কার্য-কারণের অনভীষ্ট সংঘাতে পথিমধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া বিনষ্ট বা মন্দগতি হইয়াছে। এখন এই বিনাশ বা মন্দগতিত্বের একটি প্রধান কারণ সাধনার ব্যভিচার। প্রাচীন এথেন্সীয় গ্রীক সভ্যতার সাধনা ছিল চিৎমার্গের আত্যন্তিক মুক্তিলাভ। ইহারই সার্থকতা ও ব্যর্থতার কাহিনী এথেন্সের ইতিহাস। একদিকে এই মুক্তি-সাধনার সার্থকতার উদাহরণ যেমন ইউরিপিডিস ও সক্রেটিস—আর একদিকে তাহার ব্যর্থতার উদাহরণ পরবর্তী কালের সফিস্টগণ। চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতা এথেন্সকে শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে যেমন অসীম মুক্তি দিয়াছিল, তেমনি ব্যবহারিক রাষ্ট্র-জীবনে তাহার অধঃপতনের কারণও ঘটাইয়াছিল। চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতার ফল ব্যক্তি-স্বাধীনতা। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সার্থক প্রয়োগের ফলে যে এথেন্স এক সময়ে জ্যোতির্ময় গ্রহরূপে প্রাচীন জগতের চিত্তাকাশকে আলোকিত করিয়াছিল, ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যভিচারের ফলে সেই গ্রহ আপনার সামাজিক সংহতি হারাইয়া শত-সহস্র ব্যক্তিমাত্র রূপে নিষ্প্রভ গ্রহাণুপুঞ্জের ন্যায় আকরণে আবর্তিত হইতে থাকিল।

খ্রীষ্টীয় সভ্যতার সাধনা কায়মনোবাক্যে ভগবদানুগত্য। ভাগবতী ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রমতে মানুষের পক্ষে হীনতম অপরাধ। ভগবানের নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধেই আদিম মানব-দম্পতিকে নন্দনকানন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, মিল্টন ভাগবত মহিমা কীর্তন করিতে বসিয়া "Of man's first disodedience" স্মরণ করিয়াছেন।

ভারতীয় সাধনার চরম লক্ষ্য মুক্তি। ইহা চিত্তবৃত্তির মুক্তিমাত্র নয়, সার্বিক মুক্তি, আত্মার মুক্তি বলিলে খুব সম্ভব সত্যের যথাযথ বর্ণনা হয়। ভারতীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস এই মুক্তি-সাধনার সার্থক প্রয়োগ ও ব্যভিচারের ইতিহাস। মুক্তি যেখানে

সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে সেখানে ভারতবর্ষ মহৎ, মুক্তি যেখানে আলস্য অকর্মণ্যতার ছদ্মবেশে জড় করিয়া ফেলিয়াছে সেখানে ভারতবর্ষ পতিত। মুক্তিমার্গের সাধনা বড় কঠিন, 'দুর্গং পথস্তৎ'; তাহার একদিকে অতিভোগের খাড়া শৈলপ্রাকার, অন্যদিকে ভণ্ড সন্ন্যাসের অতলস্পর্শী খাদ; মাঝখানের সঙ্কীর্ণ বঙ্কিম উপলবন্ধুর পথটিই ভারতের ইতিহাস। সাধনার এই চরম মন্ত্রটি রবীন্দ্রকাব্যে নূতন যুগোচিত মূর্তি লাভ করিয়াছে। আমার অনুমান ও উক্তি সত্য হইলে আর একবার প্রমাণ হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের সাধনা মূলত ভারতীয় সাধনা; সেই মূলটাই নূতন যুগের জলহাওয়ায় নূতন যুগের রসসংযোগে কিঞ্চিৎ অভিনব মূর্তি লাভ করিয়াছে, ব্যক্তিত্বের কিছু বদল হইলেও সত্তার পরিবর্তন ঘটে নাই।

৩

বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে মনে বৈরাগ্য ও বিষাদের উদয় হইতে পারে, আবার বাহিরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বভাবতই মনে বৈরাগ্য ও বিষাদের উদয় হওয়া সম্ভব; তড়িদাহত হইয়া বৃক্ষে আগুন জ্বলিতে পারে, আবার স্বভাবতই শমীবৃক্ষ অগ্নিগর্ভ। রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্য ও বিষাদ সহজাত ও অকারণ, বিচারের ক্ষেত্রে তাই তাহার মূল্য বেশি। "ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূর-বিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপে আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে, এইজন্যে আমাদের পূরবীতে বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হা-হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারো ঘরের কথা নয়।...পৃথিবীর যে-ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন ক'রে দিয়েছে।"[১]

১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৪

আবার—

“আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—”[১]

পুনশ্চ—

“আমাদের দেশের মাঠ, ঘাট, আকাশ, রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটি সুগম্ভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে?”[২]

মনে রাখিতে হইবে, এই বৈরাগ্য ও বিষাদের মূল কোন তত্ত্বোপলব্ধিতে নয়, নিছক অনুভূতিতে, অর্থাৎ কোন তত্ত্ব তাঁহাকে এদিকে প্রেরণা দেয় নাই, হৃদয়ের প্রেরণাতেই কবি এই অনুভূতিতে পৌঁছিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রকৃতি বৈরাগ্য ও বিষাদের হেতু না হইতেও পারে, অপরে তাহাতে বৈরাগ্য ও বিষাদের সমর্থন না পাইতেও পারে, কিন্তু কবি যে পাইয়াছেন তাহার প্রকৃত কারণ বৈরাগ্য ও বিষাদ তাঁহার প্রকৃতির মধ্যেই আছে, তাই কোন একটা উপলক্ষকে অবলম্বন করিয়া তাহা বাহিরে বিস্তারিত হইয়া দেখা দিতেছে। এই কারণেই এই বিষাদ ও বৈরাগ্যকে তাঁহার সহজাত বলিয়াছি।

এখন, এই বৈরাগ্য ও বিষাদ কোন অভাবাত্মক অনুভূতি নয়, ইহা বৃহৎ শান্তি ও মহৎ সৌন্দর্যের যথার্থ পটভূমি, পটের রঙ সাদা বলিয়াই তাহাতে ছবির রঙ এমন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়।

“এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্যপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায়—”[৩]

আর একখানি পত্রে আছে—

পৃথিবী যে কি আশ্চর্য সুন্দরী এবং কি প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না……

১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৮
২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ২৭
৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ২৭

কি শান্তি, কি স্নেহ, কি মহত্ত্ব, কি অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি—"[১]

সাধারণত আমাদের বিশ্বাস এই যে, বৈরাগ্য ও বিষাদ মানুষের মনকে সংসার হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যায়। খুব সম্ভব প্রকৃত বৈরাগ্য ও বিষাদের তাহা প্রকৃতি নয়। একদা রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে বৈরাগ্য ও বিষাদেই ক্ষুদ্র সংসার হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া বৃহৎ মানব-সংসারের দিকে, তাহার দুঃখমুক্তির অভিমুখে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে যাহাই হোক, এক্ষেত্রে দেখিতেছি যে, কবিকে শান্তি, সৌন্দর্য, চরাচরব্যাপী মহত্ত্ব ও মানসলোকের সন্ধান দিয়াছে। অর্থাৎ কবি বিষাদ ও বৈরাগ্যের অন্ধকার খিলানপথে আপনাকে ও বিশ্বকে আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ৪৪-সংখ্যক পত্রে বলিতেছেন যে, শিলাইদহের মতো পল্লীবঙ্গে পড়িবার মতো কোন বিদেশী উপন্যাস তিনি জানেন না, কারণ সে-সব এমনি অকারণ মনস্তত্ত্ব ও অযথা নীতিজ্ঞানের সমবায়ে প্রস্তুত যে, তাহাতে "এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোট নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসার, দুই কূলের অবিরল শান্তি এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে।" এখন, ইউরোপীয় উপন্যাসকেই যদি এত ভয়, ইউরোপীয় জীবনযাত্রা ও ইউরোপীয় দৃষ্টি না জানি আরও কত ভয়ঙ্কর! জন্মান্তরের প্রসঙ্গ তুলিয়া কবি বলিতেছেন—"আশ্চর্য এই, আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা, সেখানে সমস্ত চিত্তটাকে এমন উপরের দিকে

১ ।ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৩৫

উদ্‌ঘাটিত রেখে প'ড়ে থাকবার যো নেই এবং প'ড়ে থাকাও সকলে ভারি দোষের বিবেচনা করে। হয়তো একটা কারখানায়, নয়তো ব্যাঙ্কে, নয়তো পার্লামেণ্টে সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে।"[১]

কবির কথায় এমন ভ্রান্তি জন্মিতে পারে যে, তিনি বুঝি ইউরোপীয় কাব্যে ও সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান সম্বন্ধে অচেতন। কিন্তু তাহা নয়। বাস্তবিকপক্ষে ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিগণের হাত হইতেই আমাদের নব্য বাংলাসাহিত্য প্রকৃতির দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, কাজেই কবির পক্ষে এ সত্য বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রকৃতি-বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টি ও ইউরোপীয় দৃষ্টিতে কিছু প্রভেদ আছে। ভারতীয় কবির কাছে প্রকৃতি জলের ন্যায়, তাহা নিত্যব্যবহার্য, তাহা এমন অনায়াসলভ্য যে, তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধেই আমরা অচেতন, আর তাহাতে দেহমন স্নিগ্ধ ও শীতল করে ইউরোপীয় কবির কাছে প্রকৃতি সুরার ন্যায়, তাহাতে উন্মাদনা জাগাইয়া মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়। বায়রনের "There is a joy in the pathless wood" এবং কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকের অরণ্য-প্রকৃতি ভিন্ন দৃষ্টি ও ভিন্ন উপলব্ধিজাত; আবার ইয়েট্‌সের "The Lake Isle of Innisfree" এবং রবীন্দ্রনাথের "ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে," এক দৃষ্টি ও এক অনুভূতির ফল নহে। এই প্রভেদের আসল কারণ, ভারতীয় দৃষ্টিতে বহুল পরিমাণে বৈরাগ্য ও বিষাদ মিশ্রিত। আর বৈরাগ্য ও বিষাদ মিশ্রিত হইলে কোন অনুভূতি সুরার তীব্রতা লাভ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, এগুলিতে আবেগের উত্থান-পতনের ঝাঁপতাল অত্যন্ত মন্দ লয়ে ধ্বনিত। "Since there's no help, come,

১ ছিন্নপত্র, পত্র সংখ্যা ৮৪

let us kiss and part" প্রথম ছত্রেই পাঠকের কণ্ঠ চাপিয়া ধরে, কিংবা বার্নসের

"Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly,
Never met or never parted,
We had ne'er been broken-hearted."

যেমন দৃঢ় মুষ্টিতে বুকের শিরাতন্ত্রী চাপিয়া ধরে, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা পাঠে তেমন অভিজ্ঞতা পাঠকের হয় না সত্য, কিন্তু তার যথেষ্ট কারণও তো বর্তমান। প্রকৃতির ন্যায় প্রেমও রবীন্দ্রনাথের কাছে জল, সুরা নয়। সুরার উচ্ছ্বাস হৃদয় হইতে মস্তিষ্কের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া মানুষকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া দেয়, আর জলের প্রবাহ নিকট হইতে দূরের দিকে প্রবাহিত হইয়া গিয়া মানুষকে উদাস করিয়া দেয়। তাঁহার কাছে প্রকৃতির ন্যায় প্রেমও বহুল পরিমাণে বৈরাগ্য ও বিষাদে মিশ্রিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেম প্রেমপাত্রকে দীর্ঘকাল অবলম্বন করিয়া থাকে না, তাহা চরাচরব্যাপী বিষাদ ও বৈরাগ্যের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, সুদূর দিগন্তের ছায়ায় বসিয়া আনমনা হইয়া সকরুণ বেণু বাজাইতে থাকে—ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের মূল তান।

যদিও ইহাই রবীন্দ্র-কাব্যের মূল তান, তবু ইহাই একমাত্র তান নয়—অন্য টানও আছে, সেইজন্যই রবীন্দ্রকাব্য জটিল, আর অনেকেই এ বিষয়ে সচেতন নন বলিয়া রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় ভুল করিয়া থাকেন। যাই হোক, অপরে সচেতন না হইলেও কবি স্বয়ং সচেতন। তিনি বলিতেছেন—"ভারতবর্ষের দুটি অংশ আছে, এক অংশ গৃহস্থ, আর এক অংশ সন্ন্যাসী, কেউ বা ঘরের কোণ থেকে নড়েন না, কেউ বা একেবারে গৃহহীন। আমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই দুই ভাগই আছে। ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে।"[১] এই ভাবটিই কবির ভাষান্তরে

১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৬৯

সীমা ও অসীমের মিলন-সমস্যা এবং কবির স্বীকৃতি অনুসারে ইহাই তাঁহার কাব্যসাধনার একমাত্র পালা। আমার নিজের ধারণা, বাহিরের টানটাই তাঁহার মধ্যে প্রবলতর, সেইজন্যই ইহাকে মূল তান বলিয়াছি; ইহার সঙ্গে ঘরের টান, সীমার আকাঙ্ক্ষা মিলিত হওয়াতে মূল তানটি জটিলতর হইয়াছে, প্রভেদ মাত্র এইটুকু।

রবীন্দ্রনাথ চরাচরব্যাপী বিষাদের ভাষা হইতেই ভাষা এবং সঙ্গীত হইতে সুর সংগ্রহ করিয়াছেন। "অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যেবেলাকার পরিত্যক্তা পৃথিবীর উপরে কি একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ ক'রে দেয়; সমস্ত জলে, স্থলে, আকাশে কি একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা!...... যদি এই চরাচরব্যাপী নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, তাহ'লে কি একটা গভীরগম্ভীর শান্তসুন্দর সকরুণ সঙ্গীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে।"[১] ওয়ার্ডস্বার্থ যাহাকে "The still, sad music of humanity" বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথকথিত "গভীরগম্ভীর শান্তসুন্দর সকরুণ সঙ্গীত" তাহারই অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য চরাচরব্যাপী "চিরবিরহ-বিষাদের" ভাষা হইতে ভাষা, তাঁহার বীণা "সকরুণ সঙ্গীত" হইতে সুর সংগ্রহ করিয়াছে, আর এই ভাষা ও সুর ক্রমেই অধিকতর সার্থকতায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করিয়াছে।

যখন তিনি ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি লিখিতেছিলেন তখনো এই আকাঙ্ক্ষা কবির চিত্তাকাশে নক্ষত্রের সচেতন সংহতি লাভ করে নাই, বিশ্বব্যাপী বিষাদ ও বৈরাগ্যের অস্পষ্ট নীহারিকা-রূপে বিস্তারিত হইয়া ছিল। খুব সম্ভব খেয়া কাব্য রচনার সময় হইতে, নিঃসন্দেহ গীতাঞ্জলি রচনার সময় হইতে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নক্ষত্রের নিশ্চিত ভাস্বরতা লাভ করে এবং অবশেষে তাঁহার শেষজীবনের কাব্যে

১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৬৬

প্রকাশ পায় যে, সেই নক্ষত্র তাঁহার সমগ্র জীবন ও কাব্যসাধনার অনির্বাণজ্যোতি ধ্রুবতারকা।

আর একখানি পত্র উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। একটি সন্ধ্যার বর্ণনা উপলক্ষে তিনি লিখিতেছেন—"কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী, আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা। মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কতো শত-সহস্র গ্রাম, নদী, প্রান্তর, পর্বত, নগর, বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই, তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে? কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ?"[১]

রবীন্দ্রনাথকথিত বিষাদ ও বৈরাগ্য এই সন্ধ্যাটির মধ্যে মোহিনী মূর্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা যে নৈরাশ্য নয়, অভাবাত্মক জীবনসাধনার ব্যর্থতা নয়, সে ইঙ্গিত কবি জানাইয়া দিয়াছেন: "তার বর যদি কোথাও নেই, তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে?" "অন্তহীন পশ্চিমের দিকে" যেখানে তাহার পতিগৃহ সেখানে পৌঁছানো:তেই কি তাহার মুক্তি নয়?

আমার কেন জানি মনে হয়, ঐ সন্ধ্যাটি রবীন্দ্রকাব্যলক্ষ্মীর প্রতীক। সে "সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম", সে "সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে।" সে বিষাদময়ী, বৈরাগ্যময়ী, তাই বলিয়া গৃহত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী সে নয়; সে "সোনার চেলি-পরা বধূ", সে সেই "পতিগৃহে"র তীর্থ-যাত্রিণী যেখানে অপেক্ষমান পতির প্রেমসন্ধ বাহুবন্ধনে এবং সুগভীর বাসর-শয্যার ঘনিষ্ঠ তমিস্রায় তাহার জীবন, যৌবন ও প্রণয়-পরিণয়ের চরম সার্থকতা—ইহাকেই কবি মুক্তি মনে করেন।

১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫২

রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি অনাদৃত কবিতা

রবীন্দ্রনাথের রসোত্তীর্ণ প্রথম শ্রেণীর কবিতার সংখ্যা এত অধিক যে, সেটাই একটা বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে। এই ভিড়ের মধ্যে অনেক প্রথম শ্রেণীর কবিতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তীর্থযাত্রীদের পরস্পরের চাপে যেমন নিজেদেরই অনেকে মারা পড়ে। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে দুটি মনোরম দ্বীপ আছে—এক চয়নিকা, অপরটি সঞ্চয়িতা; কিন্তু এগুলিও এমন যথেষ্ট উদার নয় যাহাতে প্রথম শ্রেণীর যাবতীয় কবিতাগুলিকে স্থান দিতে পারে। একে তো সংসারে যোগ্যতমের উদ্বর্তন সব সময়ে হয় না, তার পরে আবার স্থানাভাব। এক্ষেত্রে যোগ্যতমের তুলনায় স্থান অল্প, এমন কি সঞ্চয়িতার মতো সাড়ে আটশ পৃষ্ঠার বিশ্বম্বহ গ্রন্থও যথেষ্ট নয়। কিন্তু এমন কথাই বা কি করিয়া বলি যে, যাহারা স্থান পাইয়াছে তাহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর টিকিটধারী। দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটধারীও অনেক আছে, আবার কোন কোন কবিতাকে বিনা টিকিটের যাত্রী বলিয়াই মনে হয়। তবে স্বয়ং কবি স্থান দিয়াছেন, কাজেই বলিবার কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে কবির চোখ যে অভ্রান্ত নয় তাহা কবিগুরু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

এই আলোচনায় আমার বিবাদ চয়নিকার সঙ্গে নয়, সঞ্চয়িতার সঙ্গে তো নয়ই। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি কবিতাকে আমার প্রথম শ্রেণীতে রসোত্তীর্ণ বলিয়া মনে হয়, সে-গুলি চয়নিকা ও সঞ্চয়িতা দু'খানি সঙ্কলন গ্রন্থ হইতেই বাদ পড়িয়া গিয়াছে—ইহাই আমার ক্ষোভ। সেগুলি একেবারে অপরিচিত নয় তবে আরও সুপরিচিত হইলে খুশী হইতাম; তাহাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, যেহেতু এ ভালো-লাগা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, অপর কাহারো ভালো না লাগিলে আমার কিছু আপত্তি করিবার নাই। আর এই ব্যক্তিগত পছন্দের মূলে সব

সময়ে যে যথেষ্ট কারণ বা রসসমর্থন আছে এমন নয়; অনেক সময় হয়তো সংস্কার বা অভ্যাসটাই প্রবল, এমন কি অনেক সময়ে সংস্কারের অজুহাতও নাই, সমস্তটাই অকারণ। তবে আশা করিতেছি যে অনেক পাঠকেরই অবস্থা আমার মতো এবং আলোচ্য কবিতাগুলির কোন কোনটি সম্বন্ধে হয়তো তাঁহারা আমার অনুরূপ মত পোষণ করেন।

বর্তমান আলোচনার পরিধি মানসী হইতে বলাকা পর্যন্ত, বিষয় এই সব কাব্যের কয়েকটি উপেক্ষিত কবিতা।

রবীন্দ্রকাব্য পড়িবার সময়ে কখনো কখনো এই সব উপেক্ষিত কবিতা চিহ্নিত করিয়া রাখিতাম—এখন সেগুলির একটা হিসাব করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে মানসী কাব্যেই উপেক্ষিতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালির অধিকাংশ কবিতাই সুপরিচিত। কোন-কোনটার খ্যাতি শিল্পকৃতিত্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ সোনার তরী কবিতাটি গ্রহণ করিতে পারি। এই কবিতাটি লইয়া যত ব্যাখ্যা, প্রতিব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা হইয়াছে এমন বোধ করি রবীন্দ্রনাথের আর কোন কবিতা লইয়া হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সময় হইতে সুরু হইয়াছে—এখনো নিবৃত্তি ঘটে নাই; এখন মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা চলিতেছে! চয়নিকার একটি সংস্করণ প্রণয়ন কালে রবীন্দ্রকবিতার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে 'গণভোট' গ্রহণ করা হইয়াছিল, আর তাহার ফলে সোনার তরী কবিতাটি সবচেয়ে বেশি-সংখ্যক ভোট পাইয়াছিল। কবিতাটির খ্যাতি তাহার শিল্পকৃতিত্বকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমার মনে হয়, কবিতাটির খ্যাতির মূলে আছে সুললিত ছন্দ, সহজবোধ পল্লীবঙ্গের সুন্দর ছবি, আর কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্যতা। দুর্বোধ্যতা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি এই বোধ পাঠকের মনে এক প্রকার আত্মগরিমা জাগাইয়া দেয়—তাই অনেক সময়ে দেখা যায় যে, রসবোধে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকেরা

দুর্বোধ্য কবিতার জয়গান করিয়া থাকে। এক্ষেত্রেও হয়তো তাহাই ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু এই থিওরির পক্ষে সবচেয়ে দুরূহ বাধা—কবিতাটি স্বয়ং কবিরও প্রিয়। কিন্তু কবির প্রিয় হইলেই যে কোন কবিতা যথার্থ রসোত্তীর্ণ বা প্রথম শ্রেণীর হইবে এমন কথা নাই—স্বয়ং কবিই তাহা অন্য প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বাহিরের প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়েছে কিনা হয়তো সেটা তার পক্ষে নিশ্চিত বোঝা কোন কোন স্থলে সহজ হয় না।" আমার বিশ্বাস সোনার তরী কবিতাটির কবিকৃত বিচার সম্বন্ধে এমনি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। কবিতাটির রচনার "অন্তরের ইতিহাস" অর্থাৎ পদ্মাবাসের ঘনীভূত স্মৃতি কবিকে এমনি তন্ময় করিয়া রাখিয়াছে যে, "বাহিরের প্রকাশ" উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন হইতে পারেন নাই। যাই হোক, সোনার তরী কবিতাটি আমার আলোচ্য নয়, তবু যে আলোচনা করিলাম তাহার কারণ, এইরূপ অনেক অবাঞ্ছিত যাত্রী প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিবার ফলেই যথার্থ অধিকারীদের স্থানাভাব ঘটিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

২

মানসী কাব্যের 'উপহার' কবিতাটি কবির আশ্চর্য সৃষ্টি।

এ চিরজীবন তাই
আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে
তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গ'ড়ে তুলি মানসপ্রতিমা।

অসীমের সীমা রচনা রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম। কথাটি গভীর, কেন না কবির জীবনতত্ত্বের সহিত জড়িত। কিন্তু কত অনায়াসে,

কত অবলীলাক্রমেই না তিনি কথাটি বলিয়াছেন। কলাকৌশল আপনাকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করিয়া 'সত্যেরে লও সহজে' নীতি অবলম্বন করিয়াছে। কড়ি ও কোমলের 'প্রাণ' কবিতাটিতে কবির জীবনতত্ত্বের একদিক যেমন প্রকাশ পাইয়াছে,—ইহাতে তেমনি আর একদিক। আবার চয়নিকার কোন কোন সংস্করণে "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে" কবিতাটি কবির সমগ্র কাব্যসাধনার সূত্ররূপে মুখ্য কবিতা হিসাবে ব্যবহৃত হইত। "উপহার" কবিতাটির উদ্ধৃত ছত্র কয়টিও অনুরূপ প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 'রচি শুধু অসীমের সীমা'—কবি সারা জীবন তো এই কাজই করিয়া গিয়াছেন।

মানসী কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে মানসী মানসেই আছে। কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হইবে। কোন কোন কবি মানবী প্রেমপাত্রীকে সাধনার দ্বারা, আরাধনার দ্বারা, বিশেষ প্রতিভার দ্বারা মানসীতে পরিণত করেন—উদাহরণ, রবার্ট ব্রাউনিং ও তাঁহার পত্নী; চণ্ডীদাস ও রামী। ইঁহারা স্বভাবত সসীমকে অসীমের ব্যঞ্জনা দানের কঠিন চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কোন কোন কবি আছেন যাঁহারা মানসীকে মানবী প্রেমপাত্রীর মধ্যে আভাসিত করিয়া দেখেন—উদাহরণ, শেলি ও রবীন্দ্রনাথ। স্বভাবতই যাহা অসীম তাহাকে মানবিত করিয়া তুলিবার কঠিনতর চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন; 'রচি শুধু অসীমের সীমা।' সেইজন্যই শেলি ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় কেমন যেন ঘনিষ্ঠ মানব-সংস্পর্শের অভাব; আসক্তির তীব্রতার বদলে উদাসতা, প্রেমের চরিতার্থতার উল্লাসের বদলে নৈরাশ্য, হৃদয়স্পন্দন অনুভূতির বদলে বিষাদ ও করুণা—ইঁহাদের প্রেমের কবিতার ইহাই বিশেষ ধর্ম। এ সমস্তই তত্ত্বরূপে ঐ কয়টি ছত্রে ধরা পড়িয়াছে। তবে প্রভেদ এই যে, শুধু মানসী কাব্য নয়, সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধেই ছত্র কয়টি প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা করিয়া কবিতার তত্ত্ব বোঝানো যায় কিন্তু রসের তো ব্যাখ্যা চলে না। সূর্যাস্তের মেঘে যে আকাশকুসুম ফোটে বৈজ্ঞানিকের সাধ্য কি তাহার পরিচয় দেয়! আলোচ্য কবিতাগুলির তত্ত্বাংশ আলোচনা করিব, তাহাতে তাহাদের গুরুত্ব হয়তো বোঝা যাইবে, কিন্তু ইহাদের রসরহস্য বুঝিবার জন্য পাঠককে কষ্ট স্বীকার করিয়া কবিতাগুলি পড়িয়া লইতে হইবে।

মানসীর আর কয়েকটি উপেক্ষিত কবিতা—একাল ও সেকাল, আকাঙ্ক্ষা, মরণস্বপ্ন, কুহুধ্বনি ও সন্ধ্যায়।

তন্মধ্যে একাল ও সেকাল অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত এবং চয়নিকায় সন্নিবিষ্ট। কবিতাটি অধিকতর পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

হইতে

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারা দিন, সারা বেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটীরে।

পর্যন্ত একটি আদর্শ বর্ষাকে একটি আদর্শ বিরহিণীর চিত্তবৃন্দাবনে স্থাপন করিয়া ন্যূনতম অথচ নিশ্চিততম রেখায় অঙ্কনের সার্থক প্রয়াস। কিন্তু কবিতাটি দোষশূন্য নয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে রসাভাস ঘটিয়াছে। বৃন্দাবনের বর্ষা ও রাধিকার চিত্র মধ্যে প্রক্ষিপ্ত রূপে অলকা ও যক্ষবধূ আসিয়া পড়িয়াছে—ক্ষুদ্রকায় কবিতাটিতে বৈষ্ণব কবির রাধিকা ও কালিদাসের যক্ষিণীর স্থানাভাব। ঐ দুটি শ্লোক বাদ দিলে আপন ক্ষেত্রে ক্রটিশূন্য হইয়া দাঁড়াইবে।*

* রবীন্দ্রসাহিত্যের কপি-রাইট পর্ব অতিক্রান্ত হইলে এরূপ বাদ-সাদ দেওয়া সঙ্কলন-গ্রন্থ নিশ্চয় বাহির হইবে।

মানসী কাব্যে যে কয়েকটি কবিতায় লিরিক বেদনা অত্যন্ত সংহত ঘনীভূত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে সেগুলি কাব্যাংশে রসোত্তীর্ণ ও শ্রেষ্ঠ—আকাঙ্ক্ষা, মরণস্বপ্ন ও কুহুধ্বনি তাহাদের অন্তর্গত। এগুলি কবির গাজিপুরে বাস কালে, কয়েকদিনের মধ্যে বৈশাখ মাসে রচিত। প্রবাসবাসের স্মৃতি ও প্রবাসের বেদনা কবিতাগুলির রস-রহস্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

আর্দ্র-তীব্র পূর্ব বায়ু বহিতেছে বেগে,
ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে।
দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়।
ব'সে ব'সে ভাবিতেছি আজি কে কোথায়।

রবীন্দ্রকাব্যে যে নিসর্গচিত্র পাওয়া যায়, সাধারণত তাহা হয় মধ্যবঙ্গীয় নয় রাঢ়বঙ্গীয়। এ কবিতাগুলির নিসর্গচিত্র গাজিপুর অঞ্চলের, সেইজন্যই এগুলিতে রসের অভিনবত্ব আছে।

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিতে আর্দ্র উতরোল বায়।

কবি তাহাকে কাছে পাইলে জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা বলিতেন, তাঁহার প্রাণের অসীমে আত্মার যে মহারাজ্য বিরাজমান তাহাই দেখাইতেন।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছ চ'লে,
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা ব'লে।
কল্পনার সত্যরাজ্য দেখাই নি তারে,
বসাই নি এ নির্জন আত্মার আঁধারে।

ইহাই তাঁহার আক্ষেপ—আর, পুনরায় সুযোগ পাইলে কল্পনার সত্যরাজ্য ও আত্মার বিস্তার দেখাইবেন ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা।

মরণস্বপ্নে অঙ্কিত প্রবাসচিত্র আরও বিশদ—

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
ক্ষুদ্র নৌকা থর থরে চলিয়াছে পালভরে
কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনাখানি আধ-জাগা মনে।
একপারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া;
অন্য পারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রালোকে, ভেদ নাহি পড়ে চোখে;
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়।

এমন সময়ে

স্বদেশ পুরব হতে বায়ু ব'হে আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।
জাগ্রত আঁখির আগে কখনো বা চাঁদ জাগে
কখনো বা প্রিয় মুখ ভাসে;
আধেক উলস প্রাণে আধেক উদাস।

এ হেন নিসর্গদৃশ্যে বসিয়া কবি মরণস্বপ্ন দেখিয়াছেন; জীবনে যাহা অলব্ধ রহিয়া গেল, মৃত্যুস্বপ্নে তাহাই উপলব্ধ সত্য হইল।

অন্ধকারহীন হয়ে গেল অন্ধকার।
'আমি' বলে কেহ নাই, তবু যেন আছে।
অচৈতন্য তলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি' কার।
মৃত হয়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে।

'কুহুধ্বনি' কবিতার নিসর্গচিত্র অধিকতর তথ্যপুঞ্জযোগে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

ছায়া মেলি সারি সারি
স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসু গাছ পাণ্ডুকিশলয়,

নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা
গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন তাম্রফলময়।
... ...
বসি আঙিনার কোণে
গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি ;
বাঁধা কূপ, তরুতল,
বালিকা তুলিছে জল,
খর তাপে ম্লান মুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর,
বসিয়া মাচার 'পর
শস্যক্ষেত আগুলিছে চাষী,
রাখালশিশুরা জুটে
নাচে গায়, খেলে ছুটে ;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
কত কাজ কত খেলা,
কত মানবের মেলা,
সুখ দুঃখ ভাবনা অশেষ,
তারি মাঝে কুহুস্বর
একতান সকাতর
কোথা হ'তে লভিছে প্রবেশ।

কবি বলিতে চান যে, চলমান, নিত্য অপস্রিয়মাণ নশ্বর জগতে একমাত্র সত্য "সঙ্গীতের সরস্বতী"র এই সম্মোহন বীণাধ্বনি।

কেহ ব'সে গৃহ মাঝে,
কেহ বা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে কেহ নাহি শোনে,
তবুও সে কী মায়ায়
ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।

সংসার অনিত্য, ঐ কুহুধ্বনি নিত্য; সংসার খণ্ড-সৌন্দর্যে পূর্ণ, ঐ কুহুধ্বনি অখণ্ড সুন্দর; মানবজীবনের অতীত ও বর্তমান কুহুধ্বনির ঐ সূক্ষ্ম স্বর্ণময় সূত্রে গাঁথা পড়িয়া সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছে—ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানের উহাই একমাত্র অবলম্বন, কবি ইহাই যেন বলিতে চান। কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল কবিতার মতোই ইহার মর্মবস্তু, যদিচ কাব্যাংশে এ দুয়ে তুলনা চলে না।

আর একটি রসোত্তীর্ণ উপেক্ষিত কবিতা—সন্ধ্যায়।

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মতো হও।
সুদূর পশ্চিমাচলে
কনক আকাশ তলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত
অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মতো ধীরে ধীরে
আমার জীবনতীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।

সন্ধ্যার করুণ সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেমপাত্রীর সত্তা মিশিয়া গিয়া এক অপূর্ব স্মৃতিমধুর বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে। এটিকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠকবিতা পর্যায়ভুক্ত মনে না করিতে পারিলেও, আগের কয়েকটি কবিতাকে নিঃসন্দেহে সেই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

৩

খেয়া কাব্যের কোকিল কবিতাটি অনাদৃত: এই সরল সুন্দর কবিতাটি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, ইহার অতীত-মধুর সৌন্দর্য সম্বন্ধে বোধ করি অল্প পাঠকই সন্ধান রাখেন।

আজ বিকালে কোকিল ডাকে
শুনে মনে লাগে
বাংলা দেশে ছিলেম যেন
তিনশো বছর আগে।

সেদিনের সে স্নিগ্ধ গভীর
গ্রামপথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ
অশ্রুজলের ছায়া।

অতঃপর সেদিনকার পল্লীবঙ্গের মুগ্ধ সৌন্দর্যের মনোরম চিত্র অঙ্কন করিয়া কবি বলিতেছেন—

তিনশো বছর কোথায় গেল,
তবু বুঝি নাকো
আজো কেন ওরে কোকিল
তেমনি স্বরেই ডাকো।
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে
ফেটেছে সেই ছাদ,
রূপকথা আজ কাহার মুখে
শুনবে সাঁঝের চাঁদ?

এমন সময়ে শহরের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া কবি বুঝিতে পারিলেন—

সময় নাই রে হায়,
ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ
কিসের ব্যর্থতায়!

চমকিত কবি তিনশো বছর আগেকার স্মৃতির সোনায় বাঁধানো চিত্রপটের ধ্যান হইতে সহসা বর্তমান যুগে ফিরিয়া আসিলেন, যেমন চমকিয়া উঠিয়া কবি কীট্‌স্‌ নাইটিঙ্গেলের অমর সঙ্গীতের আসর হইতে আধিব্যাধিপীড়িত মানবসংসারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—"the very word is like a bell to toll me back from thee to my sole self!"

কবিতাটির সরল সহজ শিল্প দেখিয়া মনে হয় একটি স্থানভ্রষ্ট কবিতা, ইহার স্বাভাবিক স্থান ক্ষণিকা কাব্যে। কিন্তু যে কাব্যেই ইহা সন্নিবিষ্ট হোক না কেন, রবীন্দ্রকাব্যের পুরোভাগে ইহার যথার্থ স্থান।

৪

উৎসর্গ কাব্যের শুক্ল সন্ধ্যা (২৩-সংখ্যক) ও 'ওরে আমার কর্মহারা' (৩৮-সংখ্যক) কবিতা দুটি রসিকের কাছে যথোচিত সমাদর পায় নাই, অথচ শিল্পমহিমায় কবিতা দুটি তুলনাহীন।

শুক্ল সন্ধ্যা কবিতার প্রথম দুটি শ্লোক কিঞ্চিৎ দ্বিধাজড়িত, যদিচ দ্বিতীয় শ্লোকে দ্বিধার জড়তা অনেকটা অপসারিত। কিন্তু তৃতীয় শ্লোক হইতে শেষ পর্যন্ত কবিতাটি কবির কল্পনাস্রোতে অকুণ্ঠিত বেগে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে দময়ন্তীর যে-রাজহংসের উল্লেখ কবিতাটিতে আছে তাহারই লীলামাধুর্যচ্ছন্দে।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো
কোন্ স্বর্গ হ'তে
চাঁদখানি লয়ে হেসে
শুক্ল সন্ধ্যা এলো ভেসে
আঁধারের স্রোতে।

সেই শুক্লসন্ধ্যাই দময়ন্তীর নিকট নলকর্তৃক প্রেরিত রাজহংস।

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।
দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জবিতানে—

কবিই যে দময়ন্তী,—দয়িতের প্রেমের ঋণ স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই রাজহংসের মতো শুক্লসন্ধ্যাটি কবির কাছে আসিয়াছে—

জ্যোৎস্না তারি মতো আকাশে বহিয়া
এলো মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে।

সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলন-কৌতুকে
এলো মোর বুকে।

শুক্লসন্ধ্যা সম্পর্কিত এরূপ বর্ণনায় ব্যঞ্জনায় সার্থক কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যেও বিরল।

আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতায় সহসা যুগান্তরের সেতু খুলিয়া যাওয়ায় এমন সমস্ত আভাস ও স্মৃতির ইসারা পাওয়া যাইতেছে "এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু।"

সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে
নিমন্ত্রণের বীণা বাজে,
ফেনিয়ে উঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মর্ম্মরিত তমাল ছায়ে
ভিজে চিকুর শুকায় বায়ে,
তাদের চেনে চেনে নাই বা কেউ।

ছবিগুলি এমন সূক্ষ্মরেখায় অঙ্কিত যেন কোন বাস্তব তুলিতে আঁকা হয় নাই, যেন কোন্ অনাদিকাল হইতে ঐ পটে অঙ্কিত হইয়াই ছিল, আজ দক্ষিণ বাতাসে বিস্মৃতির কুয়াসা একটু সরিয়া যাইতেই 'জননান্তরসৌহৃদানি'র মতো উপলব্ধি হইতেছে। সেই চিরপুরাতনকে নূতন পরিবেশে পাইবার ইচ্ছা জাগিতেছে—

ধারাযন্ত্রে সিনান করি'
যত্নে তুমি এসো পার'
চাঁপাবরণ লঘুবসনখানি।
ভালে আঁকো ফুলের রেখা
চন্দনেরি পত্রলেখা,
কোলের পরে সেতার লহ টানি।

সুন্দরী কবিতা সুন্দরী নারীর মতো, তাহার পিছু ছুটিলে সব সময়ে তাহার মন পাওয়া যায় না; বিশেষ, হাতে ব্যাখ্যার কলম থাকিলে তো কোন আশাই থাকে না। ব্যাখ্যা করিয়া যাহার

সৌন্দর্য বোঝানো সম্ভব নয়, উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতি রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

৫

গীতিমাল্য কাব্যের অন্তর্গত ছয়টি কবিতা (৪, ৫, ৯, ১০, ১১, ১২ সংখ্যক) কাব্যাংশে রসোত্তম হওয়া সত্ত্বেও কেন-যে কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই তাহা ভাবিয়া পাই না। এগুলির অস্তিত্ব অপরের চোখে না পড়িতে পারে কিন্তু স্বয়ং কবিও যেন ইহাদের অস্তিত্ব ও সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতন নন, স্বনির্বাচিত সঞ্চয়িতাতে একটিকেও স্থান দেন নাই। তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণ পাঠকের অনবধানের হেতু কি? আমার মনে হয় গীতিমাল্যকে সকলে গানের বই বলিয়া মনে করে, আর গানের বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা যে সঞ্চিত হইবে তাহা কেহ খেয়াল করে নাই বা সন্দেহ করে নাই। ফলে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সমাজভ্রষ্ট হওয়াতে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

গীতিমাল্যের প্রথম ছুটি গান গীতাঞ্জলি পর্বের রচনা। তার পরের পঁচিশটি গান ও কবিতা ১৩১৮ সালের চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ মাস মধ্যে রচিত। তার পরের ২৮-সংখ্যক হইতে ৪১-সংখ্যক পর্যন্ত বিলাতযাত্রার পথে, বিলাতে এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে রচিত। অবশিষ্টগুলির রচনা দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে। আমাদের আলোচ্য কবিতাগুলি ১৩১৮ সালের চৈত্র ও ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে রচিত।

১৩১৮ সালের চৈত্র মাসে কবির বিলাতযাত্রার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে বিশ্রামলাভার্থে শিলাইদহে চলিয়া আসিতে হয়। সেখানে রোগমোক্ষের কালে কবিতাগুলি রচিত। এই বিবরণটুকু স্মরণ না রাখিলে কবিতাগুলির মাধুর্য ও

তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারা যাইবে না। কবির ভাষাতেই সে বিবরণ শোনা যাক্।—

"গেলবারে যখন জাহাজে চড়বার দিনে মাথা-ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক ষোল আনা সবল না থাকলে একেবারে বিশ্রাম করবার মতো জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। তখন চৈত্র মাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখীর ডাকাডাকিতে দিনের বেলাকার সকল ক'টা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল। ছোট ছেলে যখন তাজা থাকে তখন মার কথা ভুলেই থাকে, যখন কাহিল হয়ে পড়ে তখনি মায়ের কোলটি জুড়ে বসতে চায়, আমার সেই দশা হল। আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে আমার সমস্ত ছুটি দিয়ে চৈত্রমাসটিকে যেন জুড়ে বসলুম, তার আলো তার হাওয়া তার গন্ধ তার গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না"*

একদিকে কবির অসুস্থ শরীর, অপর দিকে কবির পুরাতন ও প্রিয় পরিবেশে প্রকৃতির পূর্ণ শুশ্রূষা, এই দু'য়ে মিলিয়া কবিতাগুলির সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। শরীর সুস্থ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সবল থাকিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটাই মানুষের মন অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়সমূহ যখন দুর্বল অথচ মনটি সক্রিয় তখন ইন্দ্রিয়াতীত সত্যোপলব্ধি সহজ হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। কবিতা কয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সীমান্তবর্তী সত্য ও সৌন্দর্যকে সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছে। এই শ্রেণীর কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল।† সাধারণত রবীন্দ্রনাথ

* "একটা অনাবশ্যক কাজ" বলিতে গীতাঞ্জলির গানগুলির ইংরেজী তর্জমা। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০।

† পরবর্তী কালে রচিত রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্যের অভিজ্ঞতা এই উপলক্ষে স্মরণীয়। দারুণ রোগের আঘাতে ইন্দ্রিয়গত চৈতন্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হওয়াতে কবির পক্ষে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যোপলব্ধি সহজ হইয়া পড়িয়াছিল।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যকে অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সরাসরি ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের উপলব্ধিপ্রচেষ্টা তাঁহার কবিধর্ম নয়। কিন্তু কখনো কখনো ঘটনাচক্রে এমন ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্য, অপর দৃষ্টান্ত আলোচ্য কবিতাগুলি। কিন্তু দু'য়ে প্রভেদ যে, পরবর্তী কালের কাব্য দুইখানিতে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়াতীত জগতের প্রসঙ্গ; আর গীতি-মাল্যের কবিতা কয়টিতে ইন্দ্রিয়জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সীমান্ত-প্রদেশের প্রসঙ্গ। এই ভূমিকাটুকু করিয়া এবারে কবিতাগুলির আলোচনায় নামা যাক।

সব ক'টি কবিতাই যে সমান রসোত্তম এমন নয়, আমার বিবেচনায় ৪, ১০ ও ১১ সংখ্যক কবিতা তিনটি অধিকতর সার্থক, এবং যে-কোন মাপকাঠিতেই বিচার করা যাক-না-কেন এ তিনটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা পর্যায়ভুক্ত হইবার অধিকারী। কিন্তু কবিতা ছয়টির মধ্যে রসসার্থকতার তর-তম থাকিলেও সবগুলি একই অভিজ্ঞতার বাহন—আর সে অভিজ্ঞতা কী আগেই বলিয়াছি; ইন্দ্রিয়জগৎপ্রান্তে অথচ ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ আরম্ভ হইবার আগে যে সূক্ষ্মশরীরী, অনির্দেশ্য, অনির্দিষ্ট অলক্ষ্যপ্রায় জগৎ আছে তাহারই প্রসঙ্গ বর্ণন। এ জগৎ সকলের অভিজ্ঞতার বস্তু নয়, তাই ইহার বিবরণও সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হইতে পারে না, এমন কি কবির পক্ষেও তাহা সদালভ্য ও অনায়াসবোধ্য নয়। বোধ করি মানব-ভাষায় সে জগতের অভিজ্ঞতাবর্ণন দুঃসাধ্য—অথচ কখনো কখনো ইন্দ্রিয়ের যবনিকা অপসারিত হইয়া গেলে সে দেশ কাহারো কাহারো চোখে পড়ে—তখন উপমা, ইঙ্গিত, আভাস ও নানারূপ সূক্ষ্মব্যঞ্জনার দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে হয়। তৎসত্ত্বেও কেহ যদি বলিয়া বসে 'বুঝিলাম না'—কবির নিরুত্তর থাকা ছাড়া উপায় নাই। কবির যেখানে এমন অসহায় অবস্থা, সমালোচকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অথচ যখন দেখি যে, সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত এই

জগতের সত্যকে রবীন্দ্রনাথ কত সুন্দর রূপে, উজ্জ্বল রূপে, স্বভাবত-বিদেহীকে কান্তিময় দেহীরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তখন তাঁহার অত্যাশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্য স্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। দুই অ-সমভাবের জগতের উপরে শিল্পের এই দোলায়মান সেতু রচনা সত্যই শিল্পচাতুর্যের চরম।

কে গো তুমি বিদেশী
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার
বাজালো সুর কি দেশী।
গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশি উঠছে বেজে
ধৈর্য নারি রাখিতে।

তাহার সাপ-খেলানো বাঁশির সুর ঊর্ধ্ব অধঃ আকাশ পাতাল সর্বত্র বিস্তারিত হইয়া গিয়া অবশেষে হৃদয়-গুহায় প্রবেশ করিয়াছে। তখন

কত কালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হ'য়ে এল যে রে
হৃদয়গুহার নাগিনী,
নত মাথায় লুটিয়ে আছে,
ডাকো তারে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী।
তোমার এই আনন্দনাচে
আছে গো ঠাঁই তারো আছে,
লও গো তারে ভুলায়ে;
কালোতে তার পড়বে আলো,
তারো শোভা লাগবে ভালো,
নাচবে ফণা দুলায়ে।
মিলবে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
মিলবে দখিন সমীরণে
মিলবে আলোয় আকাশে।

তোমার বাঁশির বশ মেনেছে,
বিশ্বনাচের রস জেনেছে,
রবে না আর ঢাকা সে।

হৃদয়-গুহায় যে কালো নাগিনীগুলা বিষাক্ত, বীভৎস, সর্বনাশ-সাধনতৎপর, বাঁশির বশ মানিলে তাহারাও যে সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে, বিশ্বনাচের রস জানিয়া তাহারাও যে আনন্দময় বিশ্বনৃত্যে যোগ দিতে পারে, তাহারাও যে প্রকৃতির সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত হইতে পারে, নিতান্ত অবাঞ্ছিতেরও যে একটা স্পৃহণীয় স্থান বিশ্বতন্ত্রে সম্ভব, সে কথা এমন সুন্দরভাবে আর কোথায় প্রকাশ পাইয়াছে? মনের যে-সব প্রবৃত্তি সাপের মতো ভয়ঙ্কর, "তোমার বাঁশির বশ" মানিলে তাহারাও সুন্দর ও আনন্দময় হইয়া উঠিয়া বিশ্বতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করিতে পারে—ইহাই কবির অভিজ্ঞতা।

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন্ দেশে,
এ পথ গেছে কোন্খানে?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর-ঘেরা
আছে সে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে,
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে
সেইখানে ভাই, করবো গমন নিশীথে।"

সেখানটিকেই আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সীমান্তপ্রদেশ বলিয়াছি।

"সেথা মেঘের কোণে কোণে
কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি।"

সে জগৎ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জগৎ হইলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চন্দ্রসূর্যের আলোতেই ভাস্বর হইতে পারিত, আবার ইন্দ্রিয়জগৎ হইলে "অলোক আলোকে" প্রভাময় হইতে পারিত; কিন্তু যেহেতু সে জগৎ স্বভাবতই অনির্দেশ্য ও অনির্দিষ্ট, চঞ্চলতাই তাহার ধর্ম, তাই সেখানকার আলোকও চপল, চঞ্চল; সেখানে "একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি।"

এই কবিতা কয়টিও "আনন্দময় বিজুরি"র মতো "ক্ষণিক প্রভা হানে"; যখনি অর্থ পাইলাম মনে করিয়াছি, অমনি "নিবিড়তর তিমির চোখে আনে"—দেখিতে পাই যে কিছুই বুঝি নাই; অর্থের এই লুকোচুরিতেই, রসের এই রহস্যেই কবিতাগুলির বিশেষ মাধুর্য। এ রূপের জগৎও নয় অরূপের জগৎও নয়, এ এমন এক জগৎ যেখানে রূপের সঙ্গে অপরূপের নিরন্তর লুকোচুরি খেলাতে দুয়ের লীলাটি বড় মধুর হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে।

স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।
গভীরধারা জলের ধারে,
আঁধার করা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া
উঠেছে ঐ বিজনপুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে॥

... ...

পশ্চিমে এই সৌধছাদে
স্বপ্ন লাগে ভগ্ন চাঁদে,
একলা কে যে বাজায় বাঁশি
বেদনাভরা বেহাগ সুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে॥

এ-ও সেই দুই জগতের সীমান্তপ্রদেশ, মনের মধ্যেই বটে তবে অনেক দূরে, কেননা মনের conscious অংশ মনের পুরোভাগে আর sub-conscious অংশ "মনের মাঝে অনেক দূরে।" এই কারণেই সমস্ত কবিতাটির ধুয়া ঐ ছত্রটির, "মনের মাঝে অনেক দূরে।"

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হ'তে খবর আসে
উঠতো হিয়া চমকে।

এ রাজ্যও সেই পূর্বকথিত দেশ। সবাই এখানে অনিশ্চিত ও অনির্দেশ্য, সবই জানা-না-জানার প্রান্তে কাঁপিতেছে—

সেদিন আমার লাগে মনে
আছে যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,
জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে॥

কিন্তু পুরো ধরিবার উপায় নাই, কেননা এখানে কিছুই স্থির নয়, খাস জগৎটাই অস্থির, এখানে "একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি"—এখানকার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহ আনন্দময়, কিন্তু আবার বিদ্যুতের মতোই চঞ্চল। ইহা যোগীজনলভ্য নিত্যজ্যোতিও নয়, আবার ভোগীর নিত্য-অন্ধকারও নয়; ইহা বিশেষভাবে কবির জগৎ, নিত্যের অনিত্য অনুভূতির জগৎ, কারণ কবির স্থান ভোগী ও যোগীর মাঝখানে, কবি অনিত্যের ভেলায় নিত্যের যাত্রী, সেইজন্য দুই অভিজ্ঞতাই তাঁহার আয়ত্ত। এ কয়টি কবিতায় সেই অভিজ্ঞতারই একটি সুষ্ঠু সার্থক শিল্পসুন্দর প্রকাশ।

৬

বলাকা কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই অল্পবিস্তর পরিচিত, কেবল ২৫-সংখ্যক কবিতাটি যত পরিচিত ও সমাদৃত হওয়া আবশ্যক তত হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। চয়নিকা ও সঞ্চয়িতা ইহাকে শ্রেষ্ঠ কবিতার সম্মান দেয় নাই, পাঠকের মুখেও ইহার খ্যাতি শুনিতে পাই না। ইহার একমাত্র কারণ মনে হয় এই যে, কবিতাটি ক্ষুদ্র। কিন্তু কবিতার পরিসরের স্বল্পতা দোষ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। বস্তুত এমন নিশ্ছিদ্র, সর্বপ্রকার দোষক্রটিহীন অথচ শিল্পগুণে অনবদ্য কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে অধিক নাই। ইহার সুঠাম একশ্লোক গঠন সনেট না হইয়াও সনেটের ধর্মসমন্বিত। কিন্তু সাধারণত পাঠক কবিতার অন্যান্য গুণের সঙ্গে তাহার পরিসরের স্ফীতি চায়—এখানে তাহার অভাবই কবিতাটিকে উপেক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
ল'য়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে ;
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে ;
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

ইহা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বসন্ত। ব্যক্তিজীবনের যৌবনাবসানের সঙ্গে এ বসন্তের যৌবনও অবসিত ; বিগতবিহ্বলতা ব্যক্তিগত জীবনের মতো এ বসন্তও অবিহ্বল। রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়ের যৌবনের কথা বলিয়াছেন—এ বসন্ত প্রৌঢ়ের বসন্ত। ইহা কণ্ঠ-

আশ্রমের শকুন্তলা নয়, মারীচ-আশ্রমের দুঃখব্রতচারিণী শকুন্তলা; সে আর হাবভাব-লীলালাস্যময়ী নয়; তাই বলিয়া কম সুন্দর নয়; বাহিরের সৌন্দর্য কতক অপসারিত বলিয়াই অন্তরের সৌন্দর্য আত্মার দুই কূল ছাপাইয়া যেন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অযুত বৎসর আগে যে-বসন্ত একদিন মানবসমাজে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল, অযুত বৎসর পরে তাহা আজও তেমনি উন্মাদনাময় আছে, কারণ অযুত বৎসর পরে মানবসমাজ আজও নবীন। এ বসন্ত নির্বিশেষ মানবসমাজের নির্বিশেষ বসন্ত।

কিন্তু বর্তমান কবিতাটিতে ব্যক্তিবিশেষের বসন্তের কথা বলা হইয়াছে, ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তনের সঙ্গে এই বসন্তেরও স্বরূপ পরিবর্তিত। প্রৌঢ়ের যে-যৌবন "মরণের সিংহদ্বার" পারে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এ বসন্ত তাহারই পূর্বাভাস বহন করিতেছে; কবির ভরসা আছে একদিন ইহারই হাত ধরিয়া তিনি "মরণের সিংহদ্বার" অতিক্রম করিয়া সেই প্রতীক্ষমান যৌবনের আসরে গিয়া উপস্থিত হইবেন এবং তাহার কণ্ঠ হইতে মন্দারের মালা লইয়া নিজ কণ্ঠে পরিতে পারিবেন। কিন্তু এখনো তাহার বিলম্ব আছে —আজ তিনি এবং তাঁহার বসন্ত দু'জনেই নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন—

চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

এমন করুণাসুন্দর কবিতাটির উপেক্ষায় দুঃখ না হইয়া যায় না।

পুঁথি বাড়িয়া যাইবার ভয়ে এ আলোচনার এখানেই শেষ করিতে হইল। এখন ইহার সূত্রে পাঠক-সমাজের দৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যের উপেক্ষিতাগণের দিকে পড়িলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া পাঠক-সমাজও রবীন্দ্রকাব্যে নূতন সৌন্দর্যের সন্ধান পাইবেন।

রবীন্দ্রকাব্য পাঠের সঙ্কেত

এক সময় রবীন্দ্রনাথের কাব্য দুরূহ বলিয়া পরিগণিত হইত। ও বস্তু বোঝা যায় না বলিয়া লোকে সংক্ষেপে দায়িত্ব শেষ করিত। তখনকার দিনে, আজ থেকে ৫০।৬০ বছর আগেকার কথা বলিতেছি, রবীন্দ্রকাব্যের বৃহৎ পাঠক-গোষ্ঠী ছিল না। দুরূহ কাব্য পড়িয়া 'না বোঝার আনন্দ' পাইবে এমন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি সংসারে বিরল।' মুষ্টিমেয় অনুরাগী পাঠক রবীন্দ্রনাথের চিরকাল ছিল। রবীন্দ্রকাব্য পাঠের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক generation-এ রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত চক্ষুষ্মান অনুরাগী পাঠক পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ধ্যাসঙ্গীতের প্রশংসায় যদি এই ধারার সূত্রপাত ধরা যায় তবে পর পর অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, প্রমথ চৌধুরী এবং সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বাড়ুজ্জে, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি ভারতী পত্রিকা গোষ্ঠির নাম করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রেরও আগে আছেন ত্রিপুরার গুণগ্রাহী মহারাজা রাধাকিশোর দেব মাণিক্য বাহাদুর। ভারতী গোষ্ঠী বোধ করি প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে রবীন্দ্রকাব্য প্রচারের ও বোধগম্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ইঁহাদেরই চেষ্টায় রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম সংকলন চয়নিকা প্রকাশিত হইল। যাঁহাদের নাম করিলাম সকলেই অল্পবিস্তর প্রতিভাবান ব্যক্তি আর ইঁহাদের সাকুল্য জীবনকাল হিসাব করিলে দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই তাঁহার কাব্যের অনুরাগী পাঠকের জন্ম হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও সংখ্যায় ইঁহারা মুষ্টিমেয়, বৃহৎ পাঠকসম্প্রদায় রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিল, বড়জোর তাহাদের মনোভাবকে একপ্রকার কৌতূহল বলা যাইতে পারে। ভারতী গোষ্ঠী কেবল নিজেরা বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেন না, রবীন্দ্রকাব্য বুঝাইবার ভার গ্রহণ

করিলেন। অজিত কুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' নামে পুস্তিকা বোধ করি প্রথম ধারাবাহিক আলোচনা রবীন্দ্রকাব্যের। উহা ১৯১১ সালের কথা। তারপরে বছর দুয়ের মধ্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁহার কাব্য সাধারণের মনোযোগের ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল। কিন্তু তাই বলিয়া স্বীকার করা যায় না যে তখন রবীন্দ্রকাব্যের 'দুরূহতা' সরল হইয়া গিয়াছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে রবীন্দ্রকাব্য পাঠ ফ্যাশানে পরিণত হইল। ফ্যাশানের খাতিরে মানুষে অনেক কিছু করিতে পারে—এমন কি দুরূহ কাব্যকেও কণ্ঠে বহন করিতে বাধা হয় না। কিন্তু তারপরেও চল্লিশ বছরের বেশি সময় গিয়াছে। ইতিমধ্যে নানা কারণে রবীন্দ্রকাব্য সত্য সত্যই সুবোধ্য হইয়া আসিয়াছে সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে।

প্রত্যেক মহাকবি একটি নূতন আলঙ্কারিক সংস্কার সৃষ্টি করেন। প্রথমে এই নূতনত্বই তাঁহার কাব্যের রসবোধের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কালক্রমে 'নূতন' পুরাতন হইয়া পড়িয়া পাঠকের মানসিক সঙ্গতির সঙ্গে খাপ খাইয়া যায়। তারপরে অনুকারকগণ কলমের সাহায্যে নূতন কাব্যের ভাষ্য তৈয়ারি করিতে থাকেন। তাঁহাদের অনুকৃতির মূল্য অকিঞ্চিৎকর হইলেও নূতন কাব্যের ধাঁচের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় সাধনের কাজটা তাঁহারা করিয়া থাকেন। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তারপরে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে প্রবেশ পরিচয় সাধনের দিকে আর একটা প্রকাণ্ড ধাপ। বাল্যকাল হইতে নূতন কাব্যের ভাষা ছন্দ, মেজাজ প্রভৃতিতে আপনার অগোচরে অভ্যস্ত হইয়া ওঠে পরবর্তী প্রজন্মের পাঠক সম্প্রদায়। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী যখন নূতন কাব্যকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন, তখন ষাট হাজার সগর সন্তানের মতো অধ্যাপক ও অর্থপুস্তক প্রণেতাগণ সদলবলে কাব্যের উপরে আসিয়া পড়িয়া ভূলাধুনা করিয়া তাহা দেশময় ছড়াইয়া দেয়,

শুধু ছাত্রদের নয় নিরীহ পথিকের নাকে চোখে মুখে তুলার অদৃশ্য আঁশ ঢুকিয়া পড়ে। আর সবশেষে দেখা দেন টীকা, ও ভাষ্য রচয়িতাগণ। ইঁহারা নিজেদের অর্থপুস্তক রচয়িতার চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর মনে করেন। সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া ইঁহারা সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এই সব প্রক্রিয়ার ফলে কালক্রমে দুরূহ নূতন কাব্য সরল হইয়া আসে। এখন রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে তাঁহার কাব্যের ভাগ্যেও এই সমস্ত প্রক্রিয়া ফলিয়াছে। সকলেই যে সু-বিচার করিয়াছেন রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি এমন বলি না—কিন্তু এইসব ভালমন্দ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক যৌথ চেষ্টার ফলে দুই প্রজন্ম কাল মধ্যে রবীন্দ্রকাব্য বাঙালী পাঠকের ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে। আজ আর কোন বুদ্ধিমান বাঙালী পাঠক রবীন্দ্রকাব্য দুরূহ বলিয়া স্বীকার করেন না, বরঞ্চ এখন উল্টা অভিযোগ উঠিতে সুরু করিয়াছে রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে। রবীন্দ্রকাব্য যথেষ্ট দুরূহ নয়, বুদ্ধি খেলাইবার যথেষ্ট প্রশস্ত স্থান নাই রবীন্দ্রকাব্যে, রবীন্দ্রকাব্যের অভিজ্ঞতার পরিধি বড় সঙ্কীর্ণ, Intensity নামক গুণ রবীন্দ্রকাব্যে বিরল ইত্যাকার নানারকম অভিযোগ একদল পাঠক করিয়া থাকেন আজকাল। দুরূহতা, অভিজ্ঞতাবৈচিত্র্য ও Intensity-র সন্ধানে তাঁহারা এখন কাব্যের বড় বাজারে যাতায়াত সুরু করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ খুব বেশি হাঁটাহাটি তাঁহাদের করিতে হইবে না। জোড়াসাঁকো ও বড়বাজার কাছাকাছি। কাব্যবিশারদ, সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রচলিত রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা-চক্র পূর্ণ আবর্তিত হইয়া আবার সেই পুরাতন জায়গায় ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে সেকালে রবীন্দ্রকাব্যে 'দুরূহতা' নিন্দনীয় ছিল, একালে নিন্দনীয় 'সরলতা'; আর প্রভেদের মধ্যে সেকালে মুষ্টিমেয় অনুরাগী পাঠক রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিয়াছিল বৃহৎ পাঠকসমাজ ছিল উদাসীন। একালে বৃহৎ পাঠক-সমাজ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিয়াছে, মুষ্টিমেয় "চক্ষুষ্মান" পাঠক

রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে উদাসীনতার ভান করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। চক্রাবর্তন আর কাহাকে বলে!

২

রবীন্দ্রকাব্য পাঠে ও রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনায় যুগে যুগে এই যে অতিচার ঘটিয়াছে তার এক স্থূল কারণ থাকা সম্ভব। রবীন্দ্র-কাব্য কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই মূল বিচার্য বিষয়। রসিক পাঠক যে কোন কাব্যের যে-কোন একটি কবিতা পড়িয়া আনন্দ পাইতে পারেন, তাঁহার দায়িত্ব কেবল তাঁহার নিজের কাছে। কিন্তু সমালোচকের দায় এত লঘু নয়। তাঁহাকে আগে মন তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে যে, যে-কাব্যখানা পড়িতে যাইতেছি সেটা কি কেবল কতকগুলি খণ্ড খণ্ড কবিতার সমষ্টি না ততোধিক কিছু। তাঁহাকে স্থির করিতে হইবে রবীন্দ্রকাব্য খণ্ড কবিতামাত্র না অখণ্ড কাব্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বেলায় এ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। খণ্ড কবিতা লিখিবার রেওয়াজ তখন ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণব পদাবলী খণ্ড কবিতার সমষ্টি হইলেও বস্তুত তাহা নয়—সহস্তই পালাবদ্ধ, বিশেষ আলঙ্কারিক রীতিতে বিন্যস্ত এবং রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিবরণের কঠিন ফ্রেমে সংবদ্ধ। অর্বাচীন বাংলা সাহিত্যে এই সমস্যা দেখা দিল। আর তখনই সুরু হইল রস-বিভ্রাটের। প্রাচীন ও অর্বাচীন দুটা রীতিই দেখিতে পাওয়া যায় বিহারীলালের কাব্যে। প্রাচীন কাব্যরীতির অনুরোধে সারদামঙ্গল, সাধের আসন ও বঙ্গসুন্দরী সর্গ সংবদ্ধ না হইলে, সরাসরি খণ্ড কবিতার সমষ্টি বলিয়া গৃহীত হইলে—এগুলিতে প্রবেশ সহজসাধ্য হইত। অন্ততঃ সারদামঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবের ঝোঁকটা খণ্ড কবিতা রচনার দিকে—কিন্তু 'প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই—সর্গবদ্ধ স্বীকার করিতে

হইয়াছে। ফলে আর যাই হোক রসবোধের পথ সুগম হয় নাই। মধুসূদনের বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে না। তিনি সর্বদা প্রচ্ছন্ন বা প্রকট কাহিনীর সূত্র অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সব কাব্যই অখণ্ড কাব্য, এমনকি ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম চতুর্দশপদী কবিতাবলী। এখানে কবির জীবনটাই প্রচ্ছন্ন সূত্র। সেই সূত্র, হাতে নিলে পথ না খুঁজিয়া পাইবার কারণ নাই।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়টা জটিল হইয়া উঠিয়াছে আর তার ফলে পাঠকের রসগ্রহণ ক্ষমতায় যুগে যুগে অনাবশ্যক বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গোড়াতে এমন ছিল না। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত খণ্ডে সংগৃহীত প্রধান তিনখানি কাব্য কবি-কাহিনী, বনফুল ও ভগ্নহৃদয় বিহারীলালী রীতিতে সর্গাগারে গ্রথিত। ইহাদের অখণ্ডত্বের দাবি সারদামঙ্গল ও সাধের আসনের চেয়ে অধিক নয়। সারদামঙ্গল বা সাধের আসনের মতো এগুলিকেও খণ্ড-ভাবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়, তাহাতেই রসবোধ অপেক্ষাকৃত আয়াসহীন হয়। কিন্তু যে কারণেই হোক বিহারীলালের দৃষ্টান্ত তন্মধ্যে প্রধান, তিনি সর্গবন্ধ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই পর্যন্তই। ইহার পরে তিনি আর কখনো সর্গাকারে নিবদ্ধ কাব্য বা কাহিনী আকারে নিবদ্ধ কাব্য (নাট্যাকারে নয়) রচনা করেন নাই। সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে সুরু করিয়া তাঁহার যাবতীয় কাব্য আপাতদৃষ্টিতে খণ্ড-কাব্যের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানেই সমস্যার সৃষ্টি।

দীর্ঘকাল রবীন্দ্রকাব্য চর্চার ফলে রবীন্দ্রকাব্য পাঠ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা এখানে নিবেদন করিতেছি। যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও সূত্রাকারে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম, সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেক রবীন্দ্রকাব্যকে অখণ্ড এক-একখানি কাব্যরূপে গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয়, নিকটবর্তী সময়ে লিখিত একাধিক কাব্যকে একটি কাব্যগুচ্ছরূপে গ্রহণ করা উচিত।

তৃতীয়, অধিকাংশ কাব্যের প্রথম ও শেষ কবিতাটি লক্ষণীয়। ইহারা যেন উক্ত কাব্যের ভূমিকা ও উপসংহার।

অনেক নিয়মের মতো এইসব নিয়মেও কখনো কখনো ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসী কাব্য আকারে বেশ বড়। নানা জাতের কবিতা আছে বইখানাতে। মানসী প্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম। ইহাকে একখানা অখণ্ড কাব্য মনে না করিয়া একাধিক কাব্যের সমষ্টি মনে করা যাইতে পারে। কবির গাজিপুর বাসকালে লিখিত কবিতাগুলিই প্রকৃতপক্ষে মানসী কাব্য। যখনই তিনি মানসী কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন এই কবিতাগুলিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। খুব সম্ভব পূরবী কাব্যখানাও একাধিক কাব্যের সমষ্টি। মানসী ও পূরবী বাদে আর কোন কাব্যে বোধকরি প্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম দেখায় না।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে যে অনেক সময়ে একই সময়ে লিখিত একাধিক কাব্যকে একটি গুচ্ছরূপে গ্রহণ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী এইরকম একটি গুচ্ছ। আবার কল্পনা, নৈবেদ্য, কথা এবং গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি—এইরকম আর দুইটি গুচ্ছ।

মাঝখানে সামান্য কিছু সময়ের বাধা থাকিলে তাঁহার গদ্যকাব্য-চতুষ্টয় এক কাব্যগুচ্ছের অন্তর্গত।

আবার একক ও নিঃসঙ্গ কাব্যের সংখ্যাও যথেষ্ট।

ক্ষণিকা একক নিঃসঙ্গ কাব্য। ইহা যেন ছিন্নপত্রের সহোদরা, দু'য়ে চেহারায় ও স্বভাবে বড় বেশি মিল।

খেয়া আর একখানি একক ও নিঃসঙ্গ কাব্য। আগের কাব্য ও পরের কাব্য কাহারো সঙ্গে ইহার যোগ নাই; ইহা ঘাটেরও নয়, ঘরেরও নয়, নিতান্ত মাঝখানের।

মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে গুচ্ছবদ্ধই হোক আর একক কাব্যই হোক সমস্ত কাব্যই অখণ্ড কাব্য। কাব্য যেখানে গুচ্ছবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে সেখানে পরস্পরের সান্নিধ্যে আর সহযোগিতায় অখণ্ডত্ব আরও জমাট হইয়া উঠিয়াছে।

এবারে তৃতীয় নিয়মটি। প্রায় প্রত্যেক কাব্যে প্রথম ও শেষ কবিতাটি যথাক্রমে ভূমিকা ও উপসংহার বলিয়াছি। ইহার অর্থ কি? সাধারণতঃ পুস্তকে ভূমিকা ও উপসংহারে যে অর্থ এ ক্ষেত্রেও প্রায় তাই। তবে ব্যতিক্রমের মধ্যে এই যে ভূমিকারূপ কবিতাটি প্রায় সর্বত্র উপস্থিত, উপসংহাররূপ কবিতাটি সর্বত্র তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাব্য	প্রথম কবিতা	শেষ কবিতা
সোনার তরী	সোনার তরী	নিরুদ্দেশ-যাত্রা
চিত্রা	চিত্রা	সিন্ধুপারে
ক্ষণিকা	উদ্বোধন	সমাপ্তি
খেয়া	শেষ খেয়া	খেয়া
শিশু[১]	জগৎ পারাবারের	নদী
বলাকা	ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা	পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি

আগে বলিয়াছি বিশেষ লক্ষণযুক্ত প্রথম কবিতাটি যেমন প্রায় সর্বত্র উপস্থিত, শেষের কবিতাটি সম্বন্ধে তেমন বলা চলে না। ইহার কারণ আর কিছুই নয় অনেক সময়ে পূর্ববর্তী কাব্যের ভাবের জের পরবর্তী কাব্যে চলিয়া আসিয়াছে, প্রথম কয়টি কবিতা পূর্ববর্তী কাব্যের ভাবেই অনুপ্রাণিত। কিংবা

১ রচনাবলী সংস্করণে নদী কবিতাটি শিশু-কাব্য হইতে বর্জিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সংস্করণে ও পরবর্তী সংস্করণসমূহে নদী কবিতাটি কাব্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। শিশুকাব্যে নদীর পরেও অনেক কবিতা আছে, কিন্তু সেগুলি বহুকাল পূর্বে লিখিত, নিতান্তই পত্র-পূরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত হইয়াছে। মূল শিশু-কাব্য কবির আলমোড়া বাসকালে লিখিত।

দু'খানি কাব্য কাছাকাছি সময়ে লিখিত হইলে একটির শেষের দিকের ও পরবর্তী কাব্যের প্রথম দিকের কাব্যের মধ্যে ভাবের ও রূপের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। কল্পনা ও নৈবেদ্য এমন দুটি দৃষ্টান্ত।

কল্পনার শেষের চারটি কবিতা[২] আর নৈবেদ্যকাব্যের প্রথম একুশটি কবিতা একই ভাবের, একই রূপের সৃষ্টি। ওরা একই শ্রেণীর যাত্রী হইয়াও বিচার বিভ্রাটে বিভিন্ন কামরায় উঠিয়া বসিয়াছে।

পলাতকা কাব্যের 'শেষ গান' নামে উপান্ত কবিতাটি পূরবী কাব্যের প্রারম্ভে বিন্যস্ত হইয়া বিশেষ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কড়ি ও কোমলের প্রথম কবিতা 'প্রাণ' ও শেষ কবিতা 'শেষ কথা' বিশেষ লক্ষণযুক্ত। কিন্তু মানসী কাব্যে উপহার নামে প্রথম কবিতাটি কেবল বিশেষ লক্ষণযুক্ত। শেষের কবিতা সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

যে-সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের ও তাহার কারণের উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি বাদ দিলে রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম কবিতা ও শেষ কবিতার গুরুত্ব অস্বীকার করা কঠিন। আর এই গুরুত্ব একবার স্বীকার করিয়া লইলে সমগ্র কাব্যখানি বুঝিবার পথ আপনি সুগম হইয়া আসে।

এবারে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই বর্তমান রচনার উপসংহার করিতে পারি। এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের এক কাব্যের অন্তর্গত কবিতাগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এক কাব্যের সঙ্গে পরবর্তী কাব্যের বা এক কাব্যগুচ্ছের সঙ্গে পরবর্তী কাব্যগুচ্ছের সম্বন্ধটা কি? ঘড়ির দোলক যেমন তালে তালে দুই প্রান্তে আঘাত করিয়া দোদুল্যমান

২ অনবচ্ছিন্ন, আমি, জন্মদিনের গান, পূর্ণ কাম ও পরিণাম।

থাকে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসেরও ক্রিয়া অনেকটা সেই রকম। সীমা ও অসীমের কোটির মধ্যে তাঁহার কবিমানস দোদুল্যমান। এখন কোন কাব্যে যদি তাঁহার মন সীমার কোটিতে আঘাত করে তবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পরবর্তী কাব্যে বা কাব্যগুচ্ছে কবিমানস আঘাত করিবে অসীমের কোটিতে। কড়ি ও কোমলে যে-মানস স্পর্শ করিয়াছে সীমার কোটি, সোনার তরী কাব্যগুচ্ছে তাহাই আঘাত করিতেছে অসীমের কোটিতে, মাঝখানে মানসীতে কবিমানসের সীমা হইতে অসীমের কোটিতে সংক্রমণের অভিজ্ঞতা। কবিমানসের দোলকবং বিশেষ গতিকেও একটা নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এতক্ষণ যে নিয়মগুলির কথা (ব্যতিক্রম অবশ্য সর্বত্র আছে) বলা হইল, সেই নিয়মগুলিকে রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের সঙ্কেত রূপে গ্রহণ করা যায় কি না ? এই সব নিয়ম যে একেবারে ধ্রুব ও অবিচল তাহা বলি না, অনুধাবন করিলে হয়তো আরও ব্যতিক্রম আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে হয় এই নিয়মগুলি রবীন্দ্রকাব্য-বোধের পথ সুগম করিয়া তুলিতে সক্ষম। কৌতূহলী পাঠক নিয়মগুলি আরোপ ও প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন আশায় সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম।

মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বরাবর মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষ একটু আত্মীয়তাবোধ পোষণ করেছেন। খুব সম্ভব কৈশোরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি তথা বোম্বাই বাসের স্মৃতিতে এই আত্মীয়তাবোধের উৎস, তারপরে, কালক্রমে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টি-প্রসার ঘটবার ফলে, এই আত্মীয়তা-বোধ একটি আদর্শের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। অর্থাৎ গোড়ায় যা ছিল নিতান্তই একটা ব্যক্তিগত অনুভূতি, পরবর্তীকালে তা সর্বজনীন অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে। আজকের সভায় এই বিষয়টিকেই যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে একটা ভূমিকা আবশ্যক। ভূমিকার পটের উপরে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্বন্ধটি স্থাপন করতে পারলে দেখতে পাওয়া যাবে বিষয়টি ক্ষুদ্র বা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—ওর একটা ভারত-জোড়া সার্থকতা আছে, আর সেই সার্থকতা আছে এই বিশ্বাসেই রবীন্দ্রানুরাগী এই সুধীজনের সভায় তা উত্থাপন করতে সাহসী হয়েছি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কবি, মনীষী ও ধর্মগুরুদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এদেশের মহাকবি ও মনীষীরা যেমন সর্বাঙ্গীণভাবে এদেশকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন তার অনুরূপ বোধ করি আর কোন দেশে পাওয়া যাবে না। প্রাচীন গ্রীসে হোমার ছিলেন আবার হেরোডোটাস ছিলেন ; এদেশে বেদব্যাস একাধারে হোমার ও হেরোডোটাস ; মহাভারত একাধারে কাব্য ও ইতিহাস। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস যে লিখিত হয়নি, তার কারণ সে অভাব তেমন করে কেউ বোধ করেননি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কালিদাসের কাব্য ও তুলসীদাসের রামচরিতমানস প্রভৃতি ইতিহাসের অভাব দূর করে এসেছে আর খুব সম্ভব গতানুগতিক ইতিহাসের চেয়ে অধিক পরিতৃপ্তি দান করতে সমর্থ

হয়েছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস তার বিশ্বাসের ইতিহাস, তার আদর্শের ইতিহাস তার আইডিয়ার ইতিহাস; সন তারিখ সন্ধি বিগ্রহ শর্ত চুক্তি ও রাজা মন্ত্রীদের নামাবলীর ইতিহাস নয়।

মহাকবি, মনীষী ও ধর্মগুরুগণ রূপান্তরে এদেশের ইতিহাস-স্রষ্টা বলে এদেশ, এই ভারতবর্ষ তাঁদের মনের মধ্যে সর্বদা স্পষ্ট ও সত্যভাবে বিরাজমান ছিল। তাঁদের কাছে এই দেশটি একই সঙ্গে জন্মভূমি কর্মভূমি ও ধর্মভূমি ছিল, সেইজন্য এদেশ সম্বন্ধে একটি বিশেষ মমত্ববোধ, বিশেষ একটি পবিত্রতাবোধ তাঁরা অনুভব করতেন, নিছক জন্মভূমি সম্বন্ধে যা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নয়। তাঁদের কাছে এ যেন একটি দেবমন্দির তুল্য ছিল। এদেশে পূজা সাঙ্গ করবার পরে দেবমন্দির প্রদক্ষিণ বিধেয়। এদেশের ধর্মগুরুগণ বুঝি সেই মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই বারংবার এদেশ প্রদক্ষিণ করেছেন। আচার্য শঙ্করের ভারত প্রদক্ষিণ, মহাপ্রভু চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করে উত্তরভারতে গমন, এযুগে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিব্রাজকতা সমস্তই এই মনোভাব-প্রসূত। গান্ধীজির ভারত-ভ্রমণও মূলতঃ এই পর্যায়ের। আর রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে যে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়—তারও মূল কথাটি এই, কোন একটা উপলক্ষে সামাজিকদের কাছে ভারতবর্ষের সামগ্রিক রূপটা তুলে ধরা। কালিদাস লঙ্কা থেকে অযোধ্যা, আর রামগিরি থেকে অলকা অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত ভারতের ছবিটি এঁকে গিয়েছেন। আবার রঘুর দিগ্বিজয়ী সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে আসাম পর্যন্ত। এদিকেও আঁকা হল পুবে পশ্চিমে ভারতের ছবি। এ হচ্ছে গিয়ে মহাকবিদের মানসভ্রমণ, ধর্মগুরুদের পায়ে হেঁটে চলার সঙ্গে তাল রক্ষা করে এরা কলমে ভর দিয়ে ভারতভ্রমণ করেছেন।

মধ্যভারতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথকেও ভারতভ্রমণ করতে হয়েছে,

শুধু কায়িকভাবে নয়, সে কাজ তো এযুগে সহজ, তাঁকে ভারত প্রদক্ষিণ সমাধা করতে হয়েছে 'কায়েন মনসা বাচা'। বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের মোটামুটি পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে বিরাট ভারতে কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, বোম্বাই থেকে আসাম—এমন কোন প্রধান রাজ্য নেই, নগর নেই, তীর্থ নেই যেখানে বসে কিছু-না-কিছু তিনি না লিখেছেন, যার কোন-না-কোন উল্লেখ তাঁর রচনায় না আছে। মনের মধ্যে যে ভারতবোধ তাঁর সতত জাগ্রত ছিল পূর্বোক্ত উপায়ে তাকেই যেন পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষা। আবার ভারতের যাবতীয় অঞ্চলের মধ্যে মহারাষ্ট্রকেই যেন তিনি সবচেয়ে নিবিড়-ভাবে স্পর্শ করেছেন। ভারতের যিনি মহাকবি হবেন ভারতের সমস্ত অঙ্গরাজ্য থেকে তাঁকে রস আহরণ করতে হবে, সমস্ত রাজ্য তাঁকে যোগাবে রস, সমগ্র দেশকে তাঁর করতে হবে রস-ভিত্তি। এক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায় যে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস, ও জীবন থেকেই যেন তিনি সবচেয়ে বেশী রস আহরণ করেছেন—মহারাষ্ট্রই যেন সবচেয়ে বেশী পুষ্ট করে তুলেছে কবির মানস-প্রকৃতিকে। অবশ্য এই বিচারের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বভাবতঃই বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে বিচার করতে হবে।

নব্য ভারতের মহাকবি ভারতের বিচিত্র জীবনকে যেন গণ্ডূষে পান করেছেন। এই রস বলাধান করেছে তাঁর মনে, আর বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যকে নব্যভারতের নূতন মহাভারতে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। বৈদিক ভারত, পৌরাণিক ভারত, বৌদ্ধ ভারত, গুপ্তসম্রাটগণের ভারত, মধ্যযুগের ও মুঘলযুগের ভারত যুগিয়েছে তাঁকে রস ও কাব্যের উপাদান। রাজস্থানের বীর্য ও ত্যাগ, শিখের শৌর্য, মহারাষ্ট্রের মহত্ত্ব ও আদর্শবাদে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন—তাঁর কাব্যে তারা স্থান লাভ করেছে। আজকে বিশেষভাবে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ ও বিচিত্র সম্পর্ক বর্ণনাই আমাদের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম সিভিলিয়ান। কর্মক্ষেত্ররূপে তিনি নির্বাচন করে নিয়েছিলেন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। তিনি যখন আমেদাবাদে জজ, তখন তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলেন সেখানে। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে কিছুদিন থেকে ইংরাজিটা ভালো করে শিখে নিলে ভাইকে বিলাতে পাঠিয়ে দেবেন। আমেদাবাদের শাহীবাগ প্রাসাদে বাস করবার কালেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম সঙ্গীত রচনা করেন। এর পরেই ঘটনাচক্রে তাঁর যোগ ঘটলো বোম্বাই তথা মহারাষ্ট্রের সঙ্গে। শেষ বয়সে লিখিত 'ছেলেবেলা' নামে স্মৃতি-কথায় এ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন—

"এখানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেই সব মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরাজী ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছু-দিনের জন্য বোম্বাইএর কোন গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোন একটি এখনকার কালের পড়াশুনাওয়ালা মেয়ে ঝকঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিদ্যা সামান্যই। আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারতো না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না। তাই সুবিধা পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড় মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবি-আনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটা মেপেজুখে নেননি। মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছে থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম যুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটা কাব্যের গাঁথুনিতে। শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে,

বললেন, কবি তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণ-দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি। এর থেকে বোঝা যাবে, মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে। সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্যেই। মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকতো।

যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনদিন দাড়ি রেখো না—তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে। তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয়নি সেকথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো।

আমাদের এই বটগাছটাতে কোন কোন বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখী এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে। শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।" [ছেলেবেলা]

ঘটনার পর ষাট বছরেরও বেশী অতিক্রম করা সত্ত্বেও যাঁর স্মৃতি এমন মমতা ও মাধুর্য আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, বুঝতে হবে তিনি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যা লিখেছেন এখানে তা উদ্ধার করে দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে আশা করা যায়।

"কয়েকমাস আমেদাবাদে রাখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে

বোম্বাইয়ে তাঁহাদের এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন......বিলাতে যাইবার পূর্বে তাঁহাকে ইংরাজি চালচলনে ও কথাবার্তায় পাকা করা দরকার। বোম্বাইয়ের পাণ্ডুরঙ্গ পরিবার ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজিয়ানার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের বিলাত-ফেরত কন্যা আন্না তড়খড়-এর ছিল ইংরেজিতে অসাধারণ দখল। রবীন্দ্রনাথ হইতে বয়সে তিনি কিছু বড়। ইঁহার নিকট তিনি ইংরেজি বলা-কওয়ার পাঠ লইতেন।"

[রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড]

খুব সম্ভব এই মহিলাটিই বাংলাদেশের বাহিরে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম অনুরাগিণী। তখন রবীন্দ্রনাথ কীই বা লিখেছিলেন—তবু তিনি অস্ফুট উষার মধ্যে আভা দেখতে পেয়েছিলেন মধ্যাহ্ন সূর্যের। এও এক রকম প্রতিভা। অল্প বয়সেই এই তরুণীর মৃত্যু হয়। শুনতে পেলাম এই প্রতিভাময়ী রমণীর নশ্বরদেহ যেখানে সমাহিত—তা জীর্ণ, জঙ্গলাকীর্ণ এবং সম্পূর্ণ অবহেলিত। কবির জন্ম-শতবার্ষিকীর সময় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম অনুরাগিণীকে ভুললে চলবে না। তাঁর সমাধি যাতে সুরক্ষিত হয়, সুচিহ্নিত হয়—তার দায়িত্ব মহারাষ্ট্রের, বাংলা দেশের, তথা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উদ্যোক্তাগণের।

বিলাত থেকে ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ—কিন্তু মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হ'ল না—যোগসূত্ররূপ রইলো সত্যেন্দ্রনাথের কর্মজীবন। কখনও পুণায়, কখনও শোলাপুরে, কখনো কারোয়ারে এসে বাস করেছেন তরুণ কবি মধ্যমাগ্রজের আশ্রয়ে। তার মধ্যে কারোয়ার বাসের স্মৃতিটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে মধুর মনে হয়েছিল। অনেককাল পরে 'জীবনস্মৃতি' নামে আত্মচরিত লিখবার সময়, বর্ণনা করেছেন কারোয়ারের সমুদ্রের, ঝাউগাছের অরণ্যের আর ক্ষুদ্র কালানদীর সমুদ্র-সঙ্গমের। এখানেই প্রকৃতির প্রতিশোধ নামে একটি নাট্যকাব্য তিনি রচনা করেন। "অর্ধ-চন্দ্রাকারে বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু

প্রসারিত” করে দিয়ে সীমা যেন অসীমকে আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করছে। হয়তো এই নৈসর্গিক দৃশ্যটি ‘প্রকৃতির প্রতিশোধের’ মূল ভাবটিকে সমর্থন করেছিল। নাট্যখানির মূল কথা সীমা ও অসীমের সম্বন্ধের রহস্যময় তত্ত্ব।

এর পরে কবি বিবাহ করে সংসার-জীবনে প্রবেশ করলেন। তখনও মাঝে মাঝে এসেছেন মহারাষ্ট্রে। এই রকম একবার পুণাতে এসে রমাবাঈ-এর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। রমাবাঈ কোঙ্কন প্রদেশের মহিলা, বাগ্মী ও পণ্ডিত। তিনি আর্য-মহিলা-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। রমাবাঈ সম্বন্ধে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল মহারাষ্ট্র দেশটার উপরে। ১৮৮৯ সালে একখানি চিঠিতে লিখছেন—“খিড কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই ক্ষেত, গাছের সার, টেনিস-ক্ষেত্র। কাঁচের জানলামোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম, দেখে মনটা হঠাৎ কেমন হু হু করে উঠল। এই এক আশ্চর্য।” বাড়ি ছেড়ে, দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময়ে মানুষ যে মাধুর্যময় মমত্ব অনুভব করে এ হচ্ছে তাই।

১৮৯১ সালে উড়িষ্যা থেকে লিখছেন—“এখানকার খালটি দেখে পুণার ছোট্ট নদীটি মনে পড়ে।” আবার ১৮৯২ সালে বাংলাদেশ থেকে লিখিত একখানি পত্রে রেলগাড়ীতে করে মহারাষ্ট্রে যেতে গেলে পথের মধ্যে যেসব দৃশ্য দেখা যায় তার বর্ণনা করে মানস-ভ্রমণের আনন্দ অনুভব করছেন তিনি।

এখন কবি কর্মজীবনের দায়িত্বে বদ্ধ, মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যাতায়াতের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আর সত্যেন্দ্রনাথও চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। কিন্তু মহারাষ্ট্রের সঙ্গে কবির যোগ ছিন্ন হল না, হল তার রূপান্তর। সে সম্বন্ধের সূচনা হয়েছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে,

এবারে ব্যাপক ও গভীর হয়ে সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করলো। যে ঝরনা ছিল পাহাড়ের খেলবার সামগ্রী এখন সমতলে নেমে এসে তা নদীরূপ গ্রহণ করলো, তা ক্ষেতে যোগাচ্ছে চাষের জল, ঘাটে যোগাচ্ছে স্নানের জল, তাতে চলাচল করছে বাণিজ্যের নৌকা।

রবীন্দ্রনাথের বয়স অনেকদিন ত্রিশ পেরিয়েছে, এখন চল্লিশের কাছাকাছি। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। প্রাচীন কাব্য-শাস্ত্র ও ইতিহাস থেকে ভারতের যে আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তার কোন সমর্থন পাচ্ছেন না বর্তমানের মধ্যে। এ রকম উদ্বেগজনক অভিজ্ঞতা সকল মনীষীকেই ভোগ করতে হয়—রবীন্দ্রনাথকেও হল। কিন্তু নীরবে সহ্য করে তো শান্তি নেই। তিনি দেশের ইতিহাস ও পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে তাঁর আদর্শকে কাব্যরূপ দিতে চেষ্টা করলেন।

মহারাষ্ট্র যুগিয়েছে এমন কয়েকটি উদাহরণ। প্রতিনিধি কবিতায় (১৮৯৭) আঁকলেন রাজসন্ন্যাসী ছত্রপতি শিবাজীর চিত্র, তিনি সমগ্র রাজত্ব দানপত্র করে সমর্পণ করলেন গুরু রামদাসের পায়ে। গুরু শিষ্য পরস্পরের যোগ্য। গুরু ফিরিয়ে দিলেন রাজত্ব, বললেন, এখন থেকে তুমি আমার প্রতিনিধি মাত্র,—

"তোমারে করিলা বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"

তারপরে আরও বলেন—

"বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস,
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো;
কহিলেন গুরু রামদাস।"

এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রাজার আদর্শ, আদর্শরাজা।

তারপর ন্যায়দণ্ডের মহিমা বর্ণনা করেছেন 'বিচারক' কবিতায় (১৮৯৯)। রঘুনাথ রাও ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব রাও নারায়ণকে হত্যা করে নিজে পেশবা হলেন। কিন্তু তাঁর খেয়াল হয়নি যে রাজ্যের প্রধান বিচারক হচ্ছেন রামশাস্ত্রী। রামশাস্ত্রী তাঁকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করলে রঘুনাথ তাঁকে পদচ্যুত করলেন। নির্ভীক ব্রাহ্মণ রাজরোষ ও রাজদাক্ষিণ্যে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে পদত্যাগ করে স্বগ্রামে ফিরে গেলেন।

কহিলা শাস্ত্রী—'রঘুনাথ রাও
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।'

এই রকম রাজা, এই রকম বিচারককে অবলম্বন করেই জাত বড় হয়ে ওঠে।

১৮৯৭ সালে একটি মারাঠী গাথা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'সতী' নামে এক নাট্যকাব্য রচনা করেন—এটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাঈয়ের সঙ্গে একটি মারাঠী যুবকের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। বরযাত্রীগণ যখন আসছে, পথের মধ্যে তাদের পরাজিত করে বিজাপুররাজের এক মুসলমান সভাসদ সদলে এসে অমাবাঈকে কেড়ে নিয়ে গেল বিয়ে করে। অমাবাঈ তাকে পতি বলে স্বীকার করে নিল। এদিকে বিনায়ক রাও, তার পত্নী রমাবাঈ এবং পরাজিত মনোনীত বর জীবাজী প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় রইলো। অনেকদিন পর রণক্ষেত্রে পিতামাতার সঙ্গে সদ্য-বিধবা কন্যার সাক্ষাৎকার—যুদ্ধে জীবাজী এবং অমাবাঈয়ের

স্বামী তুজনেই নিহত হয়েছে। বিনায়ক ও তার পত্নী চায় যে কন্যা জীবাজীর সঙ্গে সহমৃতা হোক। অমাবাঈ বলে তা সম্ভব নয়, কেননা জীবাজী পরপুরুষ। তখন রমাবাঈ-এর আদেশে সৈন্যগণ কন্যাকে বলপূর্বক জীবাজীর চিতায় আরোহণ করতে বাধ্য করলো।

ঘটনার এই কঙ্কাল থেকে কাব্যের মহত্ত্ব বুঝতে পারা যাবে না। এখানে দ্বন্দ্ব বেধেছে লৌকিক ধর্ম আর নিত্যধর্মের মধ্যে। লৌকিক ধর্মের বিচারে অমাবাঈ পতিত, নিত্যধর্মের বিচারে সে সতী। কবির সমর্থন নিত্যধর্মের দিকে। রবীন্দ্রনাথের মন তখন ধর্মের স্বরূপ চিন্তা করছে—এই নাটকটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতি আবেদন নিবেদনের নিরাপদ পথ পরিত্যাগ করেছে। অনিশ্চিত দুর্গমের দিকে শুরু হয়েছে তার যাত্রা। রাজপুরুষের রক্তচক্ষুর প্রতিক্রিয়ায় দেশের দিগন্তেও রক্তরাগ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। রাজনীতিতে আত্মশক্তিনিয়োগের পথে মহারাষ্ট্র ভারতে অগ্রণী, মহারাষ্ট্রের একচ্ছত্র নেতা লোকমান্য টিলক।

পুণাতে প্রথম প্লেগ দেখা দিলে রোগের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ হয়ে উঠল রোগের প্রতিকার-চেষ্টা। দুজন ইংরাজ রাজকর্মচারী নিহত হল। লোকমান্য রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। তখন তাঁর মামলার ব্যয় বাবত চাঁদা তুলবার কাজে কলকাতায় যাঁরা অগ্রসর হলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে প্রধান। সতেরো হাজার টাকা ও তিনজন কৌঁসুলী প্রেরিত হল লোকমান্যের সাহায্যার্থে। তারপরে ১৮৯৮ সালে সিডিশ্যন বিল বিধিবদ্ধ হয়—এই উপলক্ষে রচিত হল রবীন্দ্রনাথের 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ।

১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মণ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে ইংরাজ প্রভু কর্তৃক একজন মারাঠী ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনার প্রতিবাদ জানালেন। তাঁর ধারণা এই যে, ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনা ব্যক্তিবিশেষের

মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না—দেশের একটি পবিত্র ঐতিহ্যের উপরে গিয়ে পড়ে।

১৯০৪ সালে কলকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রেরণা ১৮৯৭ সালে লোকমান্য কর্তৃক মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসব—আর এর প্রধান উদ্যোক্তা সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে একজন মহারাষ্ট্রী বাঙালী। তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'শিবাজী উৎসব' নামে বিখ্যাত কবিতাটি। সেটি কলকাতার টাউন হলে পঠিত হয়েছিল। শোনা যায় সে কবিতাটির মারাঠী অনুবাদ পাঠ করে লোকমান্য কবিকে লেখেন যে তাঁর এই কবিতাই 'বঙ্গ মারাঠারে এক করি দিবে বিনা রণে।'

দেশাত্মবোধের উন্মেষের সেই প্রথম প্রহরে লোকের মন দেশের ইতিহাসের মধ্যে বীরের সন্ধানে বের হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটিতে সেই বীরের আবিষ্কার। সে বীর ছত্রপতি শিবাজী। তিনি 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে' বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বিদেশী ঐতিহাসিকের পুঞ্জীভূত লাঞ্ছনা অপসারিত করে স্বকীয় মহিমায় আজ প্রতিষ্ঠিত। তিনি সমগ্র ভারতকে স্বারাজ্যে উদ্বোধিত করেছেন। সেই কথা স্মরণ করে কবি বিশেষভাবে একত্র আহ্বান করেছেন মহারাষ্ট্র ও বাংলাকে—

"মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
জয়তু শিবাজি,
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

ছত্রপতি মহারাজের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি ছিল তা বিচারের যোগ্যতা আমার নেই—সে বিচার এই কবিতার লক্ষ্যও নয়। সেদিন লোকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসতো যে ঐ রকম একটি বীর আছেন নিকট-ইতিহাসের মধ্যেই। মারাঠীর সঙ্গে বাঙালীর বোধহয় একটা আন্তরিক মিল আছে, দুই সমাজই মধ্যবিত্ত-প্রধান, চিত্ত-সম্পদে ধনী, ভাবুক ও আদর্শবাদী। খুব সম্ভব এই মিল স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ মারাঠী ও বাঙালীকে একত্র আহ্বান করেছিলেন। নব্য মহারাষ্ট্রের ভাবমূর্তি লোকমান্য টিলকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অশেষ শ্রদ্ধা ছিল, কেননা তিনি শুধু লোকমান্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন লোকরাজ। টিলকও রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। টিলককে কবি কি চক্ষে দেখতেন রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি—

"এই উপলক্ষে একটি কথা আমার মনে পড়ছে। তখন লোকমান্য টিলক বেঁচেছিলেন। তিনি তাঁর কোন এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন্-কো-অপারেশন আরম্ভ হয়নি বটে কিন্তু পোলিটিক্যাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম—'রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপ যেতে পারবো না।' তিনি বলে পাঠালেন—আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ, এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম জনসাধারণ টিলককে পোলিটিক্যাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারিনি। তারপরে, বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার

থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারেন, এর চেয়ে বড় আর কিছু আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশাই করি না।' আমি বুঝতে পারলুম টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজে তাঁর অধিকার ছিল; সেই অধিকার মহৎ অধিকার।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড]

এ ঘটনা ১৯১৮ সালের।

প্রসঙ্গ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে, এবারে ক্ষান্তির সময় এলো। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছিলাম আশা করি তার একটা আভাস দিতে সক্ষম হয়েছি। শুধু একটি কথা। মহারাষ্ট্র তার এই মহান আত্মীয়টিকে চিনতে ভুল করেনি, এখান থেকে তিনি সম্মান, সমাদর ও সম্বর্ধনা যথেষ্ট পেয়েছেন। এঁরা বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে দাক্ষিণ্য দেখাতেও ভোলেননি। কবির শেষজীবনের এ-সব বিবরণ এখনও জীবিত স্মৃতির মধ্যেই আছে, বিস্তার অনাবশ্যক। 'ঘ' পরিশিষ্টে কয়েকটি মাত্র তথ্যের উল্লেখ করলাম।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজধানী বোম্বাই নগরীতে। দুর্লভ উপলক্ষ নিঃসন্দেহ। এখানে কিছু হাতে করে উপস্থিত হতে হলে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রীতির সম্বন্ধই যোগ্যতম বিষয়। সেই ভরসায় আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষ একটি ভূখণ্ড মাত্র নয়— একটি মহৎ আইডিয়া। আর সে আইডিয়া বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চরিতার্থতার দিকে এগিয়েই চলেছে—স্থাণু স্থির জড়ধর্মী বস্তু এ নয় —এ চির ভূয়মান। সারা জীবন ধরে এই তত্ত্বটি তিনি দেশকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, দেশ যে সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠেছে এমন মনে হয় না। অথচ ঐ পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর তো উপায় নেই—ইতিহাসের প্রেরণাই ঐ দিকে। রবীন্দ্র

জন্মশতবার্ষিকী কবির এই শিক্ষা স্মরণ করবার উপলক্ষ। তাতে করে শুধু মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশ নয়—ভারতের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য পরস্পরের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা ও পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা অনুভব করবে। একেই নামান্তরে বলতে পারা যায় ভারতবর্ষ। নব্য ভারতের বেদব্যাসকে আমরা প্রণাম করতে সমবেত হয়েছি, ভারতের চিরন্তন মূর্তি সার্থক হয়ে উঠুক, উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, সত্য হয়ে উঠুক আমাদের সম্মুখে।*

* এই প্রবন্ধের অনেক উপাদান শ্রীঅমল হোম ও শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

॥ পরিশিষ্ট ॥

ক

মহারাষ্ট্রের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কবিতা ও নাটক—

১ ॥ প্রতিনিধি। ১৮৯৭।

ছত্রপতি শিবাজী কর্তৃক গুরু রামদাসকে রাজ্য সমর্পণের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

॥ রবীন্দ্র রচনাবলী ৭ম খণ্ড ॥

২ ॥ সতী। ১৮৯৭।

"মিস ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠী গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।"

॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড ॥

৩ ॥ বিচারক। ১৮৯৯।

রঘুনাথ রাও কর্তৃক ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব রাও নারায়ণ নিহত হলে, রঘুনাথ রাও পেশবা পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রধান বিচারপতি রামশাস্ত্রী রঘুনাথকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করেন। উত্তরে রঘুনাথ তাঁকে পদচ্যুত করলে রামশাস্ত্রী প্রধান বিচারপতির পদ ত্যাগ করে স্বগ্রামে ফি.র যান। এই ঘটনাটি অবলম্বন করে 'বিচারক' কবিতাটি লিখিত। ॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড ॥

৪ ॥ শিবাজী উৎসব ১৯০৪।

লোকমান্য টিলকের প্রেরণায় সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে মারাঠী সাহিত্যিকের উদ্যোগে ১৯০৪ সালে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব উদযাপিত হয়।—তদুপলক্ষে কবিতাটি লিখিত। ॥ সঞ্চয়িতা ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

খ

মহারাষ্ট্রের ইতিহাস ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে লিখিত প্রবন্ধাদি—

১ ॥ সুবিচারের অধিকার। ১৮৯৪।

প্রসঙ্গ: "সংবাদপত্র-পাঠকগণ অবগত আছেন অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই নামক নগরে তেরজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং আইনমতেও হয়তো তাঁহারা দণ্ডনীয়—কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে এবং আঘাতের ন্যায্য কারণও আছে।"

॥ রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খণ্ড ॥

২ ॥ কণ্ঠরোধ। ১৮৯৮।

প্রসঙ্গ : সিডিশন বিল পাস হইবার পূর্বদিনে টাউন হলে পঠিত।

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড ॥

"কেশরীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দীর্ঘকাল চলিবার পর টিলকের দুইবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল (১৮৯৮)। এই ব্যাপারে সমস্ত দেশময় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা গভর্নমেণ্ট যাহা চাহিয়াছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত; দিকে দিকে প্রবল অসন্তোষ নানাভাবে ছড়াইয়া পড়িল; সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে নূতন আইন হইল। এই আইন সিডিশন বিল, ১৮৯৮ পাস হইবার পূর্বদিন কলিকাতার টাউনহলের প্রতিবাদসভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা 'গভর্নমেন্ট…পুণা শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন' তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে।"

(বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক, অমল হোম, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৩)

এই প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে দণ্ডিত নাটু সর্দারগণের উল্লেখ আছে।

৩ ॥ প্রসঙ্গ কথা। ১৮৯৮।

প্রসঙ্গ : প্লেগ মহামারীর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ উপলক্ষে পুণা ও কলিকাতায় কর্তৃপক্ষের মনোভাবের তুলনামূলক আলোচনা।

॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড ॥

৪ ॥ ব্রাহ্মণ। ১৯০২।

প্রসঙ্গ : "সকলেই জানেন, সম্প্রতি কোন মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহার ইংরেজ প্রভু পাদুকাঘাত করিয়াছিল—তাহার বিচার উর্ধ্বতন বিচারালয় পর্যন্ত গড়াইয়াছিল—শেষ বিচারক ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।"

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড ॥

৫ ॥ শিবাজী ও মারাঠা জাতি। ১৯১০।

শিবাজী মহারাজের প্রতিভায়, নেতৃত্বে ও আদর্শবাদে মারাঠাজাতি কি ভাবে একটি নেশনে দানা বেঁধে উঠল তারই ব্যাখ্যা। ॥ ইতিহাস ॥

৬ ॥ শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ। ১৯১০।

মহারাষ্ট্রের ও শিখসমাজের মহানায়কদের তুলনামূলক আলোচনা।

॥ ইতিহাস ॥

৭ ॥ বোম্বাই শহর। ১৯১২।

বোম্বাই শহরের চারিত্রিক ও আর্থিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ।

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৬শ খণ্ড ॥

৮ ॥ লোকমান্য টিলক সম্বন্ধে মন্তব্য। ১৯২৪।

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

গ

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে সন্ত তুকারামের অনেকগুলি অভঙ্গের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন—তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হল।*

॥ ১ ॥

আমারি বেলায় উনি যোগী
নিজের তো বাকি নাই সুখ,
সব সুখ ঘরে আসে, শুধু
আমারি ত ঘুচিল না দুখ।
ঘরে মোর অন্ন নেই বলে
বল দেখি যাই কার দ্বার,
এই পোড়া সংসারের তরে,
আপদ সহিব কত আর?
অন্ন অন্ন করে রাত দিন
ছেলেগুলো খেলে যে আমায়!
মরণ তাদের হয় যদি
সকল বালাই ঘুচে যায়।
সকলি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান
তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার।
তুকা বলে 'দূর পোড়ামুখী,
আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে মিছে
কাঁদিলে কি হবে বল আর!'

—নবরত্নমালা, পঞ্চম ভাগ, পৃ ৮

—অভঙ্গ ৫৬৬

॥ ২ ॥

বোধ হয় এ পাষণ্ড,
পূর্বজন্মে ছিল মোর অরি।

* শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এ জনমে স্বামী হয়ে
বৈর সাধিতেছে এত করি।

কত দুঃখ সব আর,
কত ভিক্ষা মাগি পর দ্বারে,
বিঠোবার মুখে ছাই—
কি ভাল কল্লেন এ সংসারে?
তুকা বলে "স্ত্রী আমার
রাগিয়া কতই কটু ভাষে,
কভু বা কাঁদিয়া মরে,
কভু বা আপন মনে হাসে।"

—অভঙ্গ ৫৬৭

॥ ৩ ॥

ঘরে দুটা অন্ন এলে
ছেলেদের দেব কোথা খেতে।
হতভাগা তা দেবে না,
সকলি পরেরে যান দিতে।
তুকা বলে 'অতিথিরে
যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মত এসে
হতভাগী ধরে মোর হাত।
না জানি যে পূর্ব জন্মে
কতই করিয়াছিলি পাপ।'
তুকা বলে 'এ জনমে
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।'

—অভঙ্গ ৫৬৮

॥ ৪ ॥

খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—

মাথায় জড়ান তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হলেই হল খাওয়া
আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে।
কি করিব বল্ দেখি, বাছা,
কিছুই ত ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন একরতি,
চলে যান অরণ্যে সদাই।
তুকা বলে "ধৈর্য ধর মনে
এখনো সকল ফুরায় নাই।"

—অভঙ্গ ৫৬৯

॥ ৫ ॥

গেছে সে আপদ গেছে,
ঘরেতে থাকিবে শুধু রুটি,
যা হোক্ তা হোক্ কবে
পেট ভরে খেতে পাব দুটি।
বোকে বোকে দিনু এল্যে
জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে,
তুকা বলে 'যদিও সে
দিবানিশি কত কটু ভাষে।
তুকারে তুকার স্ত্রী যে
মনে মনে তবু ভাল বাসে।'

—অভঙ্গ ৫৭০

॥ ৬ ॥

ঘরে আর আসে না সে,
কোনো পরিশ্রম নাহি করে,

নিজে নাকি খেতে পায়
রোজ রোজ সুখে পেট ভরে।
না উঠিতে শয্যা হতে—
মিলি দলবল গুলা সাথে
করতাল বাজাইতে
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা,
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন,
ঘরে আছে ছেলেপিলে,
তাদের ত না করে যতন।
স্ত্রী তাদের পড়ে আছে—
হতভাগী লাজ দুঃখ ভরে,
অভিশাপ দিতে দিতে
মাথায় পাথর ভেঙে মরে।
'ভাগ্যে যাহা আছে তাহা'
তুকা বলে, 'থাক সহ্য করে।'

—অভঙ্গ ৫৭১

॥ ৭ ॥

হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে?
তুকা কহে, 'ঈশ্বরের তরে,
ব্রহ্মাণ্ড মিলেছে মোর সাথে।
ভাল বুঝে দু-চারিটা কথা,
না জানি তাহে কি ক্ষতি আছে;
কোথাও যায় না যারা কভু,
ভালবেসে আসে মোর কাছে।
এও সে বাসে না ভাল হায়,
ভাগ্য কিবা আছে এর বাড়া—

সকল লোকের পাছে পাছে
কুকুরের মত করে তাড়া।'

—অভঙ্গ ৫৭২

॥ পরিশিষ্ট ॥

ঘ

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে বোম্বাই তথা মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ :

১ ॥ ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে আমেদাবাদ যাওয়ার পথে বোম্বাই স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সম্বর্ধনা। বনিতা আশ্রমে নারীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে কবির ভাষণ।

২ ॥ ১৯২২ সালে পুণায় কিরলোসকর থিয়েটারে 'ইণ্ডিয়ান রেনেস াঁস' সম্বন্ধে কবির বক্তৃতা। টিলকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

৩ ॥ ঐ সালেই দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরবার পথে বোম্বাই শহরে কবি ইণ্ডো-ইরানিয়ান্‌স্‌ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

৪ ॥ ১৯৩২ সালে পুণা জেলে অনশন-ব্রতী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উদ্দেশ্যে কবির পুণা গমন। মহাত্মাজীর জন্মদিন উপলক্ষে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন, প্রবন্ধটি মালব্যজী কর্তৃক শিবাজী-মন্দিরে পঠিত হয়।

৫ ॥ ১৯৩৩ সালে বোম্বাই নগরীতে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপন। সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কবি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। এই উপলক্ষেই রিগ্যাল থিয়েটারে 'দি চ্যালেঞ্জ অফ জাজমেণ্ট' নামে কবি এক বক্তৃতা দেন। ২৯শে নভেম্বর মালাবার হিলে শ্রীমতী তাতিয়া বেগমের বিরাট উদ্যানে কবির সম্বর্ধনা। ২রা ডিসেম্বর সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে কবির 'দি প্রাইস অফ ফ্রিডম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

নির্ঘণ্ট

বিষয় ও পত্রাঙ্ক

বিষয় ও পত্রাঙ্ক

বিষয় ও পত্রাঙ্ক